গিরিশচন্দ্র

নট-নাট্যকার ও ভক্তভৈরব

জ্ঞানপীঠ পাবলিকেশন
১৩৮/৭, বি. সি. রোড (বেহালা), কোলকাতা-৭০০ ০৩৪

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ১৯৯৮

প্রকাশক : জ্ঞানপীঠ পাবলিকেশন
১৩৮/৭ বি.সি.রোড (বেহালা) কলকাতা-৭০০ ০৩৪
দূরভাষ : ২৪০৪-৩৩৭৩

প্রচ্ছদ : দেবব্রত পাল

টাইপসেটিং : প্রদ্যুৎ সাহা
লেজার বাইট
৭, কামারডাঙা রোড,
কলকাতা-৭০০ ০৪৬

পরিবেশক : আনন্দ প্রকাশন
সি/৮, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট (দ্বিতল)
কলকাতা-৭০০০০৭
বর্তমান ঠিকানা : কে১/৯ মার্কাস স্কোয়ার, কলকাতা-৭

মুদ্রণ : শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টার্স
৩০, বিধান সারণী
কলকাতা-৭০০ ০০৬

উৎসর্গ

যাঁদের শরণে গিরিশচন্দ্রের
উত্তরণ, তাঁদেরই চরণপদ্মে
এই গ্রন্থ অঞ্জলী-স্বরূপ দিলাম।

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ ঃ—

- অতুলপ্রসাদ সমগ্র
- রজনীকান্ত সঙ্গীত সমগ্র
- দ্বিজেন্দ্রলাল সঙ্গীত সমগ্র
- অতুলন অতুলপ্রসাদ
- রমণীয় দ্বিজেন্দ্রলাল
- বঙ্গ-নন্দিত রজনীকান্ত
- বিস্মৃতপ্রায় বাঙালী মহিলা কবি
- বঙ্গদেশের হৃদয় হতে— ফিরে দেখা
- সাহিত্য সম্মেলন পরিক্রমা
  (নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ইতিহাস)



গিরিশচন্দ্র ঘোষ





গিরিশচন্দ্র













গিরিশচন্দ্র





নট-নাট্যকার ও ভক্তভৈরব





গিরিশচন্দ্র







।। এক।।

সময়টা ১৯ শতকের মাঝামাঝি। বাংলার জীবনচর্চায় পুরাতন মানসিকতার সাথে নব্যশিক্ষিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্রুত প্রবাহের মুখোমুখি দ্বন্দ্ব। যা কিছু প্রচলিত ও নিত্যদিনের ভাবনার প্রসারতা, সব বর্জন করে রূপান্তর—নতুন চিন্তার আলোড়ন। অনিবার্যভাবেই একটা মানসিক বিরূপতাসঞ্জাত ক্ষোভ এবং তা থেকে বিশৃংখল অপরিছন্ন বাতাবরণ গভীরভাবে আছন্ন করছিল সামাজিক জীবনের ভিত্তিভূমিতে।

এমনি সংশয়-পীড়িত কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব। রামমোহন প্রাচীন ও আধুনিক মননের দীপ্ত প্রতিভার আলোকে একটা সমন্বিত-প্রেরণার সামনে এসে দাঁড়ালেন। উদাত্ত কণ্ঠে ভারত, ঐতিহ্যের তথা অধ্যাত্মশক্তির সযত্ন রক্ষিত অদ্বৈতবাদ—ব্রহ্মজ্ঞান—জীবন বৈরাগ্য তথা জীর্ণতার উর্ধে আধুনিক জীবনের নবায়নের আলোকবর্তিকার কথা প্রচার করলেন। সম্পূর্ন সংস্কার-মুক্ত নতুন সভ্যতা—নতুনভাবে সঞ্চারিত করলেন বাংলার স্নিগ্ধ পেলব 'ভূমিতে' জাগরণের প্রাণ-শক্তির বীজ। দেখতে দেখতে নানা দিক থেকে সেই বীজ উপ্ত হয়ে ছড়িয়ে গেল বাংলার সর্বত্র। সময়টা বাদশা নির্দেশিত ব্যবসা-বাণিজ্যের মোড়কে ইংরেজের অভ্যুদয়। সঙ্গে এল, ইংরেজ তথা ইউরোপীয় সভ্যতার আশ্রয় ইংরেজীয়ানার শিক্ষার প্রবাহ। বাণিজ্য—ইংরেজী শিক্ষা—আর খ্রীস্টধর্মের প্রচার কুশলতায় দেশের প্রাণতরঙ্গে একটা উন্মাদনার বাতাবরণ। ইংরেজের সাথে সাথে পর্তুগীজ—দিনেমার—ফরাসী—ওলন্দাজ ও জার্মান—অনেকেই বাংলা তথা ভারতের ফটকহীন খোলা ঘরে ইচ্ছামত প্রবেশ করে আপন আপন চিন্তা ও ভাবনাকে রূপদান করতে সক্রিয় হোল।

সপ্তগ্রাম—গোবিন্দপুর—সুতানুটী বানিজ্যের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হোল। ইংরেজ জাতির বড় সম্বল নিজস্ব গীর্জা যত্রতত্র নির্মান আর পাদরীদের মাধ্যমে ইংরেজ-সভ্যতার বিচিত্র সম্ভারে সর্বত্র ছড়িয়ে দেবার সুচতুর কর্মপ্রবর্তনা।

বাংলার বৈষ্ণব আন্দোলন—কৃত্তিবাসী রামায়ণ—কাশীদাসের মহাভারত ও নানা মঙ্গলকাব্যের গভীরতায় নানা প্রতিকূল শক্তি থেকে বাংলার নিজস্ব অন্তর সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা তখন অত্যন্ত গভীর। সামাজিক-নৈতিক আধ্যাত্মিক তথা রাজনৈতিক চিন্তার ও আচরণ যখন প্রায় স্তিমিত হয়ে ভয়ার্ত, ঠিক সেসময় চৈতন্যদেবের করুণাশ্রিত প্রেমধর্মের অভাবনীয় প্রবাহ নতুন করে বাংলার প্রাণতরঙ্গকে জাগিয়ে দিল। নানা প্রলোভন-অত্যাচার-বিশৃংঙ্খল মোহ বাংলার জাতিসত্তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারল না।

রামমোহনের পথ অনুসরণ করে বাংলার নবচেতনার উন্মেষের মধ্য দিয়ে জাগ্রত-জীবনের অফুরন্ত প্রাণ-শক্তি সর্বত্র যেন গভীর হয়ে উঠল। ইংরেজী শিক্ষার গুণগত ভাবনায় বাংলার জনসাধারণে একটা সুস্থ পরিচ্ছন্ন আকাঙ্খা উৎসারিত হল—কিন্তু সাথে সাথে বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন সমানভাবে বুদ্ধিজীবীদের মননকেও প্রভাবিত

করল। বাঙালি বুদ্ধিজীবীরাই ইংরেজী শিক্ষার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে নব-জাগরণের ভূমিকে উর্বর করতে এগিয়ে এলেন। এলেন কেরী সাহেব—ডেভিড হেয়ার—ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ;—বাঙালী পন্ডিতগণ—রামরাম বসু—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সহ আরো অনেকে। এলেন ডিরোজিওসহ রামগোপাল-রসিককৃষ্ণ-দক্ষিণারঞ্জন-প্যারিচাঁদ মিত্র প্রভৃতি দেশ-নন্দিত নায়কগণের উৎসাহ ও মনন বাংলার ভাব-ভূমিকে উর্বর করতে সহযোগিতা করলেন। কৃষ্ণমোহন—ইয়ং বেঙ্গল—ডফ্ সাহেব—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—ব্রাহ্মধর্ম—সকলের হাতেই তখন বাংলার নবজাগরণের প্রজ্জলিত মঙ্গল-দীপ শিখা। স্বাভাবিকভাবেই বাংলার প্রচলিত সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্য প্রভাব ধীরে ধীরে প্রবেশ করেছে অনুকূল পরিস্থিতিতে। নানাভাবে ইউরোপীয় ভাবনার প্রবেশ বাংলার জাতীয় চিন্তায় আমোদ প্রমোদের প্রসারের অঙ্গ হয়ে সামাজিক রীতিনীতিতে যুক্ত হয়ে গেল এবং তা অতি দ্রুত গভীরভাবে বুদ্ধিজীবীদের হৃদয়কে আকর্ষণ করতে লাগল। তারই ফলশ্রুতিতে সমাজে থিয়েটার—কথকতা প্রভৃতির মূলাধারে ইংরেজী ভাবনার প্রভাব দেখা গেল। ইংরেজ অভিনেতা গ্যারিকের উদ্যোগে বাংলায় ইংরেজদের রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হল—এবং সেকস্‌পীয়রের হ্যামলেট, রিচার্ড তৃতীয় অভিনয় করা হল। অভিনয়ের নট নটীদের মধ্যেও ইংরেজী মানসিকতার প্রভাব গভীর হল। মিসেস ব্রিস্টো নিজে রঙ্গালয় স্থাপন করে তথায় নিজে অভিনয় করেন, যার প্রভাব বাংলার নাটকে ও দর্শক সমাজকে ভাবিয়েছিল, প্রেরণা দিয়েছিল। সে সময়েই রাশিয়ার লেবেডফ্ কলকাতায় আসেন এবং ইংরাজী দুটি নাটক বাংলায় অনুবাদ করে তৎকালীন বড়লাট স্যর জন সোরের অনুমতি নিয়ে ডোমতলায় রঙ্গশালা নির্মান করেন। এ কাজে গোলকদাস, যিনি লেবেডফে্র বাংলা শিক্ষার শিক্ষক ছিলেন, বাঙালি অভিনেতা ও অভিনেত্রী সংগ্রহে সহযোগিতা করেছিলেন। সেই সময় নাটকে বাংলার বাদ্যযন্ত্রের সহিত ইংরেজী বাদ্যযন্ত্র যুক্তভাবে বেজেছিল।

এমনি ধারায় তৎকালের হিন্দু কলেজের মেধাবী ছাত্রগণ থিয়েটারের প্রতি আকর্ষিত হয় এবং উৎসাহ নিয়ে নাটক দেখার আয়োজন করে। তবে নাটকগুলির ধারক ও বাহক তখনকার সমাজের ধনীব্যক্তিদেরই উৎসাহ ছিল অত্যন্ত ব্যাপক।

নবীনচন্দ্র বসু শ্যামবাজারে একটি দেশীয় নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনীত হয়। নাটককে জনপ্রিয় করার কাজে তখনকার সংবাদপত্রগুলি (সংবাদ কৌমুদী-সমাচার চন্দ্রিকা - সুধাকর) বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। বিশেষ করে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা বাংলার নিজস্ব সম্পদের, ঐতিহ্যের প্রসার ও প্রচারে গভীরভাবে সক্রিয় ছিল যা ইংরেজী তথা ইউরোপীয় সভ্যতার বাধাহীন প্রবাহে বেগ দিয়েছিল অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে। দেশের সত্য ও গৌরবকে সামনে তুলে ধরার কাজে 'সংবাদ প্রভাকর' এর ভূমিকা অত্যন্ত ক্রীয়াশীল ছিল। ইংরেজীভাষা,

ইংরেজীয়ানার প্রভাব থেকে বাঙালীকে নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতিতে ফেরার জন্য ব্যাপকভাবে তখন কিছু মানুষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন ঈশ্বরগুপ্তের ভাবনার প্রেরণা নিয়ে।

দেশবাসীদের নিজের দেশ-সংস্কৃতি-ভাষা প্রভৃতিতে প্রেমপূর্ণ নয়নে দেখার জন্য আবেদন জানান হোল। সেকাজে বঙ্কিমচন্দ্র-দীনবন্ধু মিত্র-মনোমোহন ঘোষ-রঙ্গলাল প্রভৃতি নব্য শিক্ষিত বাঙালি তরুণরা এগিয়ে এলেন। এরই মধ্যে চারিদিক থেকে বাংলার প্রাচীন সাহিত্য-যাত্রাভিনয়-কথকতা-পাঁচালী-কবিগান-হাফ্-আখ্ড়াই প্রভৃতির প্রচলন নতুনভাবে সর্বত্র হতে লাগল।

এমনি বাতাবরণে এলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—তাঁর নির্ভিক মানসিক প্রভাব বাংলার জাগরণের ব্যাপকতায় গভীরভাবে প্রভাববিস্তার করে নব্য-যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করল প্রবল বেগে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের একটা সমন্বয় ভাবনার দিকে তখনকার বাংলার মনীষীগণ অত্যন্ত সন্তর্পনে বাংলার জাগরিক সত্যকে অনুরণিত করার পথ দেখাতে যত্নবান ছিলেন।

এমনি সামাজিক-সাংস্কৃতিক টানাপোড়ানের কেন্দ্রবিন্দুতে কলকাতা তথা বাংলার জাগরণ।

কলকাতার বাগবাজারের বোসপাড়া—বহু ঐতিহ্যের সূত্রে গাঁথা উনিশ শতকের বাংলা তথা ভারতের নব-জাগরণের বীজ উপ্ত হয়েছিল অনবরত।

কৃষ্ণনগরের গোয়াড়ি হতে হুগলীর হরিপাল, তারপর কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাগবাজার বোসপাড়ায় রামলোচন ঘোষের বসবাস। রামলোচন ঘোষের দুই পুত্র—রামরতন এবং হরিশচন্দ্র। রামরতন ঘোষের পাঁচ পুত্র—রামনারায়ণ, গঙ্গানারায়ণ, হরিনারায়ণ, নীলকমল ও মাধব। অর্থ উপার্জনের স্বাভাবিক প্রবাহে স্বচ্ছল রামরতন পুত্রদের ভালোভাবে যত্নের সঙ্গে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। চতুর্থ পুত্র নীলকমল ঘোষ কলকাতায় সওদাগরী অফিসে 'বুক কিপার' পদে কাজ করতেন। হিলজার কোম্পানীতে হিসাব রাখার ব্যাপারে Double Entry পদ্ধতির প্রবর্তন করে তৎকালের অনেক সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী হয়েছিলেন নীলকমল ঘোষ। শোনা যায়, নীলকমল ঘোষের জ্যেষ্ঠ ভাই রামনারায়ণ ঘোষ মহাশয় নিজে দুপুরের আহারে বসার আগে বোসপাড়ায় ঘুরে ঘুরে অনুসন্ধান করতেন পাড়ায় কেউ অভুক্ত আছে কিনা!

ঠাকুর দেবতা-দেবদ্বিজে গভীর আকর্ষন ঘোষ পরিবারের স্বাভাবিক অনুভব।

এমনি একদিন নীলকমল ঘোষ সওদাগরী অফিস থেকে বাড়ী ফিরে শুনলেন গৃহে বালকের কান্না। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে পরিজনদের জিজ্ঞেস করলেন, কে কাঁদছে! দেখলেন গিরি কাঁদছে! কিন্তু কেন? জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন, গিরির তেষ্টা পেয়েছে—

কিন্তু জল পান করতে চাইছে না। তেষ্টা পেয়েছে! জল পান কর! নীলকমল দরদ ভরা আকুতিতে গিরিকে কোলে তুলে বললেন।

'না - না, জল নয়' গিরি কাঁদতে কাঁদতে বলল।

'তবে কিসের তেষ্টা?' নীলকমল সস্নেহে জিজ্ঞাসা করল।

'শসা খাবো! শসা খাবার তেষ্টা!' গিরি ধীরে ধীরে বলল।

গিরির আকুতিতে নীলকমলের পিতৃহৃদয় আর্দ্রতায় ভরে গেল। বাড়ীর ভৃত্যকে বললেন, 'যাও, দ্রুত বাজার থেকে শসা কিনে আন।'

'গিরি' দু'হাত সামনে তুলে বলল, 'না, না, বাজারের শসার তেষ্টা নয়!'

'তবে? আবার কোন শসা!' নীলকমল উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

'গিরি' নীলকমলকে হাতে ধরে খিড়কীর বাগানের শসা গাছের শসা দেখিয়ে দিয়ে হেসে বলল, 'এই শসা! এই শসা খাব।'

নীলকমল স্নেহার্দ্র আকুলতায় ভৃত্যকে বাগান থেকে শসা তুলে আনতে নির্দেশ দিলেন। ঠিক সেসময় নীলকমলের বড়ভাইয়ের স্ত্রী বললেন, 'ও শশা গাছের প্রথম ফলটি গৃহদেবতার জন্য রেখেছিলাম—আর গিরি সেই শসা খাবে বলে বায়না ধরেছে! না ঠাকুরপো, তুমি ওকে নতুন গাছের নতুন ফল শসা দিও না—গৃহ দেবতাকে দেবার পরই সবাই তা খাবে।

নীলকমলবাবু কিছুক্ষণ চুপ থেকে পরে আস্তে আস্তে বললেন, 'বড় বউ, গিরি যার জন্য এত করে কাঁদছে, ঠাকুর কি তা তৃপ্তি সহকারে খাবেন?'

অবশেষে বাগানের তাজা সদ্য তোলা শসা আনা হল, এবং 'গিরি'র তেষ্টা মেটানো হল।

এই 'গিরি'ই গিরিশচন্দ্র—নীলকমলের সাতটি কন্যা এবং পাঁচটি পুত্রের একজন।

প্রথম কন্যা কৃষ্ণকিশোরী, পরে একটি পুত্র—নিত্যগোপাল; তারপর কৃষ্ণকামিনী, কৃষ্ণভামিনী, দক্ষিণাকালী, কৃষ্ণরঙ্গিনী ও প্রসন্নকালী। তারপর চারটি পুত্র—গিরিশচন্দ্র, কানাইলাল, অতুলকৃষ্ণ ও ক্ষীরোদচন্দ্র। সর্বশেষে একটি কন্যা।

গিরিশচন্দ্র পিতামাতার অষ্টম গর্ভজাত সন্তান। গিরিশচন্দ্রের জন্ম ১২৫০, ১৫ই ফাল্গুন (১৮৪৪ - ২৮শে ফেব্রুয়ারী) সোমবার; অষ্টমতিথিতে। গিরিশচন্দ্র যখন জন্মগ্রহণ করেন (১৮৪৪) তখন বাংলার নবজাগরণের পুরোধা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বয়স ২৪ বৎসর; মাইকেল মধুসূদন দত্তের বয়স ২০ বৎসর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও কেশবচন্দ্র সেনের বয়স ৬ বৎসর, দীনবন্ধুর মিত্রের বয়স ১৪ বৎসর।

কলকাতার মদন মিত্র লেনের প্রসিদ্ধ নাগরিক চুণীরাম বসুর পুত্র রাধাগোবিন্দ বসুর মধ্যমা কন্যা রাইমণি গিরিশচন্দ্রের জননী। যেহেতু গিরিশচন্দ্র অষ্টম গর্ভজাত

সন্তান, সেইহেতু ঢাক ঢোল বাজিয়ে এক গভীর বার্তা পাড়ায় জানিয়ে দেওয়া হল।

গিরিশচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হবার মুহূর্তেই মাতা রাইমণি সুতিকা রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তাতে অসুস্থতা কঠিন আকার ধারণ করল—ফলে নবজাত শিশুর জীবন সংশয় অনিবার্য মনে হওয়ায় আত্মীয় পরিজনেরা এক বাসন-মাজায় নিযুক্ত মহিলার উপর নবজাতকের পালনভার দেওয়া হয়। সেই মহিলার স্তন্যপান করেই শিশু গিরিশচন্দ্রের জীবন সুধা লাভ হয়।

> ....গৃহিণীর প্রসব করা অবধি বড় অসুখ, ক্রমে রোগ দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। এদিকে জাত শিশুর নিমিত্ত মাইদিউনী পাওয়া যায় না। এক মাগী বাগ্দিনী, মণি তার নাম-হসপিটালে প্রসব করে সেইদিনই এসেছে, ছেলেটা দু ঘণ্টা বেঁচেছিল মাত্র। বাগ্দিনী নব শিশুর মাইদিউনী হল।....

উদ্বোধন/১৩০৬,১ম বর্ষ

গিরিশচন্দ্র পরবর্তী সময়ে নিজের জীবনের সেই পর্বটি তার 'গোবরা' নামে একটি গল্পে আভাস দিয়েছিলেন। মৃত্যুকালে গোবরার মা তার স্বামীকে বলেছিলেন,.....

> ....উমো বড় অভাগা, একদিনও স্তন্য দিতে পারি নাই। বৃদ্ধ বয়সের সন্তান, পাছে অকল্যাণ হয়, এই ভয়ে ওর প্রতি আমি চাহি নি, কখনও আদর করিনি। পাছে তুমি তাড়না কর, এই ভয়ে আমি আগেই তাড়া করতাম।....

গিরিশচন্দ্র একজায়গায় বলেছেন,....

> ....আমার পিতা একজন প্রসিদ্ধ acountant ছিলেন, তাঁহার বিষয়-বুদ্ধি অতি প্রখর ছিল। আর আমার মাতা কোমল প্রাণা ছিলেন,—শৈশবকাল থেকেই দেবদ্বিজে তাঁর অতিশয় ভক্তি ছিল। ঠাকুর দেবতার কথা শুনিতে ও দেবদেবীর স্তব পাঠ করিতে তিনি খুব ভালবাসিতেন। বৈষ্ণব-ভিখারী বাড়ীতে আসিলে পয়সা দিয়া গান শুনিতেন। আমি পিতার নিকট বিষয়বুদ্ধি ও মাতার নিকট কাব্যানুরাগ ও ভক্তি পাইয়াছি।....

পর পর কন্যা সন্তানদের জন্মের পর গিরিশচন্দ্রের জন্ম পারিবারিক জীবনে বিশেষ করে পিতা নীলকমল ঘোষের আদর মেশানো মাত্রাতিরিক্ত আকুলতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হত। তারফলে শৈশবকাল থেকেই গিরিশচন্দ্রের মানসিকতায় এক পরিণত বুদ্ধি ও কর্তৃত্বের ছায়া ঘুরে ঘুরে রাগ-সজ্জাত ব্যবহারের প্রকাশ ঘটত। স্বাভাবিকভাবে আপন মেজাজ ও ইচ্ছার পরিপূর্ণ সাধনের অভিপ্রায় সকল কাজে নির্দেশিত হত যথাবিহিতভাবে ভৃত্যদের উপর। নির্দেশমত কাজ না হলে রাগ হতেন-কিন্তু আবার সহজ হয়ে তাদের সকল অসংলগ্নতাকে ভুলে যেতেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র নিজের প্রকৃতিদ্বারা যা অনুভব করতেন তার পরিপূর্ণতা না হওয়া পর্যন্ত অস্থির থাকতেন।

হাতে খড়ি হবার পর নীলকমলবাবু বাড়ীর খুব নিকট ভগবতী গাঙ্গুলীর পাঠশালায়—তারপর গৌরমোহন আঢ্যের পাঠশালায় পাঠ গ্রহণের জন্য প্রিয় পুত্র গিরিশচন্দ্রকে ভর্তি করিয়েছিলেন।

তখন গিরিশচন্দ্রের বয়স মাত্র আট বৎসর।

পারিবারিক পরিবেশে দেব-দ্বিজের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আকুতি ছিল। দেব-দেবীর কাহিনী তথা রামায়ণ-মহাভারত বা শ্রীকৃষ্ণের জীবন কাহিনীতে গিরিশচন্দ্রের আকর্ষন ছিল গভীর। সন্ধ্যার পর গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক কাহিনী শুনবার জন্য জড় হতেন খুল্লপিতামহীদের কাছে। কাহিনীর নানা ঘটনায় খুবই বিভোর হতেন। বিশেষভাবে যে ঘটনায় অক্রুর বৃন্দাবনে এসে মধুময় বৃন্দাবনের প্রাণ কানাইকে মথুরা নেবার জন্য এসেছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ যখন রথে উঠলেন—ব্রজ নারীগণ রথের চক্র, অশ্বের বল্‌গা, কেউবা রথের সামনে শুয়ে পড়লেন। ব্রজ বালকগণ সখা কৃষ্ণকে—'কানাই কানাই' বলে না যাবার জন্য কেঁদে কেঁদে আকুল অনুরোধ জানাচ্ছে—বৃন্দাবনের গাভীরা নরম চোখে মুখ তুলে আহার ভুলে কৃষ্ণপানে চেয়ে আছে—গাছে গাছে পাখীদের নীরবতার মধ্য দিয়ে বেদনাসিক্ত আকুতির দৃশ্য—গোপ রমণীদের মধুসিক্ত দেহ মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছে—এমন কাহিনীর বেড়া ছিন্ন করে গিরিশচন্দ্রের অন্তর এক অভাবনীয় গভীর বেদনার ভারে কেমন যেন হয়ে যেত। কোন কথা নেই , নেই কোন জিজ্ঞাসা। মুহূর্তের মধ্যে কাহিনীর অন্তঃস্থল ভেদ করে সেই বিরহবিদ্ধ বৃন্দাবন—গোপ রমণীদের কান্না—রাখাল বালকদের আর্তনাদ সর্বোপরি বৃন্দাবনের অমারাত্রির শূণ্যতার চিত্রটি গিরিশচন্দ্রকে আছন্ন করে দিত। বাক্‌রুদ্ধ হয়ে দুটো চোখ জলে ভাসিয়ে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করতেন—কৃষ্ণ তবে কি আবার আসলেন! কথকের কাছ থেকে উত্তর এল—না, কৃষ্ণ আসলেন না—পুণরায় আবার জিজ্ঞাসা—আর আসবেন না? আবার উত্তর এল—না।

গিরিশচন্দ্র স্থান ত্যাগ করে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নিজের ভেতর প্রশ্ন করলেন—কৃষ্ণ এলেন না! কিন্তু কেন? কৃষ্ণ এলেন না।

তারপর থেকে গিরিশচন্দ্র পরপর কদিন সন্ধ্যার গল্প-আসরে গেলেন না।

বৃন্দাবনের সেই-বেদনার যে ছবি তাঁকে ধাক্কা দিয়েছে, পরবর্তী সময়ে গিরিশচন্দ্র পুরাণের অনেক কাহিনী পাঠ করলেও বৃন্দাবনের সেই আর্তনাদকে কখনও ভুলতে পারেন নি।

তারপর থেকেই গিরিশচন্দ্র ঘরে বাইরে যখনই কোন বৈষ্ণব দেখতেন—কৃষ্ণ নাম শুনতেন তাকেই প্রণাম করে কিছু অর্থ দিতেন।

।। দুই।।

গিরিশচন্দ্র পিতা-মাতার অষ্টম গর্ভজাত। তাই তাঁর মা পাছে অষ্টম-জাত সন্তানের বিপন্নতা আসে—এই ভাবনায় খুব একটা আদর-যত্ন করতে যেতেন না। একটা প্রচ্ছন্ন মানসিকতায় গিরিশজননীর ধারণা ছিল, পুত্র গিরিশের কাছে গেলে, তার মুখ দর্শন করলে গিরিশের অকল্যাণই হবে—এই সংস্কারে আছন্ন গিরিশজননী দূরে দূরে থেকেই পুত্রের কল্যাণ কামনা করতেন।

গিরিশচন্দ্র লিখেছেন,

> ....অদার প্রত্যাশায় যদি কখনও মার কাছে যেতাম, মা দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতেন। একদিন আমার গাল গলা ফুলে ভারি জ্বর, অঘোরে পড়ে আছি। শুনলাম, মা বাবাকে বলছেন, অতি ব্যাকুল হয়ে বলছেন, তুমি যেমন করে পার ওকে বাঁচাও। বাবা জানতেন, মা আমায় আদর করেন না, বোধ হয় তেমন ভালও বাসেন না। তাই বাবা বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি যে এত ব্যাকুল হচ্ছ? মা অতি কাতরকণ্ঠে উত্তরে বললেন, আমি রাক্ষসী, এক সন্তান খেয়েছি (বড় ভাই নিত্য গোপালের মৃত্যু) —এটি আমার অষ্টমগর্ভের ছেলে। পাছে আমার দৃষ্টিতে কোন অমঙ্গল হয়, তাই আমি একে কাছে আসতে দিতুম না। এলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতুম। কোলে করিনি, কখনো একটি মিষ্টি কথা বলিনি, আমার হেনস্তায় কত কষ্ট পেয়েছে, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। জননীর এই অন্তর্নিহিত গভীর স্নেহ এতদিন পরে সম্যক উপলব্ধি করে আমি রোগের যন্ত্রণা পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিলাম।

গিরিশচন্দ্র পরবর্তী সময়ে 'অশোক' নাটকে বাল্যজীবনের বেদনা গভীরতাকে অন্তরের অতি গোপনীয় স্থান থেকে অত্যন্ত পবিত্র অনুভবে প্রকাশ করেছিলেন।

শোক গিরিশচন্দ্রের জীবনে স্বাভাবিকভাবেই এসেছে। বড় ভাই নিত্যগোপালের মৃত্যু পরিবারে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল। গিরিশজননী প্রায় প্রতিবৎসর পিত্রালয়ে যেতেন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে। পুত্র নিত্যগোপালের মৃত্যুর পরই পিত্রালয়ে গিয়ে মা কে দেখে এসেছেন। ফিরে এসে তিনি গর্ভ-বেদনায় অস্থির হয়ে প্রায় মুর্চ্ছা গেলেন। অল্প সময়ের ব্যবধানে একটি মৃত কন্যা প্রসব করলেন এবং তাতে প্রচন্ডভাবে হতাশ ও শক্তিহীন হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে নিজে প্রাণত্যাগ করলেন।

গিরিশচন্দ্র তার মাতার মৃত্যু সম্পর্কে লিখেছেন।

> ....একদিন আমরা ক'ভাই পাড়ার বালকগণের সঙ্গে মিলে খেলা করছিলাম। বাড়ীর নিকটে নিত্যই আমরা খেলা করতাম, সন্ধ্যার পূর্বে বাড়ী থেকে ভৃত্য এসে ডেকে নিয়ে যেত। কিন্তু সেদিন তার আসতে বিলম্ব হতে লাগল। মনে মনে ভাবতে লাগলাম—ভৃত্য আসতে কেন বিলম্ব করছে? কিন্তু অধিকক্ষণ

> খেলতে পেরে আবার আহ্লাদও হতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে ভৃত্য এসে আমাদের (কানাইলাল—অতুলকৃষ্ণ—ক্ষীরোদ) বাড়ী নিয়ে গেল। বাড়ী ঢুকে দেখি, সকলেরই কেমন বিমর্ষ ও ব্যস্ত-সমস্ত ভাব। ক্ষণকাল পরেই ভিতর বাড়ী হতে শাঁখ বেজে উঠল; শুনলাম—আমার একটি ভগ্নি হয়েছে; কিন্তু সে শঙ্খবোল থামতে না থামতে সহসা বাটিতে ক্রন্দন রোল উঠল। জননী মৃত কন্যা প্রসব করে স্বর্গারোহন করলেন।

গিরিশচন্দ্র স্থির অপলক নয়নে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন। পুরো চিত্রটা তখনও তার কাছে সহজ হল না। একটা অস্থির দৃষ্টি বার বার পিতাকে খুঁজছে—কার কাছে গিয়ে ব্যাপারটি জানবে তার চেষ্টা করছে। বোনেরা কাছে এসে গিরিশসহ অন্য ছোট ভাইদের আলতো করে ঘরের ভেতর নিয়ে গেল—যেখানে তাঁর প্রিয় মা, অভিমানী জননী—কল্যাণী মা শীতল হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন। ধীরে ধীরে একটু সর্তক পদচারণায় মায়ের কাছে যেতেই বোনেরা উচ্চস্বরে কেঁদে কেঁদে গিরিশকে জড়িয়ে ধরল। গিরিশ অপলক দৃষ্টিতে মাকে দেখছে—বহুদিন মাকে দেখেন নি—অথচ প্রতিদিনই মা গিরিশের জন্য সব দেখাশোনা করতেন— সেই মা, সেই জননীকে দেখে দেখে চোখ জুড়িয়ে অশ্রুর বন্যায় পদযুগল ধুইয়ে দিয়ে উচ্চস্বরে বললেন, 'মা, আমার মা, এমন করে আমাকে অনাথ করে গেলে কেন? মা গো—মা?'

আত্মীয় পরিজনেরা গিরিশকে ধরে তুললো। গিরিশ সকলের বাঁধন ছিন্ন করে নীরবে নিঃসঙ্গ বেদনার গভীর অতলান্ত বোধে একাকী ঘরের বাইরে—রাস্তায় নেমে গেলেন।

একাকী বসে বসে গিরিশ ভাবছেন— কোথায় গেলেন মা আমার! এমন কেন হল? সেদিনের বেদনার শোক-ছবি গিরিশচন্দ্রকে মাঝে মধ্যেই তাড়িত করত। মাতৃস্তন্য পান নি—প্রতিদিন মাতৃ-দর্শনও পান নি—বার বার সেই অনাঘ্রাত অপ্রত্যাশিত স্নেহের জন্য কাঙ্গাল হয়ে থাকতেন গিরিশচন্দ্র। আজ তাও শেষ হয়ে গেল। এখন কার কাছে, কার অপেক্ষায় তিনি থাকবেন। মা—মা গো—এমন করে কেন তুমি চলে গেলে? এ কথা বলতে ভাবতে গিরিশ আনমনা হয়ে যেতেন। ভাব-তন্ময়তায় হৃদয়পটে মায়ের পদ-বন্দনা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন পাড়াপড়শীদের লাগোয়া খোলা বারান্দায়।

পরবর্তী সময়ে গিরিশচন্দ্র 'বুদ্ধদেব চরিত' নাটকে বুদ্ধদেবকে প্রসব করেই বুদ্ধদেব জননীর মৃত্যুর ঘটনাকে নিজের মাতৃদেবীর মৃত্যুর স্মৃতিতে প্রতিফলিত করলেন।

> ..... মহারাজ, জন্মেছে নন্দন।
> ..... নৃপমণি, ধৈর্য্য-পাশে বাঁধ বুক।
> ..... জন্মেছে নন্দন!

..... নাহি হও উচাটন,
..... জড়িত রসনা মম দিতে এ সংবাদ
মুর্চ্ছাগত রাজরানী
রাজবৈদ্যগণে—
সযতনে চেতন করিতে নারে.....

সেসময় গিরিশচন্দ্র হেয়ার স্কুলে পড়তেন।

জ্যেষ্ঠ পুত্র ও পত্নীর বিয়োগে পিতা নীলকমলবাবুর শরীর ক্রমশই খারাপ হতে লাগল। পুত্র-কন্যাদের জন্য ভাবনা—পত্নীর বিরহ প্রায়শই তাকে আনমনা করত। তাতে আহারে রুচি নেই, মনে উৎফুল্লতা নেই, নেই কোন কাজে উদ্যোগ। তা ছাড়া দীর্ঘদিনের রক্ত-আমাশা রোগ মাথা চাড়া দিয়েছে। পরিস্থিতির চাপে স্থির করলেন চিকিৎসকদের পরামর্শ নেবেন। চিকিৎসকগণ তাঁকে স্বাস্থ্য উদ্ধারে বায়ু পরিবর্তনের জন্য কোথাও বিশেষ করে গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণে যেতে বললেন। সেইমত পুত্রদের নিয়ে নীলকমল নৌকায় গঙ্গা ভ্রমণ করতে বেরিয়েছেন। গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণে শরীরের নানা উপসর্গ অনেকটাই আয়ত্বে এসেছে। এরমধ্যে একদিন নবদ্বীপ-এর কাছে একটা ঝড়ের ছিন্ন ভিন্ন বাতাসে নৌকা তুফানের ঝড়ে তালমাতালের মত দুলে উঠল—মাজি তাল সামলাতে পারছে না—নৌকা দিশেহারা হয়ে এদিক ওদিকে দুলে দুলে প্রায় জলে ডুবে যাবার মুখে হঠাৎ গিরিশ ভয়ার্ত হয়ে বাবার হাত দুটো চেপে ধরল—মাঝি অনেক কসরৎ করে অবশেষে নৌকাটিকে ঝড়ের কবলমুক্ত একটি দুর্বল প্রবাহে নিয়ে গেল। তখন সবার প্রাণ যেন অনিবার্য বিপদের মুখ থেকে রক্ষা পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। নীলকমলবাবু গিরিশকে বললেন,

....তুই আমার হাত ধরেছিলি কেন? আমার নিজের প্রাণ বড় না তোর? যদি নৌকা ডুবতো—আমি হাত ছিনিয়ে নিতুম—তুই কোথায় পড়ে থাকতিস জানিস? যেমন করে পারি, আগে আমি আমাকেই বাঁচাতুম।

গিরিশ বাকরুদ্ধ হয়ে পিতার কথা শুনছিল। অনেকটা ভয়, কুণ্ঠা এবং লজ্জায় মাথা নত করে বাবার দিকে ফিরে ফিরে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইল। নীলকমলবাবু গিরিশের কাছে এসে বসলেন। বারবার গিরিশের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে যেন বলতে চেয়েছেন, বিপদে হাত ধরার কেউ নেই, একমাত্র ভগবান ভিন্ন হাত ধরবার জায়গা নেই।

নীলকমলবাবুর অসুখ নিরাময় হল না; বরং বেড়ে যেতে যেতে নানা উপসর্গ তাড়া করছে অনবরত। খাবার অত্যন্ত ভেবেচিন্তে গ্রহণ করতেন—গুরুপাক কোন রান্নাই গ্রহণ করতেন না। পিতার অসুখের খবর শুনে পঞ্চম কন্যা কৃষ্ণরঙ্গিণী বাবাকে দেখতে এসেছেন। বাবার পছন্দমত নানা ধরনের খাবার নিজের হাতে তৈরী করে

খাওয়াবার বাসনা তাঁর। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের এবং চিকিৎসকের নির্দেশে সেই উদ্যমে বাধা পেল বাড়ীর ছোট মেয়ে। কিন্তু কৃষ্ণরঙ্গিণী দমিবার নয়। সেদিন তার উদ্যোগে মেয়েরা তাজা কড়াইসুটির কচুরী জলখাবার তৈরী করল। কচুরী ভাজার গন্ধে নীলকমলের রসনায় কেমন যেন তোলপাড় করছে—কিন্তু মুখ ফুটে বলা সম্ভব নয়। আদরের ছোট মেয়ে বাবাকে গরম গরম 'কচুরী' এনে খাওয়াবার চেষ্টা করছে। নীলকমলের আকাঙ্ক্ষার পারদ বেড়ে গেল—এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছে, তখনই মেয়ে একটা 'কচুরী' বাবার মুখে ঢুকিয়ে দিল। পরমতৃপ্তিতে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কৃষ্ণরঙ্গিণী দ্রুত আরও কয়েকটি গরম 'কচুরী' দিল পিতাকে। নীলকমল গোগ্রাসে তা খেলেন।

পরদিন বাড়ীতে হৈ হৈ। নীলকমলের অবস্থা সংকটপূর্ণ। চিকিৎসকরা নানাভাবে চেষ্টা করছেন—কিন্তু কিছুই হবার নয়।

অবশেষে ১৮৫৮ সনে ৫২ বৎসর বয়সে নীলকমল ঘোষ পরলোক গমন করেন।

গিরিশচন্দ্রের বয়স তখন ১৪ বৎসর। বড় বিধবা বোন কৃষ্ণকিশোরী অভিভাবিকা হয়ে নাবালক গিরিশচন্দ্রের সংসারের হাল ধরলেন। বিরাট সংসার ও নীলকমলের বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করা তখন এ দু'জনের চিন্তা ও ভাবনার বিষয় হল। নীলকমলবাবু সাবধানী মানুষ ছিলেন। বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে তিনি গভীরভাবে ভবিষ্যৎ ভাবনায় একটি খাতায় বিবরণ লিখে গিয়েছিলেন—যা গিরিশচন্দ্রকে সমস্তদিক থেকে পারিবারিক অপরিচ্ছন্নতায় পথ দেখাতে সহায়তা করেছে। পিতার স্নেহশিক্ত অন্তরের পরিপূর্ণ ছায়ায় নিবিড়তার কোমল ভাব ও ব্যবহারে ছোট ছোট ভাই বোনদের গিরিশচন্দ্র গভীরভাবে ধরে রেখেছিলেন। যখনই কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন গিরিশচন্দ্র পিতাকে স্মরণ করতেন—ছুটে যেতেন গঙ্গায়—কোমর জলে দাঁড়িয়ে পিতার উদ্দেশে অঞ্জলিপূর্ণ করে গঙ্গাজল প্রদান করতেন।

গিরিশচন্দ্র মাতৃস্নেহ প্রত্যক্ষভাবে পাননি—কিন্তু পিতার স্নেহ ও শাসন যুগবৎ গভীরভাবে পেয়েছিলেন এবং ভবিষ্যৎ জীবনে পিতার উপদেশ পাথেয় রূপে বার বার পরবর্তী জীবনে গ্রহণ করেছেন।

।। তিন ।।

সময়টা ১৮৫৮। সিপাহী বিদ্রোহের অনিবার্য প্রভাব দেশজুড়ে অনেক বেসামাল অবস্থা হয়েছিল। রাজশক্তির দমননীতি তীব্র থেকে তীব্রতর। যেখানে সেখানে বিদ্রোহের জন্য রাজশক্তির অবস্থা ও খুব একটা মজবুত নয়। নির্যাতনের কুৎসিত রোমহর্ষক কাহিনীর সাথে সাথে অত্যাচার, নৃশংসতা প্রায় প্রতিদিনের ঘটনা। অর্থনৈতিক-সামাজিক

অস্থিরতায় দেশে নানাদিক থেকে বিশৃঙ্খল পরিবেশ। কারণে অকারণে একটা ভয়, একটা আর্তনাদের দুঃস্বপ্ন যেন প্রতিদিনের ব্যাপার। এর মধ্যেই নানা ঘটনায় অসামাজিক কাজ ঘটে চলেছে—লুট—হত্যা—যেন সহজ ঘটনা। গিরিশচন্দ্র এ সম্পর্কে লিখেছেন,

> ....বক্‌রীদের দিন জনরব উঠিল, বদমায়েস মুসলমানগণ কলকাতা লুট করবে। আমরা তখন বালক, কিন্তু সেদিনকার কথা স্মৃতিপটে অঙ্কিত হয়ে আছে। শহরময় হুলুস্থুল, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শঙ্কাকুল! 'কি হবে, কি হবে' ব্যতীত লোকের মুখে অন্য কোন কথা নেই। শহরের ভয় বিহ্বল অবস্থায় ইংরাজরাজ প্রজার ঘরে ঘরে অভয় বিলাতে লাগলেন. ঘরে ঘরে ছাপার কাগজ আসতে লাগল। 'ভয় নেই, ভয় নেই;' অস্ত্রধারী ইংরাজ-রাজ কর্মচারীগণ বক্‌রীদের রাতে পথে পথে পাহাড়া দিয়ে বেড়াবেন। প্রজার রক্ষণে প্রাণপত করবেন; নিঃশঙ্ক চিত্তে সকলে নিদ্রা যাও। সে ঘোর দুর্দিনে ইংরাজরাজের ধৈর্য্য, শৌর্য্য, বীর্য্য এ ঔদার্য্য গুণে ভারত রক্ষা পেয়েছিল, শান্তি পুনঃ স্থাপিত হয়েছিল।.....

রাজনৈতিক অবস্থার প্রভাব স্বাভাবিকভাবে প্রজার উপর তা বড় ছোট যে কোন ভাবেই পড়বে। গিরিশচন্দ্রের পারিবারিক জীবনেও অনেক অস্থিরতা ও বিশৃংঙ্খলার প্রবেশ ঘটেছে। পিতার মৃত্যুতে অভিভাবকহীন সংসারে আর্থিক সুস্থিতিতে বেশ কিছুদিন অব্যবস্থা থাকলেও গিরিশচন্দ্র পিতার রেখে যাওয়া গ্রাসাচ্ছাদনের পরিপূর্ণ সদ্‌ব্যবহারে যত্নবান হয়েছিলেন।

নীলকমলবাবুর মৃত্যুর এক বৎসর পরেই গিরিশচন্দ্র বিবাহ করলেন বিধবা বড় বোন কৃষ্ণকিশোরীর নির্দেশে। তখন বয়স প্রায় পনের বৎসর। বাগবাজারের শ্যামপুকুর নিবাসী নবীনচন্দ্রদেব সরকারের কন্যা প্রমোদিনীর সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের বিবাহ হয়—১৮৫৯ সালে। গিরিশচন্দ্রের বিবাহ দিনই নিমতলার একটি কাঠের গুদামে আগুন লাগে এবং অল্প সময়ের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা আশেপাশের সব গ্রাস করতে করতে বাগবাজারের কাছে গিরিশচন্দ্রের বাড়ীর অতি নিকটে প্রায় ছুটে আসছে—চারিদিকে জল আনো, জল, সর্বনাশ সব গেল! আর আগুনের হলকায় বিচ্ছিন্ন পুড়ে যাওয়া কাঠ সহ নানা বস্তু বাতাসের গতিতে ছিট্‌কে পড়ছে দিগ্‌বিদিকে। একটা অসহনীয় তান্ডব যেন সর্বগ্রাসী হয়ে ছুটে আসছে। বিবাহের আনন্দ-আমোদ সব বন্ধ রইল। ঘরে ঘরে গৃহদেবতাকে সঙ্গে নিয়ে অন্য কোথাও নিরাপদ স্থানে যাবার জল্পনা চলছে। আর চলছে কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে দেবতাকে প্রসন্ন করার আয়োজন। অবশেষে গিরিশচন্দ্রের বাড়ীর সমুখস্থ খালি জায়গায় সুবৃহৎ তেতুল গাছে আগুনের শিখা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সব শান্ত হয়।

পিতার মৃত্যুতে গিরিশচন্দ্রের বিধিবদ্ধ কোন বিদ্যালয়ে একটানা লেখাপড়া হয়নি। বিবাহের পর গিরিশচন্দ্র ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে প্রথম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। প্রকৃত অভিভাবক না থাকায় নানা কারণে বারবার বিদ্যালয় পরিবর্তনের জন্য অনিবার্যভাবে কোন পরীক্ষায় বসা তার পক্ষে সম্ভব হল না। অথচ গিরিশচন্দ্র শৈশব থেকেই লেখাপড়ায় গভীর উৎসাহী ছিলেন। রামায়ণ-মহাভারত-চণ্ডীমঙ্গল-অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি কাব্য অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে বিপুল উৎসাহে পাঠ শুনতেন, পাঠ করতেন। বিদ্যালয়ে গিরিশচন্দ্র পণ্ডিত শিক্ষক মহাশয়দের লেখাপড়ার নামে তাড়না বা ভয় দেখানো মোটেই পছন্দ করতে পারেননি। সহজ ও স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে পাঠ গ্রহণের কোন সুযোগ গিরিশচন্দ্র পান নি।

সে সময়টায় বাঙালি জীবনে ইংরেজী ভাষা ও চালচলনের প্রচলন বেশ দ্রুত গতিতে অন্দর মহলে এসে গিয়েছিল। স্বাভাবিক ভাবেই একটু বর্ধিষ্ণু পরিবারে ও সামাজিকতায় ইংরাজী সাহিত্যচর্চার কৌলিন্য একটা বাড়তি সুযোগ ও অবস্থা জাহির কার হোত। একসময় মুসলমান শাসনে বাঙলায় পার্শিভাষার ও বিদ্যা চর্চার কদর তুঙ্গে ছিল। তারপর অনেক ঘটনার আবর্তে ইংরেজী ভাষাই বাঙালীর আদর-যত্নের একমাত্র মাপকাঠি হয়ে সর্বত্র প্রসারিত হতে এতটুকু কালবিলম্ব হল না। কিন্তু গিরিশচন্দ্র সেই ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য চর্চার পরিমন্ডলে আপন মাতৃভাষার প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করতেন। তাই তিনি বাঙলাভাষায় লিখিত বাঙালি প্রাচীন কবিদের কবিতা পাঠ ও মুখস্থ করার দিকেই গভীরভাবে মনোনিবেশ করতেন।

বিদ্যালয়ের প্রথাগত শিক্ষার স্তর নানা কারণে উন্নীত হতে না পারলেও গিরিশচন্দ্রের অন্তর প্রবাহে বাংলা ভাষার ভাব সমৃদ্ধ মধুরতার আকর্ষণ অত্যন্ত অল্প বয়স থেকেই বেড়ে উঠেছিল। সেখানে প্রথাগত বিদ্যার কোন বাধা ছিল না।

শৈশবে বাংলা সাহিত্যের নানা আলোচনায় নিজস্ব পাড়ায় ঈশ্বরগুপ্তের কাব্য ও কাব্যরস-প্রবাহ গভীরভাবে গিরিশচন্দ্রকে আকৃষ্ট করেছিল। একান্তভাবে যখন একা একা বসে থাকতেন তখন অন্তরের মধ্যে ব্যঞ্জনার প্রবাহ যেন তরঙ্গ সৃষ্টি করত— তখন রীতিহীন বেগে তা মুখ থেকে তারপর কলমের ঢগায় টক্‌বগ্ করে ফুটতো।

ধরিয়া মানব-কায়, সমভাবে নাহি যায়,
সুখ-দুখ-মাঝে হেলে দুলে।
কেমন লোকের মন দুঃখ নামে অচেতন
সুখলাভে সকলেই চলে।

....আবার

নীরব মানব সব নিশি ঘোরতর,
তমোময় সমুদয় মহা ভয়ঙ্কর।

রণবেশে ঘন এসে ঘেরিল গগন,
ঘন ঘন ঘোর নাদে গভীর গর্জন।
চমকে চপলা, করে আঁধার হরণ
কড় কড় কুলিশের কঠোর নিঃস্বন।

ইংরেজী ভাষা ও তার সাহিত্যের পরিচয় না জানলে সমাজজীবনে গুরুত্ববোধ ও আকর্ষণ হোত না। একথা প্রথম থেকেই গিরিশচন্দ্র বুঝেছিলেন। তাই বিবাহের সময় তিনি যে যৌতুক অর্থ পেয়েছিলেন তা দিয়ে কিছু ইংরেজী সাহিত্যের ভাল ভাল সমাজে প্রচলিত পুস্তক কিনে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে অথচ অনেক কষ্ট স্বীকার করে বন্ধু-বান্ধবদের সহযোগিতায়—ভাষা ও অর্থ উদ্ধারে একনিষ্টতার গভীরতায় নিবিষ্ট হলেন। সাংসারিক কাজের ফাঁকে ফাঁকে সময় করে গিরিশচন্দ্র অত্যন্ত নিবিড় আকুতিতে পড়ে যেতেন—বাইরের কোন কাজে বা খেলা ধুলায় একেবারেই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে মনোনিবেশ করতেন পাঠে। একটা অন্য পরিমন্ডলে নিজেকে এমনভাবে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন যে বেশ কিছুদিন পাড়া প্রতিবেশীরা পর্যন্ত গিরিশচন্দ্রকে বাড়ীর বাইরে দেখতে পায়নি। তাতে স্ত্রী—বড় বোন এমন কি আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে নানা চিন্তার কারণ জেগে উঠল। ইংরেজী সাহিত্যের ভাবধারা, শব্দ বোধ অনেক সময় তাঁর সীমিত জ্ঞানের দুয়ার থেকে ছিটকে পড়তো—বুঝতে পারতেন না প্রকৃত অর্থ, পারতেন না রস-আস্বাদন। একটানা পড়তে পড়তে হঠাৎ আট্‌কে যেতো অনেক শব্দ-ভাব—তাই বিষন্ন বিরক্তিতে মন- প্রাণ বেদনা পেত। এমনিভাবে হঠাৎই পড়া ছেড়ে দিলেন—ঘরের দরজা খুলে গেল—এখন আর দোর বন্ধ করে গিরিশচন্দ্র সকলের বাইরে নয়—ঘর ছেড়ে বাইরে, একেবারে গঙ্গার কুলে কুলে সময়ে অসময়ে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে ক্লান্ত দেহ মনকে স্নিগ্ধ বাতাসে মুগ্ধ আস্বাদনের আরাম লাভ করতেন।

বন্ধুরা জিজ্ঞেস করত, পড়াশোনা কি ছেড়ে দিলে যে কেবল গঙ্গার ধারে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছ!

.... দেখ ভাই, সব বই ভাল বুঝতে পারি না, মাঝে মাঝে বড় আটকায়, স্পষ্ট মানে বোঝা যায় না, তাই বিরক্ত হয়ে পড়া ছেড়েছি ....

বন্ধু বলল,

.... আমরাও কি সব বইয়ের সব জায়গায় বুঝতে পারি। আমাদেরও অনেক জায়গায় আটকায়, ভাবে বুঝে নিতে হয়। তবে এটা ঠিক, পড়তে পড়তে আপনিই বোঝা যায়। আর প্রথম থেকে সমস্ত বুঝে কজনই বা বই পড়ে। পড়তে থাক, দেখবে ক্রমে ক্রমে সব ঠিক হয়ে যাবে।....

গিরিশচন্দ্র থমকে গেলেন। স্মিত হাসিতে নিজের ভেতর ভরসার আলো দেখতে পেলেন—শক্তি এল, নতুন উৎসাহে আবার পড়তে শুরু করলেন। পড়া আর পড়া। আহারের প্রতি এতটুকু সময় দেওয়া নয়—তাতেও পড়া যাতে বিঘ্ন না হয়। সত্যিই তো সব বুঝে কি পড়া যায়—পড়তে পড়তে বোঝা হয়ে যায়।

বন্ধুর পরামর্শে গিরিশচন্দ্র নতুন ভাবে নিজেকে তৈরী করার পথ ও রসদ পেলেন। আর বিলম্ব নয়, নয় হতাশা—এগিয়ে এগিয়ে চলা—বই, আর বই। পড়া শুধু পড়া। পরীক্ষার জন্য নয়—কেউ পড়াও জিজ্ঞাসা করার নেই। নিজের মনে যত ইচ্ছা যত খুশী পড়ে যাওয়া। গিরিশচন্দ্রের এই গভীর প্রত্যয়ে অভাবনীয় মেধার ও ভাবের স্তর থরে থরে ভরে উঠল অন্তরের নিভৃত স্থানে।

পড়তে পড়তে গিরিশচন্দ্র নিজে থেকেই ইংরেজী অনেক কবিতা বাংলা ভাষায় অনুবাদের আনন্দ আহরণ করতেন আপন ইচ্ছার প্রকাশে। ইংরাজী ভাষার শব্দের ভাবরূপ বাংলায় আনার জন্য গভীর মনোনিবেশ করতেন যে প্রতিভার যাদু স্পর্শে সেসময় গিরিশচন্দ্র অনেকগুলি ইংরাজী কবিতার বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। পরবর্তী কালে সেই সকল বাংলা অনুবাদ আর প্রকৃত ইংরেজী কবিতা উভয়ের ভাব-সমৃদ্ধ পরিবেশন বহু বিদগ্ধ শিক্ষিত ইংরাজী জানা মানুষদের মধুরতার বিস্ময়ে হতবাক্ করেছিল।

গিরিশচন্দ্রের মামা নবীনকৃষ্ণ বসু একজন বড় চিকিৎসক ছিলেন। তিনি ইংরেজী সাহিত্যেরও গভীর অনুশীলন করতেন। গিরিশচন্দ্রের সাহিত্যচর্চায় বিশেষ করে ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ প্রক্রিয়ায় নবীনকৃষ্ণ বসুর প্রভাব ছিল। মাঝে মধ্যে উভয়ের বিষয়ভিত্তিক পরিবেশনায় বেশ আলাদা তর্ক হোত। তাতে গিরিশচন্দ্রের পাঠ-আকাঙ্ক্ষা বেড়ে যেত বহুগুণ। মাতুল নবীনকৃষ্ণবাবু সযতনে ও সচেতনভাবে কখনো একটি কখনো দুটি বই এনে গিরিশকে দিতেন এবং আলোচনা তথা তর্কে প্রলুব্ধ করতেন। গিরিশচন্দ্রও সাবলীল গতিতে অত্যন্ত গভীর মনোনিবেশে মাতুলের দেওয়া এক বা একাধিক পুস্তক গোগ্রাসে পাঠ করে তর্কে অবতীর্ণ হতেন।

এভাবেই গিরিশচন্দ্র পাঠ অধ্যয়ন পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে ইংরাজী সাহিত্য-ইতিহাস, দর্শন, প্রাণীতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করলেন। কিন্তু পিপাসা মিটছে না—বই চাই, জ্ঞানের সমুদ্রে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে গিরিশচন্দ্রের অন্তরে তখন তীব্র ব্যাকুলতা। পাড়ার পাঠাগার শেষ, বেপাড়ার পাঠাগার শেষ—অবশেষে গিরিশচন্দ্র বিভিন্ন বিষয়ের জানার ইচ্ছায় কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতেও যাওয়া আসা শুরু করলেন। বিশেষ করে ঐতিহাসিক ঘটনা ও জীবনের অনুসন্ধানের আনন্দ পেতে গিরিশচন্দ্র সচেষ্ট হলেন। অভাবনীয় ক্লান্তিহীন পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে ইংরেজী সাহিত্যের ভাব ও সংগতির অনুসরণের পন্থা আয়ত্ব করতে গিরিশচন্দ্র অত্যন্ত জেদী প্রকৃতির আচরণ করতেন।

বড় বোন মাঝে মধ্যে বিশ্রামের জন্য কখনও বা ফল কেটে কাছে এনে দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের হাতে খাওয়াবার পরিকল্পনা করার বিষয়েও গিরিশচন্দ্র অনীহা প্রকাশ করতেন, পাছে ভাব-তরঙ্গের প্রবাহের ঘাটতি আসে।

বাগবাজারে মাঝে মাঝে বড়লোকের, বিশেষ করে শিক্ষিতদের *আকড়াই সঙ্গীতের* আসর বসত। তাতে স্থানীয় তথা কলকাতার তখনকার দামী মানুষের আমন্ত্রণ হোত। ভীড় এমনই জোরালো হোত যে বাইরের দেরীতে আসা কোন উৎসাহীর ভেতরে প্রবেশ অত্যন্ত জটিল ছিল। এমনি পরিবেশে হঠাৎ ভীড়ের মধ্যে রাস্তা করে দিয়ে একজনকে ভেতরে প্রবেশ করাবার জন্য বেশ তাড়াহুড়া হল। **আগন্তুক সাধারণ পরিচ্ছদধারী কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত**। তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ভেতরে আনার জন্য আয়োজকদের মধ্যে গতি সঞ্চার হোল। এই ঘটনায় ও দৃশ্যে গিরিশচন্দ্রের বিস্ময় জাগল—এবং ক্রমে ক্রমে 'কবি' হবার আকাঙ্ক্ষার বীজ রোপিত হোল। ইতিমধ্যে গিরিশচন্দ্র বাংলাভাষায় সচলবোধে নিজেকে তৈরী করার জন্য *বিদ্যাসাগরের 'বেতালপঞ্চবিংশতি'* সহ অন্যান্য প্রকাশিত চলতি পুস্তকগুলিও নিয়মিত পড়তেন, নিজেকে তৈরী করেছিলেন। কয়েকদিনের মধ্যে গিরিশচন্দ্র কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদিত *'প্রভাকর'* পত্রিকার পাঠকরূপে গ্রাহকভূক্ত হলেন। অন্তরের আকুল অভিপ্রায়ে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে 'প্রভাকর' নিত্য পাঠের আনন্দে কবিত্বশক্তির অধরা স্পন্দনের হিল্লোলে মুগ্ধ বিস্ময়ে মগ্ন হতে লাগলেন গিরিশচন্দ্র। তারই সঙ্গে বাংলার প্রাচীন তথা পৌরাণিক কাহিনীর বিশ্লেষণে ব্যাপকতর উৎসাহে সাহিত্যের কুঞ্জবনে স্বাভাবিকভাবে বিচরণে আনন্দ লাভ করতেন। আপন ভাষার ভাব তরঙ্গে সন্তরণ করতে করতে ইংরেজী ভাষার কবিতার অনুবাদের মুগ্ধতায় কখনও কখনও নিজেই কবিতা-গান রচনা করে আপন মনে তা বার বার পাঠ করতেন। সেইসব কবিতা ও গান প্রায় সবগুলিই হারিয়ে যায় অযত্নে।

গিরিশচন্দ্রের প্রথম রচিত গান—

সুখ কি সতত হয় প্রণয় হলে।
সুখ - অনুগামী দুখ,　　গোলাপে কণ্ঠক মিলে।।
শশী প্রেমে কুমুদিনী,　　প্রমোদিনী উন্মাদিনী
তথাপি সে একাকিনী, কত নিশি ভাসে জলে।।

আবার সেকস্‌পীয়ারের একটি সনেটের (Go Rose) বাংলা অনুবাদ (আং)

যারে গোলাপ জেনে আয়, সে কেন আলাপ করে না।
সুন্দরী বিনা সে নারী, অন্য কারে আদরে না।।
যদ্যপি যৌবন তরে, আমারে সে অনাদরে
শুকায়ে দেখায়ো তারে, যৌবন চিরদিন রবে না

কথায় যদিও কিছু বলনি কখন
কখনো কি কোন কথা বলেনি তব নয়ন।।
যে কথা বলেছে আঁখি, ভুলিয়ে গিয়েছ না কি,
ইসাদি আছে হৃদয়, শুধালে হবে স্মরণ।।

ইংরেজী সাহিত্যের কবিতা অনুবাদে গিরিশচন্দ্রের আকর্ষণ যেমন গভীর ছিল, তেমনি অনেকাংশে, বাংলা ভাষায় আপনভাব প্রকাশের যুক্ত হাওয়ায় আনন্দ-তৃপ্তির আস্বাদনও তাঁকে গভীরভাবে মাতিয়ে রেখেছিল অত্যন্ত শৈশবকাল থেকেই।

।। চার।।

পরিবারে অভিভাবক না থাকলে স্বাভাবিকভাবে পাড়ার নানা ধরনের কুক্রিয়া আবার কখনো বা সুক্রিয়ার যোগসূত্র অত্যন্ত সাবলীল ধারায় যে কোন মানুষের চরিত্রে প্রভাব বিস্তার করে। খুবই অল্প বয়সে গিরিশচন্দ্র পিতৃমাতৃহীন হয়েছিলেন। শূন্য অন্তরে ভাগ্যক্রমে সাহিত্য-ভাব রসের ঐশ্বর্য গভীরতা লাভ করেছিল ব্যক্তিগত রুচি ও পরিবেশের অনুকুলে। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা অবাঞ্ছিত লোক ও ঘটনার মোহজালে আপনার অজানতেই গিরিশচন্দ্র নিজেকে যুক্ত করেছেন। বারণ করার কেউ নেই—তাই পাড়ার অবাঞ্ছিত ছেলেদের নেতৃত্ব দিতে এতটুকু বাধা এল না কোন দিক থেকেই। ফলে মদের আসর ও গান সহ নানাবিধ অসামাজিক বিশৃংঙ্খল অপরিচ্ছন্ন আচার আচরণে গিরিশচন্দ্র নিজেকে যুক্ত করলেন। পাড়ার মাতব্বর হয়ে অনেকটা অনেকের অরুচিকর ক্রিয়া কলাপে মদত দিতে হয়েছে। আবার পাড়ার শৃংঙ্খলা রক্ষায়—সেবাবোধের প্রতি হঠাৎ উৎসাহে লোকাভাবে অর্থাভাবে মৃতের সৎকার করার, পীড়িত অজানা-অচেনার রাত দিন সেবা করা—নিজের অর্থ দিয়ে ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করা—এসব কর্মহীন রোয়াকীদের নিয়ে গিরিশচন্দ্র খুবই ব্যস্ত থাকতেন।

সময়টা ধর্ম-বিপ্লবের ঘনঘটা। ভগবানের অস্তিত্ব সম্পর্কে নানা জনের নানা মত প্রতিদিনই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। গিরিশচন্দ্র কিন্তু তেমনভাবে নিজেকে যুক্ত করতেন না। ব্যক্তিগত কথাবার্তায় ও আচার আচরণে অনেকটা লাগামহীন—অনেকে তাকে মনে করতেন বিধর্মী-নাস্তিক। তেমনি একটি ঘটনা গিরিশচন্দ্রের জীবনধারায় নূতন ইংঙ্গিত এল। শারদীয়া পূজার আগে দিন। পাড়ার কিছু লোক গভীর রাতে গিরিশচন্দ্রের বাড়ীর উঠোনে দুর্গামার প্রতিমা রেখে গেছে। বাড়ীর লোকেরা ভোরে উঠে সেই প্রতিমা দেখে অস্থির হয়ে উঠল। বড় বোন কৃষ্ণকেশরী ধর্মপ্রাণা। তিনি উঠোনে দুর্গা প্রতিমা দেখে চঞ্চল হয়ে উঠলেন—কি করবেন স্থির করতে পারছেন না। ঠিক সেসময় গিরিশচন্দ্র ঘুম থেকে উঠলেন এবং সামনে সেই ফেলে যাওয়া দুর্গা প্রতিমা এবং বহুলোকের চাঞ্চল্যকর কথাবার্তায় খুবই ক্ষিপ্ত হলেন এবং শয্যাত্যাগ করেই একটা

বহিত করার জন্য ঘরের বাইরে এসে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে উদ্যোগ নিলেন। বড় বোন যতই পরিবেশকে শান্ত করতে চায়, গিরিশ ততই ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। অবশেষে গিরিশ সকলের সামনেই মদ খেলেন এবং কালাপাহাড় মূর্তি ধারণ করে একটি কুঠার হাতে নিয়ে সেই দুর্গা প্রতিমাটিকে ছিন্ন-ভিন্ন করলেন—কৃষ্ণকেশরী তাতে চিৎকার করে ভাইকে থামাতে চেষ্টা করছেন—কিন্তু কিছুতেই কিছু হোল না। গিরিশচন্দ্র নিজের হাতে প্রতিমার ধ্বংসাবশেষ নিকটস্থ একটি আমগাছের গোড়ায় জড় করে রাখলেন। পরে গর্ত করে সেগুলি পুতে দিলেন।

ঘরে ফিরে ক্লান্ত গিরিশ। বড় বোন কাঁদতে কাঁদতে গিরিশের কাছে এসে ধিক্কার দিচ্ছে। গিরিশ নির্বিকার। রাতে গিরিশের প্রবল জ্বর হল।

গিরিশচন্দ্র কখনও স্বাভাবিকভাবে ঈশ্বর আছেন কি নেই—এই তত্ব গ্রহণ করতেন না। শৈশব থেকেই তার জীবনে যাচাই না করে কোনদিনই তিনি কোন কিছু স্বীকার করতেন না।

সামাজিক পরিস্থিতির শিকার হয়ে ভাল ঘরের ও বংশের অনেক যুবক পথের কিনারা না পেয়ে নিজের পাড়ার গন্ডীর মধ্যেই দিন-রাত উজার করে দিতে এতটুকু বাধা দিতে তখন উপরতলার তথাকথিত সম্ভ্রান্ত লোকদের মাথা ব্যথা ছিল না। সেই সব পাড়ার বখাটে ছেলেদের জন্য গিরিশচন্দ্রের ভাবনা ছিল অত্যন্ত আন্তরিক।

কিন্তু সমাজের অনেক সেবামূলক কাজের মধ্যে সেই বখাটে ছেলেদের অন্তরকে যুক্ত করে যে মহৎ কাজটি পাড়ায় পাড়ায় নিষ্পন্ন হোত, তারজন্য কোন সৎ-ব্যবহার বা বাহবা তারা পেত না।

গিরিশচন্দ্র শৈশব থেকেই একগুঁয়ে প্রকৃতির ছিলেন। যা একবার ভাববেন বা চিন্তা করবেন তা অবশ্যই অনলস অনড়তায় সম্পন্ন করবেনই। কাহারো কোন নিষেধ বা বাধা তাঁর সংকল্পকে নস্যাৎ করতে পারতো না। সেখানে গিরিশচন্দ্র একক, কাহারো জন্য অপেক্ষা করতেন না। তবে 'ভগবানে' বিশ্বাস তাঁকে দুর্গম পথেও একাকী চলার শক্তি ও আলো দেখিয়ে দিত—এটা শৈশবকালে রামায়ণ, মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্রের কাহিনীর অন্তরস্থল থেকে তিনি লাভ করেছিলেন। তারজন্য তিনি কোনদিক থেকেই কোন প্রশংসা বা সার্টিফিকেট আকাঙ্ক্ষা করতেন না।

পাড়ার পুকুরে এক ব্যক্তি জলে ডুবে হাবুডুবু খেতে খেতে প্রাণ হারিয়ে ভেসে উঠল। গিরিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল; কেউ সেই মৃত ভেসে উঠা দেহকে সনাক্ত করতে আসছে কিনা। কিন্তু কেউ এল না—অথচ তার আত্মীয় পরিজনরা সবাই দাঁড়িয়ে রইল আশে পাশে। অবশেষে পুলিশ এসে মৃত ব্যক্তিকে জল থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে বেওয়ারিশ লাশে নিয়ে যাবে—এটা কি করে সম্ভব! এই ভেবে গিরিশ পাড়ার ছেলেদের ডেকে পুকুর থেকে লাশ তুলল, এবং যথাবিহিত পরীক্ষাদির পর দাহকার্য সম্পন্ন করাল।

ভৈরব তার জন্য এতটুকু আগুপিছু ভাবার প্রয়োজন বোধ করল না। মৃত ব্যক্তির পরিজনেরা পরে পালা করে কান্নায় পাড়া মাত করল।

এমনি আর একটি ঘটনা *ভৈরব গিরিশচন্দ্রের* জীবনে ঘটেছিল। বাড়ীর পাশে গঙ্গা। আনমনে প্রায়ই গিরিশ সন্ধ্যায় গঙ্গার তীরে বেড়াতে যান—ভাবেন, কবিতা আওরান। সেদিন হাঁটতে হাঁটতে রসিক নিয়োগীর ঘাটের শ্মশানে এসে দাঁড়াতেই গঙ্গাযাত্রীদের ঘর থেকে একটি ক্ষীণ আর্তনাদ শুনলেন। এদিক ওদিক তাকিয়ে কাছে কাহাকেও না দেখে নিজেই ভেসে আসা আর্তনাদ অনুসরণ করে সেই গংঙ্গাযাত্রীদের ঘরে প্রবেশ করলেন—দেখলেন, মৃত্যুপথযাত্রী একজন বৃদ্ধ বাধা খাটে শুয়ে আছে। তার কোন আত্মীয় পরিজন নেই—যাদের দ্বারা বৃদ্ধ এখানে এসেছেন তারা বৃদ্ধের মৃত্যুর বিলম্ব অনুভব করে তাকে শ্মশানে রেখে চলে গেছে। গিরিশচন্দ্র একবার ঘরের বাইরে, আবার এদিক ওদিকে 'কেউ আছেন, এই বৃদ্ধ লোকের' চিৎকার করে ডাকলেন। কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। বুঝলেন, মৃত্যুপথযাত্রীকে এই ঘরে ফেলে সবাই চলে গেছে। গিরিশচন্দ্র আস্তে আস্তে মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের কাছে এসে তাকিয়ে দেখলেন—বৃদ্ধের শুষ্ক কণ্ঠ—একটু জলের জন্য হা-হুতাস করছেন। বড় কষ্ট হল—বিন্দুমাত্র চিন্তা না করেই গঙ্গা থেকে একটু জল এনে বৃদ্ধের মুখে দিলেন। বৃদ্ধ জল পেলেন—কাতর ছল্ ছল্ চোখে গিরিশের দিকে তাকিয়ে রইলেন—কি যেন বলতে চায়। গিরিশ বুঝলেন, বৃদ্ধের প্রাণবায়ু ক্ষীণ হয়ে আসছে। চিন্তা করতেই দ্রুত গতিতে গৃহ থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে ছুটতে লাগলেন নিকটস্থ গৃহ থেকে একটু দুধ আনার জন্য। **ভৈরবের পরীক্ষা শুরু হল**—দেখতে না দেখতে বিদ্যুৎ গতিতে কোথা থেকে আকাশকে মলিন করে বজ্রসহ ঝড় বৃষ্টি শুরু হল। সেই বৃষ্টির মধ্যে দুধ সংগ্রহ করে শ্মশানের সেই বৃদ্ধের কাছে ছুটে যাবার জন্য রাস্তায় নামলেন—অন্ধকার, চারিদিক জল ভরা রাস্তা—এদিক ওদিক দেখা যায় না—ঝড় ও বজ্র তীব্রভাবে গিরিশকে আটকাবার চেষ্টা করছে—তবুও গিরিশ ছুটছে, হাতে ছোট একটি দুগ্ধ পাত্র অতি যতনে বহন করে ছুটছে। নিকটে আসতেই গিরিশ দেখলেন—ঘরের দরজা বন্ধ। গিরিশ সেই জলঝড়ে বাইরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললেন, দরজা খোল! দরজা খোল!

কেউ উত্তর করল না—দরজা বন্ধই রইল। অবশেষে গিরিশ জোর করে দরজা ঠেলতেই দরজা খুলে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি ঠাণ্ডা শীর্ণ হাত সেই অন্ধকার ঘর থেকে গিরিশের ঘাড়ের উপর পড়ল। গিরিশ চমকে গেলেন—অনেকটা হতবুদ্ধিতে কি করবেন—ইত্যাদি ভাবতে ভাবতে বজ্র-বিদ্যুতের ঝলকে দেখতে পেলেন সেই মৃত্যুপথযাত্রী মুমূর্ষ বৃদ্ধ দরজার পাশে দাঁড়িয়ে। গিরিশচন্দ্র ধীরে ধীরে বৃদ্ধের হাত তুলে দেখলেন, বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। ভয়ার্ত গিরিশ এই দৃশ্যে দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

এদিকে সংসারের বিষয়ে বেশ নির্লিপ্ত গিরিশচন্দ্র। শ্বশুরমশাই নবীনবাবু জামাতার ভাবগতি দেখে বেশ চিন্তিত হলেন। তিনি উদ্যোগ গ্রহণ করে গিরিশচন্দ্রকে বুক কিপিং বিষয়টি রপ্ত করাতে চেষ্টা করলেন। পিতা নীলকমল ঘোষ **'ডবল এন্ট্রি একাউন্ট' এর প্রথম প্রচলন কর্তা ছিলেন।** গিরিশচন্দ্র পিতার বৃত্তিকে সহজে আয়ত্ত করতে মনোনিবেশ করলেন। অফিসের কাজ ও বুক কিপিং—যুগপৎ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে শিখতে লাগলেন।

পরবর্তী জীবন সংসারের অর্থাগমের উপায় এই বুক কিপিং বৃত্তিতে গিরিশচন্দ্রকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল।

।। পাঁচ।।

১৭৮৭ সালে রুশবাসী হেরাসিম লেবেডেফ্ ভারতবর্ষ দেশ ঘুরতে ঘুরতে কলকাতায় এসেছিলেন। কলকাতার মানুষ, তাদের জীবনযাত্রা ও কথাবার্তা সহ আমোদ ও উৎসবের আকর্ষণ লেবেডেফকে বাংলাভাষা শেখার প্রেরণা দিয়েছিল। গোলকনাথ দাস নামে সেসময়ের একজন বাঙালি ভাষাবিদের কাছে লেবেডেফ বাংলা ভাষা শেখেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে 'The Disguise' এবং 'Love is the best Doctor' দুটি ইংরেজি নাটক বাঙলাভাষায় অনুবাদ করেন যা ১৭৯৫-৯৬ সালে বাঙালি অভিনেতা ও অভিনেত্রী সংগ্রহ করে ডোমতলার পুরাতন চীনাবাজারের নিকটস্থ একটি গলিতে *'বেঙ্গলী থিয়েটার'* নামে একটি থিয়েটার তৈরী করে যথারীতি টিকিট বিক্রী করে 'Disguise' অনুবাদ নাটক অভিনয় করান হয়। বাঙালী ধনী ও জমিদার শ্রেণীর কিছু সম্ভ্রান্ত ঐ নাটক দেখে খুশী হন। বাংলা রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় একজন বিদেশী রুশ পর্যটকের দ্বারা—এই তথ্য তখন কলকাতায় গভীরভাবে সংস্কৃতিমগ্ন মানুষ ও সমাজ-নেতাদের ভাবিয়েছিল। *কার্যতঃ ইংরেজী থিয়েটার দেখে কয়েকজন বাঙালির মনে বাংলা রঙ্গমঞ্চ নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা উপ্ত হয়েছিল।* ইংরেজের তৈরী থিয়েটারে দৃশ্যপটের চমক এবং নারী চরিত্রে নারীদের দিয়ে অভিনয় করাবার ঘটনা তখনকার পত্রপত্রিকাগুলিতে বেশ সাড়া জাগিয়েছিল।

হিন্দু কলেজ ও ওরিয়েন্টাল সেমিনারি—এ দুটি বিদ্যালয়ের ছাত্ররা অভিনয় স্পৃহায় খুবই চঞ্চল হয়েছিল—যার জন্য সেকস্‌পীয়রের ইংরেজী নাটকগুলি অভিনয় করে নাটকের ভাব-প্রবাহকে ছড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিল। তবে সেই নাটকগুলি যেহেতু ইংরেজী ভাষায়—তাই সাধারণ বাঙালীর অন্তরকে আকাঙ্ক্ষিত করলেও রস আস্বাদনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছিল। তা ছাড়া অভিনয় করার মত বাংলা নাটকও তেমন তখন ছিল না।

বাংলার সামাজিক জীবনধারায় কৌলিন্য ও বহু বিবাহপ্রথা গভীরভাবে পত্র পত্রিকায় আলোচনার বিষয় ছিল। রঙ্গপুরের সমাজহিতৈষী জমিদার কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী

বহুবিবাহ তথা কৌলিন্য প্রথায় দেশ ও সমাজের ঘৃণ্যরূপ দেখে বিচলিত হয়েছিলেন। তিনি উক্ত বিনষ্টকারী বিধি ব্যবস্থাকে ধিক্কার দিয়ে জন সাধারণের জন্য এর কুফল সম্পর্কে জানাবার জন্য নাটক রচনা করার জন্য 'রঙ্গপুর বার্তাবাহ' পারিতোষিক সহ বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। সেই বিজ্ঞাপনের সূত্রে পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় *'কুলীনকুলসর্বস্ব'* এই নামে নাটক রচনা করেন।

এই 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকটি ১৮৫৭ সালে পাথুরিয়াঘাটার অন্তর্গত চড়ক ডাঙ্গায় জয়রাম বসাকের বাড়ীতে অভিনীত হয়। সেইসময় থেকেই নাটকের প্রতি, বিশেষ করে নানা দৃশ্যসজ্জার পরিপাটি সহ অভিনয় দর্শকদের আকর্ষন করেছিল সত্য কিন্তু বাংলা নাটকের তাতে চাহিদা বেড়ে যেতে লাগল।

সেই বৎসর (১৮৫৭) থেকে পরপর দশ বৎসর কলকাতার মান্যগণ্য ধনী ব্যক্তিদের বাড়ীতে বা প্রযোজনায় অনেকগুলি বাংলা নাটকের অভিনয় হয়—তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সিমলার ছাতুবাবুর বাড়ীতে (শকুন্তলা), কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়ীতে (বেণীসংহার), পাইকপাড়ার মহারাজা প্রতাপ নারায়ণ সিংহের বেলগাছিয়ার বাড়ীতে (রত্নাবলী), গোপাললাল মল্লিকের বাড়ীতে (বিধবা বিবাহ), মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পাথুরিয়াঘাটার বাড়ীতে (বিদ্যাসুন্দর-মালতীমাধব-রুক্মিণীহরণ-মালাবিকাগ্নিমিত্র), জোঁড়াসাকো দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাড়ীতে (নব নাটক), শোভাবাজার রাজবাড়ীতে (কৃষ্ণকুমারী) পাঁচকড়ি মিত্রের আপার চিৎপুর রোডের বাড়ীতে (পদ্মাবতী প্রভৃতি)।

সখের থিয়েটার, তখন বড় লোকের বাড়ীর চৌহদ্দীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। আত্মীয় পরিজনদের কিন্তু সাধারণ স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যেও নাটক দেখার আকাঙ্ক্ষা থাকলেও তেমন সুযোগ ছিল না। কারণ সেইসকল সখের থিয়েটারে টিকিটের ব্যবস্থা থাকত।

বাগবাজারের বসুপাড়ার একজন ভদ্রলোক একটি টিকিট কিনে এনে পাড়ায় ঘুরে ঘুরে সকলকে দেখাতেন পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ীর থিয়েটার দেখার জন্য— সেই দৃশ্যে গিরিশচন্দ্রের অন্তরে থিয়েটারের একটা কাল্পনিক আস্বাদনের মেজাজ গড়ে উঠেছিল। থিয়েটার দেখার চেয়ে থিয়েটারে অভিনয় করার কৌতুহল গিরিশচন্দ্রের অন্তরজুড়ে আকাঙ্ক্ষা বাসা বেঁধেছিল। কিন্তু তাৎক্ষণিক তার সফলতা এল না।

পাড়ায় প্রতিবেশী নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তার বাড়ীতে একটি কনসার্টের দল গড়েছিলেন। গিরিশচন্দ্র মাঝে মাঝে সেখানে যেতেন এবং থিয়েটারের মেজাজে মশগুল হতেন। থিয়েটারের খরচ অনেক— সে তুলনায় বাড়ীর নিজস্ব 'যাত্রা'র খরচ অনেক কম—এই ভাবনায় স্থির হল থিয়েটার এখুনি নয়—যাত্রা দিয়ে মনের আকুতি পূর্ণ করা যেতে পারে। যেই ভাবা সেই কাজ—পাড়ার নগেন্দ্রবাবুকে সামনে রেখে গিরিশচন্দ্র

বন্ধু ধর্মদাস সুর ও রাধামাধব কর—এদের নিয়ে সখের যাত্রা সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করলেন। *মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' যাত্রার প্রথম অভিনয়*। যাত্রায় গান অপরিহার্য। তাই 'শর্মিষ্ঠা' অভিনয়ে গান রচনার জন্য গিরিশচন্দ্র কয়েকবার সেকালের প্রসিদ্ধ গান রচয়িতা প্রিয়মাধব বসু মল্লিকের কাছে অনুরোধ জানান। কিন্তু তাতে মল্লিকবাবু গিরিশচন্দ্রের অনুরোধ মান্য করলেন না। এদিকে যাত্রার রিহার্সেলে পুরো মাত্রায় প্রায় প্রতিদিন গিরিশচন্দ্র উপস্থিত থাকেন। কিন্তু গান!— গান না হলে যে যাত্রার মর্যাদা থাকবে না।

এমনি পরিস্থিতিতে একদিন খুব ভোরে গিরিশচন্দ্র পাড়ার বন্ধু উমেশ চৌধুরীর বাড়ী গেলেন এবং যাত্রার গানের ব্যাপারে আলোচনা করলেন। উমেশবাবুও বেশ বিব্রত হলেন। গিরিশ বেশ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বন্ধুর হাতে হাত রেখে উৎফুল্ল সহকারে প্রত্যয়নিষ্ঠ ভাবনায় বললেন

...এত কষ্ট কেন? আয়, আমরা দু'জনে যেমন পারি, গান বাঁধি..।

কিন্তু গান বাঁধা বললেই তো গান বাঁধা যায় না! বেশ কিছুক্ষণ উভয়ে ভাবলেন। গিরিশচন্দ্র বললেন, ভাই উমেশ আজ বাড়ী যাই—একান্ত নির্জনে বিষয়টি ভাবি—আজ আর রির্হাসেলে যাব না।

গিরিশচন্দ্র বাড়ী এসে সারারাত নানা ভাবনার সমুদ্র পাড়ি দিতে দিতে গানের পাড় পেলেন—ভোরে। খুবই ভোরে প্রস্তাবিত 'শর্মিষ্ঠা'র কাহিনীর সঙ্গে ঘটনার যোগাযোগ রেখে গান রচনা করলেন।

নাটকের একটি অংশ যযাতি দেবযানীকে কূপ থেকে উদ্ধার করার পর—

আহা! মরি! মরি!
অনুপমা ছবি, মায়া কি মানবী,
ছলনা বুঝি করে বনদেবী!
রঞ্জিত রোদনে বদন অমল,
নয়ন কমলে নীর ঢল, ঢল,
নিতম্ব চুম্বিত বেণী আলোড়িত
বিমোহিত চিত্ত হেরি মাধুরী।।
জনহীন হেন গহন কাননে,
এ কূপ ভীষণে, পড়িল কেমনে,
কি ভাবে ভামিনী, ত্যজিয়া ভবনে,
আসিয়াছে এই স্থানে—
দারুণ কঠিন এর পরিজন
তাই একাকিনী রমণী রতন
কেবা এ কামিনী, কেন অনাথিনী
পাগলিনী বুঝি প্রিয় পরিহরী।।

।। ছয় ।।

দীর্ঘদিন *'শর্মিষ্ঠা'*র যাত্রাভিনয় পাড়ার পর পাড়া বেশ সোরগোল ছড়িয়ে পড়ল— যাত্রার সুনাম বাড়তে লাগল। গিরিশচন্দ্র তাতে আরও বেশী মানসিকভাবে এবার আক্রান্ত হলেন থিয়েটার করার। কিন্তু থিয়েটারের জন্য দৃশ্যপট, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং আরো ইত্যাদির জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন। সেই অর্থ যোগান দেবার লোক তখন পাওয়া গিরিশচন্দ্রের কাছে নানা কারণে অসুবিধা ছিল। কিন্তু 'থিয়েটার' তাকে করতেই হবে। এদিকে দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের আকর্ষণকারী নূতন নাটক *'সধবার একাদশী'*র কাহিনী বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। গিরিশচন্দ্র দেখলেন, অতি সাধারণ বাঙালি পোষাকে নাটকের অভিনয় হতে পারে। বন্ধু নগেন্দ্রবাবুর সঙ্গে গিরিশচন্দ্র আলোচনা করলেন। নগেন্দ্রবাবু অনেকক্ষণ ভাবনা চিন্তার পর গিরিশচন্দ্রের মানসিক আকুলতায় ইন্ধন দেবার জন্য ইতিবাচক সম্মতি দিলেন। **শুরু হল 'সধবার একাদশী' নাটকের মহড়া**—বাগবাজারের পাড়ায়। 'শর্মিষ্ঠা' যাত্রার অভিনয় যারা করেছিলেন তাদের থেকেই বেছে নিয়ে 'সধবার একাদশী'র নাটকটিতে গিরিশচন্দ্রকে অভিনয় শিক্ষক ও পরিচালকরূপে ছেলেরা স্থির করে এগিয়ে যেতে লাগল।

সেসময় গিরিশচন্দ্র একদিকে 'জন অ্যাটকিনসন কোম্পানী'তে সহকারী বুক কিপিংয়ের কাজ করছেন—আর বাড়ীতে এসে গভীর রাত পর্যন্ত নানা ইংরাজী বই পড়তেন, অনুবাদ করতেন। অবশেষে 'সধবার একাদশী' নাটক অভিনীত হল। বাংলা নাট্যজগতের সাধারন রঙ্গশালার বীজ রোপিত হল। গিরিশচন্দ্র এ বিষয়ে দীনবন্ধু মিত্রকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন,

> ..... যে সময় 'সধবার একাদশী'র অভিনয় হয়, সে সময় ধনাঢ্য ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত নাটকাভিনয় করা এক প্রকার অসম্ভব হত, কারণ পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতিতে রোজ বিপুল ব্যয় হত। তা নির্বাহ করা সাধারণের সাধ্যাতীত ছিল। কিন্তু আপনার সমাজচিত্র 'সধবার একাদশী'তে অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই। সেজন্য সম্পত্তিহীন যুবকবৃন্দ মিলে 'সাধবার একাদশী' অভিনয় করতে সক্ষম হয়। মহাশয়ের নাটক যদি না থাকত, এ সকল যুবক মিলে *'ন্যাশনাল থিয়েটার'*স্থাপন করতে সাহস করত না। ....

সওদাগরী অফিসে কাজেরও চাপ তীব্র। 'বুক কিপার' স্বাভাবিকভাবেই কোম্পানীর হিসাব-নিকাষের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—তাই সময় অতিরিক্ত কাজ করতে হোত গিরিশচন্দ্রকে। অফিসের কাজ শেষ করেই তিনি বাড়ীতে এসেই এতটুকু বিশ্রাম না করেই নাটক শিক্ষার আখড়ায় ছুটে যেতেন এবং অনলস পরিশ্রমে নাটকের চরিত্র রূপায়ণে ঘটনার সঙ্গে তাল রেখে অভিনয়ের কৌশল ও ভাব-ভঙ্গির নির্দেশ দিতেন। নাটকের (সধবার একাদশী) মহড়ার প্রচার

সধবার একাদশী

তখন বাগবাজারের পাড়ার অলিতে গলিতে একটা আলাদা উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল। 'সধবার একাদশী' নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের রূপদানে গিরিশচন্দ্র অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তিত ছিলেন। নাটকের 'কেনারামের' ভূমিকা সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র বেশ ভেবেছিলেন। বন্ধুবর নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী নামে একজন ভবঘুরে অভিনেতার সন্ধান পেলেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মাতুল পুত্র অর্ধেন্দুশেখর শৈশব থেকেই নাটক করে এসেছেন। বিশেষ করে সেসময় খুবই প্রচলিত 'বুঝলে কিনা' প্রহসনে তাঁর অভিনয় সকলের কাছে প্রিয় ছিল। গিরিশচন্দ্র সেই 'কেনারাম' চরিত্রটি অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফীকে ঠিক করলেন। **আর গিরিশচন্দ্র নিজে 'নিমচাঁদের' ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে প্রথম অবতীর্ণ হলেন।**

১৮৬৯ সালের দুর্গাপূজার সময় মুখার্জী পাড়ার প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়ীতে *'সধবার একাদশী'* প্রথম অভিনীত হয়।

'নিমচাঁদের' অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র যেভাবে মূল নাটকের ইংরেজী কাব্যের আবৃত্তি করেছেন তা অভাবনীয় চমকসৃষ্টির অনন্য উপহার। বাঙলা রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনয়ে এমন চরিত্র চিত্রন গিরিশচন্দ্রকে ভবিষ্যতের নট-রাজপথে দাপটের সঙ্গে বিচরণের প্রবেশপত্র বিনাদ্বিধায় আপনা থেকেই নিয়ে এল যা বাংলা রঙ্গমঞ্চের আর কারুর জীবনে সম্ভব হয়নি।

মিসেস লুইস্ নামে আমেরিকান নাট্যরসিকা সেসময় *থিয়েটার রয়েল* ভাড়া করে কলকাতায় থিয়েটার করতেন। থিয়েটার রয়েল ছাড়াও *অপেরা হাউস* সেসময়ে এ দুটি সাধারন থিয়েটার ইংরেজ রসিকদের দ্বারা পরিচালিত হত।

গিরিশচন্দ্র সেসময় অ্যাটকিনসন টিলটন কোম্পানীতে বুক কিপিংয়ের কাজ করতেন। তখন বয়স প্রায় কুড়ি। মিসেস্ লুইসের সঙ্গে অ্যাটকিনসন সাহেবের যোগাযোগ ছিল। লুইস প্রায়ই অ্যাটকিনসনের অফিসে আসতেন—সেসময় **লুইসের সাথে গিরিশচন্দ্রের পরিচয় হয়।** দেখতে দেখতে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে লুইসের পরিচয় গভীর হয়। লুইস ভাল অভিনয় করতেন—কলকাতায় ধনী-মান্য লোকদের কাছে তাঁর নাম ও গুণ গভীর রেখাপাত করত। গিরিশচন্দ্রও কোন কোন সময় মিসেস লুইসের অভিনয় দেখতে যেতেন। লুইস গিরিশচন্দ্রের কাছে অভিনয়ের ভালমন্দ সমালোচনা শুনতে চাইতেন। গিরিশচন্দ্র দ্বিধাহীনভাবে তা বর্ণনা করতেন। তাতে মিসেস লুইসের ধারণা গিরিশচন্দ্রের প্রতি গভীর হোল। অনেকসময় লুইস গিরিশচন্দ্রকে সঙ্গে করে নাটক দেখতে এবং নাটকের সমালোচনা শুনতে নিয়ে যেতেন। গিরিশচন্দ্রের অন্তরে নাটকের, বিশেষ করে ইংরেজী নাটকের অভিনয়ের অভিব্যক্তির বীজ লুইসের সান্নিধ্যে ধীরে ধীরে উপ্ত হতে থাকে। নাট্য প্রতিভার বিকাশ ব্যক্তি জীবনের মধ্যে অত্যন্ত সন্তর্পনে সঞ্চিত করতে করতে 'সাধবার একাদশী' নাটকে নিমচাঁদের চরিত্র

চিত্রনে প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটল যা গিরিশচন্দ্রকে বরণীয় করে নেওয়া হল। অ্যাটকিনস সাহেবের কাছে কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে গিরিশচন্দ্র ইংরেজী নাটকের, বিশেষ করে সেকস্‌পীয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটকের তর্জমা করেছিলেন—যা পরবর্তী সময়ের অভিনয়েও তার আঙ্গিক ভাবনায় গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছিল।

পরপর কয়েকবার 'সাধবার একাদশী' নাটকটি বাগবাজার পেরিয়ে গড়পারে শ্যামবাজারে বিভিন্ন নামজাদা নাগরিকদের বাড়ীতে অভিনীত হয়। নাটকটির চতুর্থ অভিনয় হয় দেওয়ান রামপ্রসাদ মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে। সেখানে নাট্যকার স্বয়ং দীনবন্ধু মিত্র ও তাঁর বন্ধু বিজু বাহাদুর, গোপাল মিত্র, দুর্গাদাশ কর সহ অনেক বুদ্ধিজীবী উপস্থিত ছিলেন। গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ে দীনবন্ধু মিত্র বললেন,

.... তুমি না থাকলে এ নাটক অভিনয় হত না। নিমচাঁদ যেন তোমার জন্যই লেখা হয়েছিল।

দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় গিরিশচন্দ্র ও তার সম্প্রদায়ের 'সাধবার একাদশী' নাটকের সফলতায় খুবই খুশী হয়েছিলেন শুধু নয় গিরিশচন্দ্রকে বাড়ীতে ডেকে বললেন,

..... গিরিশ এবার আমার 'লীলাবতী' নাটকটি মঞ্চস্থ কর—এবং তোমার সুযোগ্য পরিচালনায় এর অভিনয় আমি দেখতে চাই....

।। সাত ।।

গিরিশচন্দ্র উৎসাহিত—'লীলাবতী' নাটকের মহড়া শুরু করেন এবং পরবর্তী সময়ে শ্যামবাজারের রাজেন্দ্রলাল পাল মহাশয়ের বাড়ীতে মঞ্চ তৈরী করে 'লীলাবতী' অভিনয় করেন।

লীলাবতী

একদিন 'সাধবার একাদশী' অভিনয়ের মধ্যদিয়ে বাংলা সাধারণ নাট্যশালার যে বীজ রোপিত হয়েছিল 'লীলাবতী' নাটকের অভিনয়ের সাফল্যে সেই বীজ অঙ্কুরিত হোল।

বহু নাট্যরসামোদী যুবক তখন গিরিশচন্দ্রের কাছে নাটকে অভিনয় করার জন্য আসতেন। তাদের উৎসাহ ও ঐকান্তিক অভিপ্রায়ে গিরিশচন্দ্র খুবই আহ্লাদিত। স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ তৈরীর স্বপ্ন আস্তে আস্তে তাঁর চিত্তে বাসা বাঁধছে—এই অবসরে মনে মনে স্থির করলেন বেলগাছিয়া ও পাথুরিয়াঘাটার রাজাদের মত একটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করা। তারজন্য অর্থ দরকার। গিরিশচন্দ্র নব্য-আগত যুবকদের উৎসাহ দেখে ভরসা পেলেন—তাদের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করলেন স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নির্মাণের জন্য। কিন্তু অর্থ সংগ্রহে চাঁদার খাতা বিপর্যস্ত হোল অনেক বিত্তবান মানুষের টিট্‌কারী ও অসহযোগমূলক বাক্যবাণে।

কিন্তু গিরিশচন্দ্র হতাশ হননি। অনতিবিলম্বে গিরিশচন্দ্র সহায় পেলেন 'সধবার একাদশী' নাটকের দ্বিতীয় অভিনয় যে বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই ব্রজনাথ দেব মহাশয় এগিয়ে এলেন স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নির্মাণের সংকল্প নিয়ে। ব্রজনাথ দেব ও গিরিশচন্দ্র যুক্ত ভাবনায় মঞ্চ নির্মাণের পরিকল্পনা করতে করতে অর্থের বিরাট অংকও লাভ করলেন নানাভাবে। তবুও গিরিশচন্দ্রের অবসর নেই—নিজ কাজ এবং নূতন নাটকের মহড়া—মহড়ায় তিনি নিয়মিত উপস্থিত থাকতে পারতেন না, কারণ প্রিয় বন্ধু সহচর ব্রজবাবুর অসুস্থতা—তাঁকে দেখতে যেতে হয়। তাই 'লীলাবতী' অভিনয়ের প্রস্তুতিতে বেশ ভাঁটা পড়তো। এদিকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয় চন্দ্র সরকার মহাশয়দের উদ্যোগে 'লীলাবতী'র একটু কাঁটছাট করে অভিনয় হয় চুঁচুড়ায়। তাতে নাটকের অভিনয়ের সুখ্যাতি তখন সর্বত্র। এমনি সংবাদে গিরিশচন্দ্র উত্তেজিত। মনে মনে সংকল্প করলেন 'লীলাবতী' নাটকের কিছুমাত্র অংশ বাদ না দিয়ে পুরো নাটকটি অভিনয় করে চুঁচুড়ার অভিনয় খ্যাতিকে ম্লান করতেই হবে। গিরিশচন্দ্র আহার নিদ্রা তুলে রাখলেন—সময়ে অসময়ে যখনই সময় পেতেন 'লীলাবতী' নাটকের মহড়ার ছোট ছোট অংশগুলিকে সার্থক আকর্ষনীয় করার জন্য চিন্তা করতেন।

অবশেষে ১৮৭১ সালের জুলাই মাসে শ্যামবাজারের রাজেন্দ্রলাল পালের বাড়ীতে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করে ধর্মদাস সুর মহাশয়ের তৈরী দৃশ্যপটের সুঠাম পরিণত পরিচ্ছন্ন পরিবেশে 'লীলাবতী' নাটক অভিনীত হোল। গিরিশচন্দ্রের বড় শ্যালক এই ব্রজনাথ দেব গিরিশ অনুগামী নাট্যামোদী ছিলেন। বহু নাটকের স্টেজ ও তৎসম্পর্কিত নানা অনিবার্য কাজ ব্রজবাবু অত্যন্ত সহিষ্ণুতার সঙ্গে করতেন। ব্রজবাবু নানা কাজের ফাঁকে ফাঁকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার কাজ করতেন এবং পাড়া প্রতিবেশীদের যে কোন পীড়ায় ব্রজবাবুর ঔষধ খুবই কার্যকর ছিল।

গিরিশচন্দ্র এই ব্রজবাবুর কাছেই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার কলাকৌশল শিখেছিলেন—যা পরবর্তী সময়ে ব্যস্ত জীবনে এবং বেদনাসিক্ত জীবনে তাঁকে সেবাকাজের নিঃস্বার্থ বিমল আনন্দ দান করেছিল।

কঠিন পীড়ায় ব্রজবাবুর মৃত্যু হয়। কিন্তু পাড়ায় ব্রজবাবুর অভাব অনেকাংশে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় বিনা পয়সায় যথাবিহিত ঔষধ প্রদানের সূত্রটি গিরিশচন্দ্র ধরে রেখেছিলেন। স্থানীয় বন্ধুরা গিরিশচন্দ্রের রোগ নির্ণয় ও ঔষধ নির্বাচনের ধারায় খুবই বিশ্বাস করতেন।

একবার গিরিশচন্দ্রের পাড়ার এক মাতাঠাকুরানীর অন্তিম অবস্থায় তৎকালের নিয়ম অনুসারে গঙ্গাতীরে নিয়ে যাওয়া হল। গিরিশচন্দ্রের একজন বন্ধু গিরিশচন্দ্রকে সাথে করে গঙ্গাতীরে সেই মাতাঠাকুরানীকে দেখতে যান। বৃদ্ধার শরীরের অবস্থা ভালভাবে দেখলেন, বললেন, তেমন কিছু নয়—ঔষধ দিচ্ছি—লোক পাঠিয়ে দেবেন

ঔষধ দিয়ে দেব। এই বলে গিরিশচন্দ্র নিজের বাড়ী চলে এলেন এবং ব্রজবাবুর চিকিৎসার বইগুলি নাড়াচাড়া করে ঔষধ ঠিক করলেন এবং ঔষধ তৈরী করলেন—কিন্তু কেউ ঔষধ নিতে এলেন না—গিরিশচন্দ্রের ঔষধের প্রতি তাদের বিশ্বাস নেই। এদিকে প্রতিদিন মাতাঠাকুরানীর আত্মীয় পরিজনরা বৃদ্ধার অবস্থা দেখবার জন্য গিরিশচন্দ্রের বাড়ীর পাশ দিয়েই প্রতিদিন যাওয়া আসা করেন। গিরিশচন্দ্র তাদের দেখতেন কিন্তু কিছু বলতেন না। যারা গিরিশচন্দ্রের নির্ধারিত ঔষধ গ্রহণ করত তারা প্রায়ই রোগীর অবস্থা তাঁকে জানিয়ে যেত। আবার অনেকে নিজেদের ইচ্ছায় চুপচাপ থেকে যেতো—এমন রোগী প্রথম ঔষধ সেবনে ভাল হয়ে গেছে—তাই গিরিশচন্দ্রকে খবর দেবার আগ্রহ বোধ করেননি। এমন রোগীর সংখ্যাই বেশী—তাই মাঝে মধ্যে গিরিশচন্দ্র চিকিৎসা ব্যবস্থায় নিজেকে যুক্ত রাখতে চাইতেন না—বিরক্ত বোধও করতেন।

'সধবার একাদশী' অভিনয়কালে গিরিশচন্দ্র অভিনয় সম্প্রদায় নামকরণ করেছিলেন *'বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটার'*। আজ 'লীলাবতী' নাটকের মধ্য দিয়ে নামের নবায়ন হোল *'ন্যাশন্যাল থিয়েটার'*। **'লীলাবতী' নাটকে গিরিশচন্দ্র 'ললিতের' ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন**। বহু মান্য মানুষ সেদিনের অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন। 'লীলাবতী' নাটকের কবিতাগুলির পাঠ ও ভাব-বিন্যাসে অভিনয়দীপ্তির প্রকাশ্য সঞ্চার নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র, যিনি সেদিন উপস্থিত ছিলেন, মহাশয়ও মুগ্ধ ও পুলকিত হয়েছিলেন।

গিরিশচন্দ্র 'সধবার একাদশী' ও 'লীলাবতী' নাটক দুটিতে অভিনয়কালে কয়েকটি গান রচনা করে নাটকের উপযুক্ত ক্ষণে গাইবার ব্যবস্থা করেছিলেন। আপন স্বকীয় ভাবনার অভিসিঞ্চন গিরিশচন্দ্রের মানসিক শক্তিকে গভীরভাবে যুক্ত করেছিল।

ঘরের কাজ, বাইরের কাজ তার উপর হোমিওপ্যাথ চিকিৎসার মাধ্যমে পাড়া প্রতিবেশীদের শুশ্রূষার ভাবনায় গিরিশচন্দ্র বেশ আনন্দ পেতেন। ক্লান্তি আর ক্ষতি এই দুইয়ের ভাবনা থেকে তিনি নিজেকে শোধন করে এগিয়ে যেতে পিতার কাছ থেকেই নির্দেশ পেয়েছিলেন।

এদিকে 'সধবার একাদশী' ও 'লীলাবতী' নাটক দুটির অভিনয় সাফল্য দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়কে উৎসাহিত করল তাঁর পরবর্তী নাটক 'নীলদর্পন' গিরিশচন্দ্র কর্তৃক ন্যাশন্যাল থিয়েটারের উদ্যোগে মঞ্চস্থ করার। গিরিশচন্দ্রকে নিজে ডেকে তাঁর অভিপ্রায় জানালেন দীনবন্ধু মিত্র।

গিরিশচন্দ্র উদ্যোগ নিলেন—যথারীতি নাটকের মহড়া চালাতে অর্থ প্রয়োজন। চাঁদা তোলার কাজ শুরু হল। বাগবাজারের অন্নপূর্ণা ঘাটের চাঁদনীর উপর বারদ্বারী বৈঠকখানায় নাটকের মহড়া চলতে চলতে অবশেষে গঙ্গার উপর মনোরম একটি স্থানে নাটকের মহড়ার গতি তীব্র হতে চলল। মহড়া চলাকালীন কিছু যুবক গিরিশচন্দ্রের কাছে প্রস্তাব করলেন- –'নীলদর্পন' নাটকের দৃশ্যপট সহ অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের জন্য

অর্থ দরকার—আর সেই অর্থ চাঁদা থেকে না তুলে অভিনয়ে টিকিট বিক্রী করে আদায় করা যেতে পারে।

গিরিশচন্দ্র ভাবলেন। পরে তিনি টিকিট বিক্রয়ের প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারলেন না। তিনি সহজভাবে সরাসরি বললেন,

> .... আমাদের রঙ্গমঞ্চে, দৃশ্যপট ও অন্যান্য সাজ সরঞ্জাম এখনও এরূপ উৎকর্ষ লাভ করতে পারে নি, যাতে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামকরণ পূর্বক টিকিট বিক্রী করে সাধারণের সামনে আসা যায়। 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামেই অনেকে মনে করবেন এই থিয়েটার দেশের সমস্ত ধনী ব্যক্তিদের সমবেত চেষ্টার ফল—ইহা জাতীয় রঙ্গমঞ্চ। কিন্তু কতকগুলি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ যুবা একত্র হয়ে ক্ষুদ্র সাজ-সরঞ্জামে ন্যাশনাল থিয়েটার করছে ইহা খুবই বিসদৃশ হবে।

টিকিট বিক্রী করে থিয়েটার করায় সায় নেই গিরিশচন্দ্রের, তাতে অনেকেই গিরিশচন্দ্রের উপর বিরক্ত হন এবং তাঁর কথা মানতে চাইলেন না। বিশেষ করে নব-যুব-সম্প্রদায়, যারা নাটকের প্রতি উৎসাহিত হয়ে এসেছিল—তাদের মানসিকতায় গিরিশচন্দ্রের প্রস্তাব তারা গ্রহণ করলেন না।

গিরিশচন্দ্র বাধ্য হয়ে ন্যাশনাল থিয়েটারের 'নীলদর্পনের' আয়োজন থেকে সরে এলেন।

টিকিট বেচে নাটক নয়—এই মতবাদে গিরিশচন্দ্রকে হেয় করার অভিপ্রায়ে অনেকেই—তাদের মধ্যে গিরিশ অনুগামীরাও ছিলেন। নানা ছলা কলায় পত্র পত্রিকায় (বিশ্বকোষ) পত্রস্থ করে গিরিশ ভাবনাকে নস্যাৎ করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। 'ন্যাশনাল থিয়েটার' সেই থেকে চলার পথে বিভিন্নভাবে অগ্নিপরীক্ষার কঠিনতম পথে আপন সত্তার আলোকে উদ্‌ভাসিত হবার শক্তি সংগ্রহ করছিল ধৈর্য্য ও উত্তেজনাহীন পদক্ষেপে।

।। আট ।।

অনেক ঝড় তান্ডব পেরিয়ে অবশেষে ন্যাশন্যাল থিয়েটারে টিকিট ছাড়া অভিনয় দেখার ভাবনার বাইরে ১৮৭২ সালে সাধারণ নাট্যশালা (Public Theatre) নাম দিয়ে টিকিট বিক্রয়ের মধ্যদিয়ে 'নীলদর্পন নাটক অভিনীত হয়। বহু মান্যগণ্য দর্শকের উপস্থিতিতে নাটকটি অভিনীত হয়। গিরিশচন্দ্র সেখানে নেই—নেই নীলদর্পনের মূল যোগ্য দাপুটে নাটুকে। এটা নাট্যজগতে গিরিশের অনুপস্থিতির শূণ্যতার স্বীকৃতি। গিরিশচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে পর পর দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাই বারিক-নবীন তপস্বিনী-বিয়ে পাগলা বুড়ো' নাটক মঞ্চস্থ হয়।

'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় গিরিশচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন—গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ের তারিফ করতেন। গিরিশচন্দ্রের মানসিক সততা তথা চরিত্রের দৃঢ়তায় নাটকের উৎকর্ষ আদর্শবোধকে গভীরভাবে স্থান দিতেন—তাই শিশিরকুমার ঘোষ গিরিশচন্দ্রের পরম হিতৈষী ছিলেন। সেইসময় শিশিরকুমার ঘোষের 'নয়েশো রুপেয়া' সামাজিক নাটকটি ন্যাশনালে মঞ্চস্থ হয়েছিল। তাতে গিরিশচন্দ্রের উদ্যোগ ও পরামর্শ ছিল। নাটকটির সফলতা 'পরবর্তী সময়ে ন্যাশনাল থিয়েটারের নাটকের ক্ষুধা তীব্র হয়ে উঠলো। গিরিশচন্দ্র তখন মধ্যমণি। কথায় কথায় নূতন নাটকের

কৃষ্ণকুমারী

ভাবনায় মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী' সেই পুরাতন মঞ্চ-সফল নাটকের কথা ভেসে উঠল। বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে ন্যাশনাল থিয়েটারের সম্প্রদায় কাগজ কলমে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের বিভিন্ন চরিত্র কেকে অভিনয় করবেন তা ছক কষা হয়ে গেল। বিভ্রান্তি দেখা দিল নাটকের 'ভীমসিংহে'র চরিত্রে কে অভিনয় করবে! সবাই গিরিশচন্দ্রের কথা ভাবল—শুধু ভাবা নয়, দল বেঁধে সবাই গিরিশচন্দ্রকে অনুরোধ করল 'ভীমসিংহ' চরিত্র চিত্রণে সম্মত হবার। কিন্তু গিরিশচন্দ্র পেশাদারী নাটকের টিকিট বিক্রয় করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাই অনেকটা নানা অজুহাতে এড়িয়ে যেতে চাইলেন। ন্যাশন্যালের ছেলেরা বাড়ীতে গিয়ে গিরিশচন্দ্রকে রাজি করানোর জন্য সচেষ্ট হোল। শৈশবের-বন্ধুদের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না। তবে একটি শর্তে—তা হল সম্পূর্ণ অবৈতনিকভাবে এবং বিজ্ঞাপনে নাম না প্রকাশ করে 'ভীমসিংহ' চরিত্র চিত্রণে সম্মতি জানালেন। যথাদিনে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের অভিনয় ১৮৭৩ সালে ন্যাশনাল থিয়েটারে মঞ্চস্থ হল—**'ভীমসিংহ' চরিত্রে অভিনয় করলেন গিরিশচন্দ্র**। কিন্তু বিজ্ঞাপনে উল্লেখিত হল ভীমসিংহ 'by a distinguised amateur' কথাটি লেখা ছিল।

এর আগে 'ভীমসিংহ' চরিত্রটি অভিনয় করে নাট্যরসিকদের কাছে বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় সবিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। কিন্তু সেই খ্যাতির বিপুলতাকে অনেকটা ম্লান করে দিলেন গিরিশচন্দ্র 'ভীমসিংহ' চরিত্রের ভাব-সমৃদ্ধ অন্তর-ভেদী আকুতি ও অনুভবের নাটকীয় বিচ্ছুরণের গতিতে। বেদনাহত হৃদয়ের ক্ষোভ দানা বাঁধিয়ে প্রতিহিংসার ক্রোধ ছড়িয়ে দেবার রূপ-কল্প 'মানসিংহ-মানসিংহ-মানসিংহ' তিন তিনবার উচ্চারণের লয় - গতি এমনভাবে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র যার প্রভাব নাটক শেষ হবার পরও দর্শকের চিত্তলোক ও 'মননের পটে সেই ধ্বনি সম্বলিত ভাবানুস্বর—প্রক্ষেপ ঘুরে ঘুরে বেড়াত।

গিরিশচন্দ্র প্রথম থেকেই বহিঃপ্রকাশের চেয়ে অন্তর অনুরণনে ভাবকে আশ্রয় করতে সচেষ্ট। আপন পিতার চরিত্রে ও দৈনন্দিন জীবন-ধারায় নানাভাবে শোকে ও অভাবজনিত বেদনায়, আত্মীয় পরিজনের দু'ব্যবহাররূপ ঘটনায় যেভাবে অন্তরশক্তির

প্রকাশ করতেন, ক্রন্দনকে এতটুকু সুযোগ না দিয়ে ক্রন্দনের ভাব-তরঙ্গে-রসায়িত ব্যবহারে গিরিশচন্দ্র দর্শকদের অভিনয় কলায় কাঁদিয়ে দিতেন।

শোনা যায়, রানী ভবানীর বংশধর নাটোরের 'রাজা চন্দ্রনাথ রায় ন্যাশন্যাল থিয়েটারে কৃষ্ণকুমারী নাটক দেখতে এসে ভীমসিংহের চরিত্র চিত্রণে গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ে এমনই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, নাটক শেষ না হতেই চন্দ্রনাথবাবু নিজের রাজ পরিচ্ছদ খুলে গিরিশচন্দ্রকে সাজিয়ে দিলেন এবং নিজের তরবারি ভীমসিংহরূপী গিরিশচন্দ্রকে দিলেন।

গিরিশচন্দ্র মুগ্ধ - আনন্দিত হয়ে কিছুক্ষণ বাকশূণ্য হলেন - তারপর আস্তে আস্তে রাজপোষাক তরবারী খুলে থিয়েটারের লোকদের হাতে তুলে দিলেন।

।। নয়।।

'কৃষ্ণকুমারী'র সফল অভিনয় - বিশেষ করে গিরিশচন্দ্রের অভিনয় কলকাতাবাসীকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছিল - নাটক - থিয়েটারের নব সন্ধানে নাট্যমোদীদের আনন্দ ঝরে ঝরে পড়ছিল পাড়ায় পাড়ায় এখানে ওখানে চায়ের দোকানে আর বটতলা - অশত্থতলায় প্রবীনদের আলোচনায়।

ন্যাশন্যাল থিয়েটারের কর্মকর্তাগণ এরপর স্থির করলেন বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' অভিনয় করবেন। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসকে নাটকের আঙ্গিকে এনে সংলাপ ও দৃশ্য ইত্যাদি ভালভাবে নজর দিয়ে করা হল। তখন ন্যাশনাল থিয়েটারের ডিরেক্টর

কপাল কুণ্ডলা

গিরিশচন্দ্র। প্রস্তুতির সব দিক যখন তুঙ্গে ঠিক সেসময় খোঁজ করে দেখা গেল— 'কপালকুণ্ডলা'র মূল নাটকের পাণ্ডুলিপির খাতাটি পাওয়া যাচ্ছে না—এদিকে দর্শকদের বিপুল সমাগমে গম্ গম্ করছে দর্শকদের স্থান— কিন্তু কর্মকর্তাগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ছুটোছুটি করছেন— সোজা চলে এলেন গিরিশচন্দ্রের কাছে। গিরিশচন্দ্রের কাছে সবই অন্ধকার—দর্শক সমাজ—অভিনেতৃগণ। কি করা যায়! গিরিশচন্দ্র বিদ্যুৎ গতিতে 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসটি আনিয়ে নিলেন। গিরিশবাবু আশ্বস্ত হলেন, বললেন, ভয় নেই আমি Prompt করছি, তোমরা রঙ্গমঞ্চে যে যার ভূমিকার জন্য প্রস্তুত হও। যথাসময়ে 'কপালকুণ্ডলা' অভিনীত হল---দর্শকদের কেউ 'কপালকুণ্ডলা' নিয়ে বিভ্রান্তির কথা বুঝতেও পারল না।

গিরিশচন্দ্র মূল উপন্যাস ও নাটকের জন্য বিভাজন সূচী অনুসরণ করে দৃশ্যানুযায়ী চরিত্রের সংলাপ Prompt এর মাধ্যমে নাটক 'কপালকুণ্ডলা' সে যাত্রায় রক্ষা পেল।

এদিকে ন্যাশনাল থিয়েটারের সফলতা পূর্ববঙ্গের ঢাকায় কিছু যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যাশনাল থিয়েটারের অনুরূপী নাট্যমন্দির প্রতিষ্ঠা করে (হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার)

সধবার একদশী, কৃষ্ণকুমারী, নবীন তপস্বিনী নাটক অভিনীত হয়। অভিনয় সফল হবার সাথে সাথে সুনামও এল—কলকাতা থেকে ন্যাশন্যাল থিয়েটারের রাজেন্দ্রলালবাবু, ধর্মদাসবাবুরা অর্ধেন্দুবাবুকে যুক্ত করে ঢাকায় গেলেন। গিরিশচন্দ্র তখন কোম্পানীর কাজে (বুককিপার) খুবই ব্যস্ত। তাছাড়া নানাস্থানে ঘুরবার শক্তি, সুযোগ ও ইচ্ছা তেমন ছিল না।

গিরিশচন্দ্রের অনুপস্থিতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত ন্যাশন্যাল থিয়েটারের অভিনীত নাটকের অভিনয়ে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল। যারা গিয়েছিলেন তাঁদের কাছ থেকে চরিত্র চিত্রণে কোন নূতনত্ব দেখানো সম্ভব হল না।

সেসময় দিঘাপতিয়ার রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুরের শিশু পুত্রের অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানে 'কপালকুণ্ডলা' অভিনয়ের বরাত এল ন্যাশন্যাল থিয়েটারে। গিরিশচন্দ্র তাতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন প্রমথনাথ রায়ের ব্যক্তিগত তদ্বিরে।

।। দশ ।।

গিরিশচন্দ্র জীবন ও জীবনধারার সনিষ্ঠ প্রত্যয়ে অগ্রসর হতেন বাল্যকাল হতেই। অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অভিভাবকহীন তছনছ জীবনধারায় গিরিশচন্দ্র সুরাপান করতেন—কিন্তু অকারণে অন্য কাহাকেও সুরাপানে ও বদ্ মেজাজে পাড়া প্রতিবেশীদের উতপ্ত করার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন এবং সতর্ক করতেন।

সেসময়টা ধর্মের বিচিত্র আয়োজনে পাড়া মহল্লায় নূতন নূতন চিন্তা ও বক্তৃতার আসর বসত। গিরিশচন্দ্র মাঝে মধ্যে তথায় উপস্থিত হতেন; শুনতেন অনেক কিছু— কিন্তু কিছুই তাকে আকৃষ্ট করতে পারত না। কেশবচন্দ্র সেনের আদি ব্রাহ্মসমাজের তখন খুব নাম ডাক—আয়োজন—সভা—প্রার্থনাও হোত অনেক। গিরিশচন্দ্র মাঝে মাঝে উপস্থিত হতেন। কিন্তু ধর্মের প্রতি ভাতৃভাব, ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও চিন্তা বহুভাবে নষ্ট হয়—তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র বিশ্বাস করতেন—ঈশ্বর ও ধর্ম যদি মানবজীবনের একান্ত হয়—তা হলে জল—বায়ু—আলো ইত্যাদির মত মানুষের কাছে সহজ হবে না কেন? উহা 'ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং' কেন হবে! গিরিশচন্দ্র ঈশ্বর বিশ্বাসে কোন তর্ক বিস্তারে পক্ষপাতি ছিলেন না। সতত স্বাভাবিক প্রবাহে তার প্রকাশ ও সম্পর্ক— তাহলেই ঈশ্বর সর্বজনীন, সর্বকালের—এই কথাই বার বার তিনি অনুভব করতেন।

গিরিশচন্দ্রের তাঁর পিতার প্রতি গভীর ভক্তি ছিল—তাই যেকোন কাজে তিনি পিতার কথা স্মরণ করতেন—অন্তরে ধ্যান করতেন। গিরিশচন্দ্র তাঁর ধর্মমত সম্পর্কে বলেছেন,

....আমাদের পাঠদশায় ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে কেহ জড়বাদী, কেহ খ্রীস্টান কেহ বা ব্রাহ্ম হয়েছেন। হিন্দু ধর্মের উপর বিশ্বাস কেহ বড় একটা করতেন না। যারা হিন্দু ছিলেন, তাদের ভেতর আবার নানান দলাদলি। কেহ শাক্ত, কেহ বৈষ্ণব, আবার বৈষ্ণবের ভেতরও নানান সম্প্রদায়। প্রত্যেক মতাবলম্বী অপর মতাবলম্বীকে নরকে পাঠাবার ব্যবস্থা করতেন। এই তো অবস্থা, তার উপর আবার অনেক যাজক ব্রাহ্মণ ভ্রষ্টাচারী, কেহ সত্যনারায়ণের পুথি লয়ে শ্রাদ্ধ করতে বসেন, কেহবা, স্বচক্ষে দেখেছি, শৌচ হাতে এসে পাইখানার গাড়ুর জলে অঙ্গুলি সিক্ত করে মাটির দেয়ালে ঘসে, কপালে ফোঁটা কেটে পূজা করতে যান। এরূপ অবস্থায় স্বকর্মে আর কোন আস্থা রইল না। আবার দু'পাতা ইংরাজী পড়ে দেখলাম—যারা জড়বাদী বিদ্যাবুদ্ধিতে তারা সকলের শ্রেষ্ঠ। ঈশ্বর না মানা একটা পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক বলে মনে হোত। কিন্তু হিন্দুর দেশে চার যুগ ধরে যার নাম চলে এসেছে হিন্দুর প্রাণ সে ঈশ্বরকে একেবারে হট্ করে উড়ায়ে দিতে পারে না।

....ব্রাহ্মসমাজেও মাঝে মাঝে যাওয়া আসা করতাম। কিন্তু যে অন্ধকার—সেই অন্ধকার, কিছুই বুঝতে পারলাম না। ঈশ্বর আছেন কি নেই—থাকেন যদি থাক। ....মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকতাম—ঈশ্বর যদি থাক, আমায় পথ দেখিয়ে দাও।

.....ক্রমে মনে হল, সব ঝুট—জল, বায়ু আলোক যা ক্ষণিক ইহজীবনের প্রয়োজন তা ছড়ান রয়েছে—না চাইলেও পাওয়া যায়। তবে ধর্ম যাহা অনন্ত জীবনের প্রয়োজন, তা খুঁজে নিতে হবে কেন? সব ঝুট্ কথা। জড়বাদীরা বিদ্বান, বিজ্ঞ—তারা যা বলেন তাই ঠিক।

তাহলেও গিরিশচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনের বিচিত্রকথায় অন্তরের নিভৃতস্থানে অত্যন্ত শুদ্ধ চেতনায় ফল্গু ধারার মত এক মহাপ্রাণতার বীজ উপ্ত হতে থাকে, যার প্রভাব প্রতিদিনের জীবনচর্চায় অনুভব করতেন—কিন্তু প্রকাশ্যে হৈ হৈ করে কিছু প্রকাশ করতেন না। 'কালাপাহাড়ী' চেতনায় শান্ত অত্যন্ত স্নিগ্ধতার আস্তরণে প্রতিটি দিনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তা দানা বাঁধতে সচেষ্ট ছিল। গিরিশচন্দ্র অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে প্রতিনিয়ত উত্তরণের ব্যাকুলতায় বিচিত্র পরিবেশে চাবিটি খুঁজে পেতে চাইতেন—এই চাওয়ার অন্বেষণে চোখ-মুখ-হৃদয় বার বার উন্মুখ হয়ে থাকত।

গিরিশচন্দ্র জীবনটাকে মন্থন করে করে যা কিছু পেতেন বিচার না করেই তা গ্রহণ করতেন—হলাহল হলেও নীরবে অকুণ্ঠচিত্তে পান করে পরিছন্নতার মুক্ত বায়ুতে সগর্বে বিচরণ করতেন যা সেসময়কার সামাজিক-আধ্যাত্মিক-তথা নব জাগরণের বিচিত্র উৎসারিত জ্ঞান-বিজ্ঞান মনন ও চিন্তার নব নব উন্মেষের পথে রসদ সংগ্রহ করতে

পারতেন। স্বাভাবিক কারণে পারিবারিক অনিবার্যতায় গিরিশচন্দ্র বিধাতার পবিত্র অকৃপণ দান যে মাতৃস্তন, মাতৃদুগ্ধ পান করার সৌভাগ্য লাভ করেন নি।

গিরিশচন্দ্রের জন্মের আগে তাঁর এক বোন প্রসন্নকালীর অস্বাভাবিক আচরণ পরিবারের মধ্যে গভীর আকর্ষণ জাগিয়েছিল। গিরিশচন্দ্রের জন্মের পর সেই বোন প্রসন্নকালী ছোট ভাই গিরিশচন্দ্রকে খুবই স্নেহ করতেন। স্নেহের প্রকার ভেদে পরিবারের সকলের কাছে গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে আলাদা মানসিকতা গড়ে উঠেছিল। প্রসন্নকালী ছোট ভাই গিরিশচন্দ্রকে 'গিরি' বলে ডাকতেন। প্রসন্নকালীর মৃত্যুও পরিবারে তথা প্রতিবেশী ও পাড়ায় অলোচনার বিষয় ছিল। গিরিশচন্দ্র বোন প্রসন্নকালী সম্পর্কে যে সকল কাহিনী শুনেছিলেন তাতে তিনি মাঝে মাঝে দিদিকে স্মরণ করে মানসিক যন্ত্রণায় কখনও বা অপ্রকৃতিস্থ হয়ে যেতেন। বেদনায় ছিন্ন ভিন্ন মনে গভীর রাতে কালীপ্রসন্ন প্রসন্নকালীর ধ্যান করতেন। মাঝে মাঝে নীরবতার কুয়াশা নাশ করে ভক্তিরস স্নাত হয়ে চোখের জলে গাইতেন—

প্রসন্ন তোমারে কালী প্রসন্ন তোমার
'গিরিভাই'—দেখ কি গো আর?
তোমার নাহিক মনে, অলৌকিক জগজ্জনে
শুনি তব মূর্তি ছিল স্নেহের আধার।
অলৌকিক লাবণ্য রূপের জ্যোতিহার!
    মনে পড়ে করে ধরে বলিতে আমায়
    'তুমি মোর কাছে যাও, আমারে বিদায় দাও!'
    সংসার সাগরে ভাসি ভুলেছি তোমায়
    দেখ কি এখন আমি আছি কি দশায়?
সরল সংসারে দেখা তোমায় আমায়,
জাননা আমার বিবরণ
শুন শুন এ সংসার কুটিলতাময়
নহে—তুমি দেখেছ যেমন।
    সংসার মাঝারে রণ করি দিবানিশি
    হাসি শুধু বিলাসের হাসি
তুমি যদি ফিরে চাও, ভুলাইয়ে নিয়ে যাও
    'গিরিবাবু' তোমার, দেখনা দুখে ভাসি!
ভঙ্গুর এ দেহ আমি জানি চিরদিন
    জানি সৃষ্টি কালের অধীন
তথাপি তোমারে চাই, মনে সাধ দেখা পাই,
স্বপ্নে যদি তুমি দেখা দাও একদিন—
বলি, দিদি, তোমায়—সংসার কি কঠিন।

গিরিশচন্দ্র তার প্রয়াত ভগ্নি কালীপ্রসন্নের প্রসন্নকালী লৌকিক জীবনে অস্বাভাবিক কথা ও ব্যবহার বার বার মনে হোত।

গিরিশচন্দ্রের বয়স তেইশ বৎসর। প্রথম পুত্র লাভ করার আনন্দ তাকে গভীরভাবে নোতুন করে জীবন ধারণের রসদ জুগিয়ে দিতে না দিতেই পুত্রের অকাল প্রয়াণ হয়। ভাই বোনেদের মৃত্যুশোক গিরিশচন্দ্রকে বেশ ছন্নছাড়া করেছিল—তার উপর নিজ পুত্রের অকাল প্রয়াণ গিরিশচন্দ্রকে বেদনার সুকঠিন বর্মে আছন্ন করে রাখল বেশ কিছু দিন। আনন্দ নেই, বেশী মেলামেশি নেই—কারুর সাথে আলাপেও বিমর্ষতা। এই জাগ্রত বিমর্ষতার কেন্দ্রবিন্দুতে জীবন সম্পর্কে নবপাঠ গ্রহণের প্রবলতা গিরিশচন্দ্রকে ভালভাবেই তৈরী করে দিয়েছিলেন বিধাতা—যার প্রকাশ ও অভাব পরবর্তী জীবনবিস্তারে গভীর ভাবে লক্ষ্য করা যায়।

১৮৬৮ সালে ডিসেম্বর মাসে শ্যামপুকুরের বাড়ীতে গিরিশচন্দ্র দ্বিতীয় পুত্র লাভ করলেন—তখন গিরিশচন্দ্রের বয়স ২৫ বৎসর। দ্বিতীয় পুত্রই বিখ্যাত 'দানিবাবু'—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ। দানিবাবুর জন্মের ৪ বৎসর পর কন্যা সরোজিনীর জন্ম—গিরিশচন্দ্রকে চন্দ্রাতপের আনন্দ ও আরাম দান করল।

৩০ বৎসর বয়সে গিরিশচন্দ্র একটি মৃত কন্যা সন্তান লাভ করেছিলেন—এবং সেসময় থেকেই পত্নী গভীর সূতিকা-পীড়ায় আক্রান্তা হলেন। মানসিক অশান্তির বীজ আবার যেন অজানতে উপ্ত হতে লাগল। নানাভাবে গিরিশচন্দ্র নানা প্রতিকূল পারিবারিক অব্যবস্থার সামনে মুখোমুখি হয়ে পথ কাটতে কাটতে আলোর সহজতর পথে প্রবেশ করছিলেন—ঠিক সেইসময় সর্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা (পঞ্চম) ক্ষীরোদচন্দ্রের প্রয়াণ গিরিশচন্দ্রকে প্রায় সটান ভূমিতে ফেলে দিল। সে যে কি মর্মান্তিক বেদনা, দুঃখ গিরিশচন্দ্র তা নিজেই বহন করলেন—বিনম্রভাবে, অমঙ্গলকে বরণ করলেন, নমস্কার জানালেন।

সেসময় উত্তর কলকাতার বিডন স্ট্রীট অঞ্চলে নূতন নাট্যশালার স্থাপন ও তাতে নাটক অভিনয়ের ব্যাপক ব্যবস্থা খুবই উত্তেজনাময় হয়ে দর্শককূলদের তৃপ্তি দান করছিল। 'ন্যাশন্যাল থিয়েটারে' নাটক দেখার পর সমাজের নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের মনে নূতন নাট্যশালায় নূতন নাটক অভিনয়ের মানসিকতা জেগে উঠে। তারই সূত্রে সিমলার জমিদার 'ছাতুবাবু'র দৌহিত্র শরচচন্দ্র ঘোষ একটি নূতন নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করেন। তাতে উৎসাহ দিয়ে যুক্ত ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রভৃতিগণ। বিডন স্কোয়ারের উপর নূতন নাট্যশালায় নাটক অভিনীত হবার জন্য মধুসূদন দত্ত 'মায়াকানন' নাটকটি রচনা করেন। সেই 'মায়াকাননে' একটি স্ত্রী চরিত্র আছে—তাতে অভিনয় করার জন্য বালক ঠিক করা হলে নাট্যকার মধুসূদন দত্ত তাতে আপত্তি জানান। স্ত্রী চরিত্রে স্ত্রীলোক দিয়েই অভিনয় করাতে হবে—মধুসূদন দত্তের তাই ইচ্ছা। অবশেষে

নাট্যকারের অভিপ্রায়ে নিষিদ্ধপল্লীর কোন স্ত্রীলোককে দিয়ে অভিনয় করার ব্যবস্থা হওয়ায় বিদ্যাসাগর নূতন নাট্যশালার কর্মকর্তাদের সাথে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করেন।

আবার সেসময়েই বেঙ্গল থিয়েটারের ৫ মাস পর গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারের স্থাপন হয় (১৮৭৩)। সেখানে 'কাম্যকানন' নাটকটি অভিনীত হয়। গিরিশচন্দ্র তখন ছোট ভাইয়ের প্রয়াণ শোকে গভীরভাবে কাতর। বন্ধুদের বারবার অনুরোধে বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' উপন্যাসটিকে নাট্যাকারে রূপ দান করেন। কিন্তু সেই নাটকে মূল চরিত্র 'পশুপতির' ভূমিকায় কাকে দিয়ে করান যাবে সেবিষযে অনেকের চিন্তা হচ্ছে। অবশেষে গিরিশচন্দ্রকে সম্মত হতে হল 'পশুপতি' চরিত্রে অভিনয় করার জন্য। **গিরিশচন্দ্রের 'পশুপতি'র ভূমিকায় অভাবনীয় অভিনয় সে সময়ের পত্র পত্রিকায় লিপিকারগণ** উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন।—

মৃণালিনী

> ....যে দৃশ্যে পশুপতি মনোরমার মুখে পরিচয় পাইলেন, ইনিই কেশবের কন্যা ও তাঁহার পরিণীতা ভার্য্যা, সে দৃশ্যে পশুপতি-বেশী গিরিশচন্দ্রের তৎকালিন বদনমন্ডলের অপূর্ব পরিবর্তন.......কণ্ঠস্বরের সেই বিচিত্রতা....অবর্ণনীয়।

> .....নাটকের শেষ দৃশ্যে সেই অগ্নিরাশির মধ্যে অষ্টভূজা মূর্তি আলিঙ্গনে গিরিশচন্দ্রের অদ্ভুত অভিনয় নৈপূণ্য.....অভাবনীয়।

বেশ ভাল ভাল কথায় দিন চলে যাচ্ছে—কিন্তু গিরিশচন্দ্রের তা বেশীদিন সহ্য হল না। আশার দীপ ধীরে ধীরে স্তিমিত হচ্ছে তা তিনি অনুভব করছিলেন। ছোট ভাই ও বোনের প্রয়াণ এবং স্ত্রীর অসুস্থতা তার উপর চাকুরী ক্ষেত্রেও অস্থিরতা। গিরিশচন্দ্র আর্থিক দিক থেকে খুব একটা স্বচ্ছল ছিলেন না—কোন রকমে স্বাভাবিক জীবনধারনে মানিয়ে চলছিলেন। তারই মধ্যে নানা অনটনের মধ্যেও স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করতে গভীরভাবে নিয়োজিত করেছিলেন। দিনে চাকুরী রক্ষার জন্য বাড়ী থেকে বেরুতেন—প্রাণের স্পন্দনে হৃদয় প্রসার লাভের মুক্ত ক্ষেত্র সেই থিয়েটারে ইচ্ছা করচে না যেতে—পাছে স্ত্রী অসহায়ভাবে থাকেন এই ভাবনায়। রাত্রিতে স্ত্রীর পাশে থেকেই গভীর রাত পর্যন্ত গ্রন্থ পাঠ করতেন। এভাবে বেশ কিছুদিন যাবার পরও স্ত্রীর সুস্থ হবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না—অসহায় গিরিশচন্দ্র শহরের ভাল ভাল চিকিৎসকদের সঙ্গেও যোগাযোগ করলেন—কিন্তু অবশেষে ১৮৭৪ এর ডিসেম্বর ২৪ তারিখে স্ত্রী চলে গেলেন।

তখন গিরিশচন্দ্রের বয়স প্রায় একত্রিশ বৎসর। স্ত্রীকে হারাবার পর রাত্রি থেকেই গিরিশচন্দ্রের জীবন-ধারায় শূণ্যতার কান্না যেন হৃদয় আছন্ন করে দম বন্ধ করে রাখল—পাছে পুত্র-কন্যা দু'জনের বেদনা আরো বেড়ে যায়। গভীর রাত্রিতে নয়ন-ধারায় প্লাবনের বেগে নানা প্রশ্ন নানা জিজ্ঞাসার নিরুত্তর অভিমান বারে বারে গিরিশচন্দ্রকে আরো

বেদনাতুর, আরো গভীর হতাশ করে তুলত। ভেতরে ভেতরে কালাপাহাড়ের অট্টহাস্যে হৃদয় যেন ছিন্ন ভিন্ন হতে চায়। আপন সত্তার বিস্মৃতির কালো অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে 'সব ঝুট, সব মায়া-মরিচিকা' এই ধ্বনিতে গঙ্গার পারে পারে ঘুরে ঘুরে নির্জনতায় নিঃসঙ্গতায় নীরব আলাপনে একাকী কবিতা দেবীর আশ্রয় লাভ করেন—রাত্রিতে পুত্র-কন্যাদের বিশ্রামে যাতে এতটুকু বাধা না হয়, সেইমত কিছু কবিতাও রচনা করেছিলেন গিরিশচন্দ্র। দীর্ঘশ্বাস-রুদ্ধ বেদনার লোনা মানসিক যন্ত্রণায় জগৎ-সংসারের সকলকিছু তার কাছে বিস্বাদ-বিবর্ণ হয়ে উঠল। গিরিশচন্দ্র সেই অন্ধকারকে অন্তরে আহ্বান জানিয়ে লিখেছিলেন।

তোমায় জানে না নরে, তাইত তোমারে ডরে
অসময় তুমি সখা কেহ নাহি আর,
একক বান্ধবহীন, আশার উচ্ছ্বাস লীন
হৃদয়ে শুকায়ে যায় রোদনের ধার
জ্বলে শুধু স্মৃতি চিতে চিতালন প্রায়,
তখন অভাগা তব মুখ পানে চায়।

একা-একান্ত একাকিত্বের নিঃশব্দ যন্ত্রণার মাঝে ছট্‌ফট করে যুক্তির অন্তরালে আপন মেজাজে চিৎকার করে প্রিয়াকে অন্বেষণ করতেন বাড়ীর ভেতরের সেই চির পুরাতন স্পর্শলাগা পরে থাকা জিনিষ পত্রের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে।

কাতরতার মুচ্ছর্নায় প্রায় হারিয়ে যেতেন। পরপর শোকের অদৃশ্য আঘাতের তীব্রতা যেন স্ত্রীকে হারিয়ে আরো বেশী করে পুঞ্জিভূত হয়ে পথ আটকে দিল গিরিশচন্দ্রের মনসংযোগকে। সব কেমন যেন ধোঁয়াশা হয়ে এল—নাটক, নাট্যচরিত্র তথা থিয়েটার—রঙ্গমঞ্চ। সব আছে, নেই গিরিশচন্দ্র, নেই সেই মন। গিরিশচন্দ্র একলা বসে থাকেন—কি যেন ভাবতে ভাবতে হঠাৎ নড়ে উঠে পুত্র-কন্যাদের কাছে গিয়ে, অত্যন্ত কাছে গিয়ে সমগ্র সত্তার বিস্তারে তাদের অন্তরের মধ্যে ডুব দিতে যেতেন।

গিরিশচন্দ্র উঠে দাঁড়ালেন—সামনের দিকে সটান বুক ভাসিয়ে দিয়ে যেন নূতনভাবে জীবনের সিঁড়ি খুঁজে নিলেন। নূতন কর্মক্ষেত্র— 'ফ্রাইবার্জার এন্ড কোং' এ যোগ দিলেন—নানাভাবে কাজের মধ্যে নিজেকে যুক্ত করলেন গিরিশচন্দ্র। সেসময় কাজের তাগিদে কলকাতা ছেড়ে ভাগলপুর যেতে হোল। আত্মীয়-পরিজনহীন প্রবাসে বেশ ভালভাবেই নিজের একাকীত্বের রসাস্বাদনে বিভোর হয়ে অনেক কবিতা রচনা করেছিলেন। কবিতাগুলি কলকাতায় 'নলিনী' মাসিক এবং 'সাধারনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

কিন্তু ভাগলপুর বেশীদিন ভাল লাগল না—তাই কলকাতায় ফিরে এলেন এবং কোম্পানীর কাজ ছেড়ে দিলেন।

বাগবাজারের 'অমৃতবাজার পত্রিকার' সম্পাদক বৈষ্ণব-স্বদেশভক্ত শিশিরকুমার ঘোষ গিরিশচন্দ্রকে খুব ভালবাসতেন। তিনি গিরিশচন্দ্রের অবস্থা জানার পর তাকে 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' লেখালেখির কথা বললেন। গিরিশচন্দ্র তাতে খুশি হয়েছিলেন এবং অনেক প্রবন্ধও রচনা করেছিলেন। সেসময় শিশিরবাবুর অনুরোধে 'ইণ্ডিয়ান লিগের' কোষাধ্যক্ষ পদে গিরিশচন্দ্র যোগদান করেন। একবৎসর সেখানে কাজ করার পর 'পার্কার কোম্পানী'তে 'বুক কিপারের' পদে যোগদান করেন।

সেসময়েই গিরিশচন্দ্র দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন—দ্বিতীয় স্ত্রী সুরতকুমারী—সিমলার বিহারীলালের প্রথমা কন্যা।

মাঝে মাঝে স্ত্রী সুরতকুমারীকে অতি কাছে বসিয়ে পূর্ব স্ত্রীর কথা, তার অন্তর—কাতরতার কথা জানাতেন। জীবনের অনেকটাই স্নেহহীন, মমতাহীন দৈনন্দিন কাজকর্মের ফাঁকে যে অভাবটা অনুভব করতেন, গিরিশচন্দ্র তা অকপটে স্বীকার করতেন স্ত্রীর কাছে তখন কেমন যেন আনমনে সেই কবে প্রথমা স্ত্রীর প্রয়াণে জীবন অন্ধকার বেদনায় লিখেছিলেন,

শৈশব সুখের স্বপ্ন নাহিক এখন,
যৌবনে, ঢালিয়ে কায়, পেয়েছিনু প্রমদায়
মলে কি ভুলিব হায় প্রথম চুম্বন।

উঠে দাঁড়িয়ে জানালার পাশে এসে স্মৃতির মণিকোঠায় যখন তাকান— সেই সময় সুরতকুমারী কাছে এসে স্নেহাসক্ত প্রেমতরঙ্গে উজ্জীবিত হাত দুটো গিরিশচন্দ্রের বুকে রেখে যেন বলতে চাইছে—এখন আমি তো এসেছি—তোমার সব ভার আমার—আমাকে তুমি তোমার করে লও—সব তোমার হয়ে আমি তোমাতেই একাকার হতে দাও।

গিরিশচন্দ্র থমকে গেলেন। কেমন যেন আবার একটু সরে গিয়ে সুরতকে কাছে টেনে দু'হাতে মুখখানা নিজের মুখের কাছে তুলে অপলকে দৃষ্টি বিনিময় করে নিলেন।

তখন রাত্রি গভীর। ছেলে মেয়েরা তখন নিদ্রায়। গিরিশচন্দ্র নিজেকে সংবরণ করে নিত্যদিনের অভ্যাসে গ্রন্থ পড়ায় মনোনিবেশ করলেন। সুরত কাছে এসে বসল—তাকিয়ে রইল গিরিশচন্দ্রের দিকে—হঠাৎ আলো বন্ধ করে অন্ধকারের মধ্যে একাকার হয়ে রইলেন দু'জনে দুজনের হৃদয়ে হৃদয়ে আকর্ষিত মধুর অনুভবের মিলন পূর্ণতায়।

পার্কার কোম্পানীতে চাকরীর সময় গিরিশচন্দ্রের জীবনে একটা ঘটনা ঘটেছিল—ঘটনাটি এইরকম,

"....পার্কার সাহেব এক অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন। কথা কম বলার জন্য তিনি তাঁর অফিসে একটা নিয়ম করলেন—যদি কেউ কাউকে ডাকবার প্রয়োজন মনে করে তা হলে তিনি ঘণ্টা বাজাবেন। এমনি একদিন

গিরিশচন্দ্রকে প্রয়োজন হওয়ায় পার্কার সাহেব ঘণ্টা বাজালেন। গিরিশচন্দ্র ঘণ্টার শব্দ শুনেছেন, কিন্তু আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন না। পার্কারের চাপরাশি গিরিশচন্দ্রের কাছে এসে বললেন, বাবু, সাহেব আপনাকে ডাকছেন, শুনতে পারছেন না! গিরিশচন্দ্র সটান উত্তর দিলেন, না। এই বলে কাজে মনোনিবেশ করলেন। এদিকে পার্কার সাহেব রেগে রক্ত চোখ করে ছুটে এসে গিরিশচন্দ্রকে বললেন, ... তোমাকে আমি ডাকছি, তুমি শুনতে পারছ না! গিরিশচন্দ্র স্পষ্টভাবে বললেন, কই, আমি তো শুনিনি। পার্কার তাতে আরো বেশী রেগে গেলেন এবং গিরিশচন্দ্রকে নানা অশোভন কথা শোনালেন। গিরিশচন্দ্র এবারে উঠে দাঁড়ালেন, মুখোমুখি হয়ে বেশ জোর কণ্ঠে বললেন, এতক্ষণ তোমার কোন কথার উত্তর দেইনি—কিন্তু অভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে গেছো দেখছি—তবে শোন, আমি তোমার চাপরাশি বা বেয়ারা নই যে তোমার ঘণ্টায় আমি উঠব-বসবো।

পার্কার সাহেব আরো রেগে গেলেন—কিন্তু পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে গিরিশচন্দ্রের কাছে এসে অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে বললেন, তুমি রাগ করো না। পার্কার সাহেব জানতেন গিরিশচন্দ্রের কর্তব্যবোধ ও নিষ্ঠার কথা। কোম্পানীর উত্তরোত্তর আয় ও সম্মান বৃদ্ধির জন্য গিরিশচন্দ্র সকল সময় চিন্তিত ছিলেন এবং অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতেন। সেদিন থেকে পার্কার সাহেব গিরিশচন্দ্রকে গভীর শ্রদ্ধাও করতেন এবং গিরিশচন্দ্রের মাসিক দক্ষিণা আশাতীত বাড়িয়ে দিলেন।

দ্বিতীয় স্ত্রীর মধুর পরশ এবং পার্কার কোম্পানীর বিশ্বস্ততা গিরিশচন্দ্রের জীবন পথে আলো দিল এগিয়ে যাবার।

।। এগার।।

এদিকে কলকাতায় বাংলা রঙ্গমঞ্চের নাটক প্রদর্শন ও পরিচালনার বিপুল আয়োজন ও ঘনঘটার মধ্য দিয়ে সরকার থেকে 'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন' (Dramatic Performances Control Bill) জারি হোল। অভিনয়ের মধ্য দিয়ে কিছু নাট্যমঞ্চ পরিচালক ও কর্মকর্তাদের অপরিচ্ছন্ন আচরণ ও ব্যবহারে দেশের কিছু মানুষ বেশ অখুশী হয়ে উঠেন।

দিল্লীর ঐতিহাসিক দরবারের উপলক্ষ্যে দিল্লীতেও (১৮৭৫) বাংলা নাটক (সধবার একাদশী - হেমলতা) অভিনীত হয়। লাহোর, আগ্রা, বৃন্দাবন, কানপুর, লখনউ প্রভৃতি স্থানেও বাংলা নাটক অভিনীত হয়েছিল।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠপুত্র সপ্তম এডওয়ার্ড যুবরাজপদে অভিষিক্ত হয়ে কলকাতায় এসেছিলেন (১৮৭৬)। সেসময় কলকাতা হাইকোর্টের উকীল জগদানন্দ

মুখোপাধ্যায় যুবরাজকে তার ভবানীপুরের বাড়ীতে এনে ভারতীয় ধারায় চন্দন-পুষ্প-মালায় অভ্যর্থনা করেছিলেন—এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে 'গজদানন্দ' এই নামে একটি প্রহসন অভিনীত হয় গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারে। এই প্রহসনে যেভাবে জগদানন্দকে (রাজভক্ত - সম্মানিত - নিরপারাধ ভদ্র) চিত্রিত করা হয় তাতে পুলিশ আপত্তি জানায় এবং প্রহসনটির অভিনয় বন্ধ করে দেয়। কিন্তু প্রহসনটি দর্শকদের খুবই আকর্ষন করেছিল—তাই পুলিশের নির্দেশ পালনে নাটকের নাম পরিবর্তন করে 'হনুমান চরিত্র' এই নামে উক্ত প্রহসনটি অভিনীত হয়। পুলিশ তাও বন্ধ করে দেয়।

এদিকে 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' নাটকটি অভিনয়ে সরকার তার মধ্যে অশোভন অশ্লীলতার অপরিছন্ন মানসিকতার প্রকাশ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করে। এবং নাট্য পরিচালকদের গ্রেপ্তারও করে।

সেসময়ে আবার আর একটি গীতিনাট্য 'সতী কি কলঙ্কিনী' পরিবেশনের দায়ে ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (ল্যাম্বাট) বিখ্যাত অভিনেতাদের (অমৃতলাল বসু - মতিলাল সুর - অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)) এবং ম্যানেজার সহ অনেককে নাটক চলাকালীন হঠাৎ ঘেরাও করে গ্রেপ্তার করে। অভিনেত্রীগণ ভয়ে কাঁদতে লাগল - দর্শকগণ ভয়ে বিক্ষিপ্তভাবে ছুটোছুটি করতে লাগল।

এর প্রতিবাদে তৎকালীন বহু শিক্ষিত মানী মানুষগণ নাটকটি পরিছন্ন—তাতে কোন অশ্লীলতা নেই বলে মন্তব্য করলেন।

আদালতে বিষয়টি বিচারের ব্যবস্থা হয়। বিচারক ফিয়ার ও মার্করি উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনেন। অনেক বিচার-বিবেচনার পর 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' অশ্লীল প্রমানিত না হওয়ায় গ্রেপ্তার হওয়া সবাইকে যুক্তি দেওয়া হল।

সরকার আদালতের এই ধরণের বিচারে কোন সায় দিতে না পেরে নিজের ক্ষমতার জোরে *'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন'* জারি করেন। এই প্রথম কলকাতা ও ভারতের নানা স্থান থেকে উক্ত আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আসতে থাকে। প্রতিবাদ সভাও হয়। কিন্তু কোন সুফল হল না। বড়লাট বাহাদুর ১৮৭৬ সালে ১৭ই ডিসেম্বর উক্ত আইন সমর্থন করে স্বাক্ষর করেন এবং অনুমোদন করেন।

বাংলা নাটকের গতি রুদ্ধ শেকল ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে বাংলার আকাশে বাতাসে একটা ভয়ার্ত সুরের কালোছায়া ঘিরে রইল।

।। বার।।

'গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারে' অনেক নাটক অভিনীত হলেও আয় তেমন হোত না। তা'ছাড়া নাট্যমঞ্চ ও প্রযোজকদের মধ্যে বিশৃংঙ্খল মানসিকতা ব্যাপকভাবে

প্রবেশ করেছিল অত্যন্ত অসতর্কতার অপরিচ্ছন্ন কতকগুলি ঘটনার ভেতর থেকে। গ্রেট ন্যাশন্যালের মালিক ছিলেন ভূবনমোহন নিয়োগী—নাট্য প্রযোজনায় অনেকেই থিয়েটারের ভাড়া নিয়ে ভূবনবাবুর উপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করতেন। ভূবনমোহন বাবুর খুব ইচ্ছা ছিল তার গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারের ভার ও পরিচালনার সমস্তরকম শর্ত দিয়ে গিরিশচন্দ্রকে কাছে টেনে নেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র ব্যক্তিগত কারণে এবং পারিবারিক অসুবিধাহেতু তেমনভাবে থিয়েটারের ভার গ্রহণ করছিলেন না। তবে মাঝে মধ্যে কিছু নাটুকে মানুষের অনুরোধে নাটকের বিষয় ও চরিত্রের সচলতার জন্য 'গান' লিখে দিতেন—এই পর্যন্ত।

পার্কার কোম্পানীতে কাজ, দ্বিতীয় স্ত্রীর এবং পূর্ববর্তী স্ত্রীর পুত্র, কন্যা এবং সর্বোপরি সংসার জীবনের অনিবার্য দায়িত্ববোধের জন্য পুরোপুরি তখনও পর্যন্ত থিয়েটারে নিজেকে যুক্ত করতে চাইতেন না। কিন্তু ভূবনবাবু নাছোড়বান্দা—তিনি গিরিশচন্দ্রের অন্তর সত্তার নাড়ি নক্ষত্র জানতেন, তাই নানা প্রতিকূল পরিস্থিতি জেনেও গিরিশচন্দ্রের প্রতি আশা ছাড়েননি। বারবার অনুরোধ করতে করতে অবশেষে ভূবনবাবুর আশা ফলবতী হোল এবং তাঁর ইচ্ছানুসারে গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারের পরিচালনার জন্য ৩ বৎসরের লীজ গিরিশচন্দ্রকে দিলেন। গিরিশচন্দ্রের অন্তর-সত্তার উন্মুখ প্রছন্ন আনন্দ যেন বাইরের প্রতিকূলতাকে ভাসিয়ে দিল—গিরিশচন্দ্র নিজের ভেতরই থিয়েটারের দায়িত্ব বহন করলেন। তিনি আস্থাশীল হলেন, বিশ্বাস করতেন, ভালভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে থিয়েটার পরিচালনার ব্যবস্থা করলে 'গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার' তার পূর্ণ মর্যাদায় স্থিতিলাভ করবে। গিরিশচন্দ্রের এই আশা তাকে অনির্দেশ্য একটি শক্তি চালিত করলো এগিয়ে যাবার জন্য।

১৮৭৭ জুলাই, গিরিশচন্দ্র অত্যন্ত যত্ন ও নিষ্ঠার সঙ্গে 'গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারে'র লিজ গ্রহণ করে নাম পরিবর্তন করে *'ন্যাশন্যাল থিয়েটার'* করলেন।প্রথম অভিনয় করার জন্য মাইকেল মধুসূদন দত্তের *'মেঘনাদ বধ'* মহাকাব্যটি বেছে নিলেন। ইতিপূর্বে

মেঘনাদ বধ

কোন কোন থিয়েটারে মেঘনাদ বধ' অভিনয় হয়েছিল—কিন্তু গিরিশচন্দ্র পুরো কাব্যটি কবির মানসিক চেতনালোক থেকে যে বাণী অনুভব করেছেন তাকেই অভিনয়ের মধ্য দিয়ে এমনভাবে উপস্থিত করেছেন যা দর্শক সমাজে গভীর প্রত্যয় জেগেছিল মধুসূদনের ভাবধারায় অনুভবে।

গিরিশচন্দ্র মূল কাব্য থেকে মেঘনাদ বধ—লক্ষণের শক্তিশেল ও প্রমীলার চিতারোহন—এই তিনটি কাহিনীকে একত্রিত করে 'মেঘনাদ বধ' অভিনীত করেন। প্রথম রজনীতে গিরিশচন্দ্র মুল কাহিনীকারের উদ্দেশ্যে ও তাঁর ভাব সম্প্রসারণে—একটি 'প্রস্তাবনা' কবিতায় রচনা করেন এবং নিজেই অভিনয়ের প্রারম্ভে দর্শকদের জানিয়ে দিলেন।

প্রস্তাবনা :—

যদি ধন প্রয়োজন না হইত কদাচন
রঙ্গভূমি হেরিত কি রসহীন জন?
বিমল কবিত্ব-আশে, কেহ রঙ্গালয়ে আসে
কেহ হেরে কামিনীর কটাক্ষ ঈক্ষণ।
আসি এই রঙ্গস্থলে কতলোক কত বলে
সবার কথায় মম নাহি প্রয়োজন,
কাব্যে যার অধিকার দাস তার তিরস্কার
অকপটে কহে, করে মস্তকে ধারণ।
সুধীজন - পদধূলি, রাখি আমি মাথে তুলি
তিরস্কার তাঁর—দোষ বারণ কারণ;
'এনকোর' 'ক্ল্যাপ' 'যার' আছে মাত্র অধিকার
তাঁরও আজি করি আমি চরণ বন্দন।
সবিনয়ে কহে ভৃত্য নহে বারাঙ্গনা-নৃত্য
মেঘনাদে বীরমদে বিপুল গর্জন
ঝুনুঝুনু নাহি আর, কঙ্কণের ঝনৎকার
অস্ত্রে অস্ত্রাঘাত ঘোর অশনি পতন।
গভীর তুলিয়া তান, মধুর মধুর গান
গদ্য পদ্য মাঝে এই মনোহর সেতু
শেষাক্ষরে মিল নাই গদ্য যদি বল তাই
পদ্য বলা যায় যতি বিভাগের হেতু।
হলে কাব্য অভিনয়, জীবন সঞ্চার হয়
কোন অনুরোধে যতি করিব বর্জন?
পাষাণে বাঁধিয়া প্রাণ সে যতিরে বলিদান
নাহি দিব, হই হব নিন্দার ভাজন।
যাঁর মনে উঠে যাহা, তিনি বলিবেন তাহা,
আমার যা কার্য্য আমি করিব এখন।।

গৌরব-মিশ্রিত অনুরোধ দর্শকের সামনে প্রথমেই নাটকের ভাব ও অভিনয় সৌকর্য জানিয়ে গিরিশচন্দ্র একটা অনবদ্য ভাবগম্ভীর ভাব পরিবেশের সঞ্চার করলেন এবং সাথে সাথে অভিনয় শুরু করেন। মহাকাব্যকে যে নিপূণতার মধুর তারে নাটকে রূপায়িত করে গিরিশচন্দ্র প্রত্যেকটি ঘটনাকে কেন্দ্রীভূত করা অভিনয়ের জন্য চরিত্র রূপায়ন করলেন যা ইতিপূর্বে ভাবাই দুঃসাধ্য ছিল। যার ফলশ্রুতিতে শিক্ষিতসমাজ সাহিত্যসমাজ তথা নাটকের অভিজ্ঞ দর্শকসমাজে 'মেঘনাদ কাব্যে'র অভিনয় গভীর আনন্দ দান

এই নাটকে গিরিশচন্দ্র *'রাম'* ও *'মেঘনাদ'*—দুটি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। এই নাটকে 'রামের' চরিত্র-গুরুত্ব গভীরভাবে দর্শকদের উৎসাহ-কৌতূহল তথা রামায়ণের কেন্দ্র সেই 'রাম' সম্পর্কে নূতন ভাবনায় সকলেই ভাব-উৎসারণে পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন।

> .... রামচন্দ্র এবং মেঘনাদ এই দুইরূপে গিরিশচন্দ্র ঘোষ অভিনয় করেন। পাত্রদ্বয়ের চরিত্র কার্য্য এবং ভাব সমস্তই বিভিন্ন, সুতরাং একই ব্যক্তির দ্বিবিধ রূপ পরিগ্রহ কিছু বিসদৃশ্যতা হয়েছিল, তা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের অভিনয় দক্ষতায়, তাঁর অসাধারণ ক্ষমতায়, এ দোষ দেখেও আমরা মনে কিছু করতে পারিনি; দোষ একেবারে ভুলে গিয়ে তাঁর রামরূপের অভিনয়ে বারংবার আমাদের অশ্রুসিক্ত করেছিল।

'মেঘনাদবধ' অভিনয় সফলতায় গিরিশচন্দ্র নবীনচন্দ্র সেনের *'পলাশীর যুদ্ধ'* এই মহাকাব্যের নাট্যরূপ দান করেন এবং অভিনীত করেন। 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যাকারে সাধারণ দর্শক সমাজে তেমন পরিচিত নয়—সাহিত্যসমাজে এবং কিছু বুদ্ধিজীবী দেশপ্রেমীর কাছে মহাকাব্যটি পঠিত। কিন্তু গিরিশচন্দ্র সেই 'পলাশীর যুদ্ধ'কে সাধারণের জন্য নাট্যরূপ দিয়ে যেভাবে দর্শক সমাজকে আপ্লুত করে নবীনচন্দ্রের ভাবনাকে, মতাদর্শকে ছড়িয়ে দিতে সহযোগিতা করেছেন তা প্রশংসনীয় শুধু নয়—গভীর তাৎপর্যপূর্ণও বটে।

পলাশীর যুদ্ধ

গিরিশচন্দ্র *'পলাশীর যুদ্ধ'* নাটকে ক্লাইভের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। আর বেগম—রানী ভবানী ও ইংলন্ড রাজলক্ষ্মীর ভূমিকায় যথাক্রমে—লক্ষ্মীমণি দেবী—কাদম্বিনী ও শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী অভিনয় করেছিলেন। বাংলার রঙ্গমঞ্চে এমন সফল ঘটনা-উদ্দীপক ভাবনা সজাগ করে দেওয়ার প্রেরণার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বহুদিন দর্শকদের কাছে আসেনি। প্রত্যেকটি চরিত্র—সিরাজদ্দৌলা (মহেন্দ্রলাল বসু); জগৎ শেঠ ও ঘাতক (অমৃতলাল মিত্র); রাজবল্লভ (অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়); প্রভৃতি গভীরভাবে দর্শক হৃদয়কে আপ্লুত করেছিল।

'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যের রচয়িতা নবীনচন্দ্র সেন নিজে কলকাতায় এসে সেই অভিনয় দেখে গভীর পুলকিত, আনন্দ লাভ করেছিলেন। সেই সময়েই গিরিশচন্দ্রের সাথে নবীনচন্দ্রের পরিচয় হয় এবং গভীর সখ্যতা স্থাপিত হয়। গিরিশচন্দ্র নবীনচন্দ্র সেনকে 'পলাশীর যুদ্ধ' মহাকাব্যে উল্লিখিত 'ক্রম করে দূরে তোপ গর্জিল অমনি' লাইনগুলি সম্পর্কে বলেছিলেন বিষয়টি কবি বাইরনের একটি লাইনের অনুবাদ—কিন্তু তা ভাল অনুবাদ হয়নি।

নবীনচন্দ্র অত্যন্ত আন্তরিক সুরে গিরিশচন্দ্রকে তার নিজের ভাষায় কিভাবে হতে পারে জিজ্ঞাসা করলে গিরিশচন্দ্র বললেন,

.... নিকট প্রকট ক্রমে বিকট গর্জন,
'অস্ত্র ধর' 'অস্ত্র ধর' কামান ভীষণ!

নবীনচন্দ্র আপ্লুত হলেন—দু'হাত প্রসার করে গিরিশচন্দ্রকে বুকে জড়িয়ে সুখ আনন্দ কৃতজ্ঞতায় মুগ্ধ হলেন এবং 'ভাই' বলে সম্বোধন করলেন।

।। তের ।।

'মেঘনাদবধ' ও 'পলাশীর যুদ্ধ' বাংলার সাহিত্যকালের দুই মহৎ প্রতিভা সম্পন্ন কবিদ্বয়ের (মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও নবীনচন্দ্র সেন) মহাকাব্য নাটকের অভিনয়ের মধ্যদিয়ে জনসাধারণের এক বিরাট সংখ্যক দর্শকের হৃদয়ে দেশ ও জাতীর ছবি ও চরিত্র অনুরণিত হয়েছে—তাতে চারিদিক থেকেই গিরিশচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্যপূর্ণ ভালবাসা ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশে। গিরিশচন্দ্রও উদ্দীপিত হলেন—নিষ্টার ফসল তাকে আনন্দ দিয়েছে, উৎসাহিত করেছে আরো আরো এগিয়ে যেতে। একদিকে অফিসের কাজ—তারপর নাটকের অভিনয় শিক্ষা—অভিনয় মঞ্চ তদারকী—রাত্রিতে পড়াশোনা—নাটক রচনা—কোথা দিয়ে দিন-রাত চলে যেত, গিরিশচন্দ্র তা বুঝতে পারতেন না। তিনি সেসময় দূর্গাপূজার প্রাক্কালের *'আগমনী'*ও *'অকালবোধন'* নামে দুটি রসাত্মক নাটক রচনা করে ন্যাশন্যাল থিয়েটারেই অভিনয় করেন। 'আগমনী' নাটকের একটি গান—**'ওমা কেমন করে পরের ঘরে ছিলি উমা বল না তাই'** রাস্তায়—পার্কে—সন্ধ্যারতির সময় ঘরে ঘরে শোনা যেত।

দিন-রাত নানা বিষয়ে গিরিশচন্দ্রের ব্যস্ততা। নিজের দিকে বিশেষ করে লীজ নেওয়া ন্যাশন্যাল থিয়েটারের আয়-ব্যয়ের দিকটা দেখার বিষয়ে স্বাভাবিকভাবে উদাসীন হয়ে গেলেন। তাতে সংসারে অর্থাগম সম্পর্কে বেশ কিছু প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠে এসেছিল। বিষয়টির উপর গভীর নজর না দেওয়ায় থিয়েটারের আয় সম্পর্কে নানাবিধ অসুবিধাও দেখা দিল বলে ছোটভাই অতুলকৃষ্ণ ঘোষ দাদা গিরিশচন্দ্রকে বলেছিলেন

> .... মেজদা, তুমি দিনের বেলায় অফিসে কাজ কর, রাতে থিয়েটারের বই লেখা, রিহারস্যাল দেওয়া অভিনয় করা—এসব কাজেই ব্যস্ত থাক। তুমি বিশ্বাসী ও সুযোগ্যবোধে যাদের উপর টিকিট বিক্রয়, হিসাব রাখা, গার্ড দেওয়া এবং থিয়েটারের অন্যান্য বিষয়ের তত্ত্বাবধানের ভার দিয়েছ তারা যে বরাবর হুঁশিয়ার হয়ে কাজ করবে তার কোন প্রমাণ কি? তাছাড়া ন্যাশন্যাল থিয়েটার গিরিশচন্দ্র লীজ নিয়ে স্বত্ত্বাধিকারী হয়েছেন—তাই লাভ তো দুরের কথা—ক্ষতির জন্য ঋণগ্রস্থ হবার সম্ভাবনাই বেশী।......

কথাগুলি গিরিশচন্দ্র সবিশেষ বুঝলেন—স্মৃতিপটে ভুবনবাবুর অর্থদুর্গতিও ঋণ—থিয়েটার ভাড়া দেওয়া—ইত্যাদি জেগে গেল এবং ছোট ভাইয়ের কথা বার বার মনে করতে লাগলেন। অবশেষে থিয়েটারের আর্থিক অবস্থার তদারকিতে তেমনভাবে যুক্ত হতে না থাকার জন্য গিরিশচন্দ্র নিজের সংসারের শান্তি ও সুস্থিতির কথা চিন্তা করে ভাইকে বললেন,

> .... তুমি নিশ্চিত থাক, আমি তোমাকে বলছি, থিয়েটারের সংশ্রবে আমি যতদিন থাকব, আমি আর স্বত্বাধিকারী হবার কখনও চেষ্টা করব না। ...

'ন্যাশনাল থিয়েটার' এর নাম সর্বত্র। গিরিশচন্দ্রের রচনা—তার অভিনয় এবং উপন্যাসের মহাকাব্যের নাট্যরূপ বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে যে আস্বাদন দান করা হয়েছে তাতে বঙ্গবাণীর হৃদয় ও মননে এক অভূতপূর্ব সাড়া জেগে উঠেছে। সবার কাছে সেই 'ন্যাশন্যাল থিয়েটার' তাই এত বিশ্বস্ত।

এরমধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের কাহিনীকে নাটকের ধারায় সর্বজন পরিবেশনে গিরিশচন্দ্র এগিয়ে এলেন। দীনবন্ধু মিত্র—মধুসূদন দত্ত—নবীনচন্দ্র সেন— যেমন গভীর আকর্ষিত হয়ে দর্শক মহলে গভীর আনন্দ সঞ্চার করেছিল ঠিক তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপের অভিনয়ও গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। **গিরিশচন্দ্র *'বিষবৃক্ষ'* নাটকাকারে রূপ দান করলেন এবং অভিনয়ে নিজে নগেন্দ্রনাথের ভূমিকায় অংশগ্রহণ করে হৈ চৈ ফেলে দিলেন।** দেবেন্দ্র—শ্রী—সূর্য্যমুখী—কুন্দনন্দিনী—কমলমণি—হীরার ভূমিকায় যথাক্রমে রামতারণ সান্যাল—মহেন্দ্রলাল বসু—কাদম্বিনী—শ্রীমতী বিনোদিনী—কমলা এবং নারায়ণী এঁদের অভিনয় বাংলা রঙ্গমঞ্চকে তোলপাড় করে তুলল।

বিষবৃক্ষ

গিরিশচন্দ্র নগেন্দ্রনাথের বিভিন্ন অবস্থার ভাব-ক্ষেপণ দর্শক-হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল।

এদিকে 'বিষবৃক্ষের' সাফল্যকে মূলধন করে বেঙ্গল থিয়েটারের কেদারনাথ চৌধুরী গিরিশচন্দ্রকে নিয়ে এলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র নাট্যরূপ দেবার জন্য অনুরোধ জানালেন। **গিরিশচন্দ্র কেদারবাবুর অনুরোধে *'দুর্গেশনন্দিনী'*র নাট্যরূপ দান করলেন এবং নিজে 'জগৎসিংহ'-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন।** এই 'দুর্গেশনন্দিনী' নাটকের 'তিলোত্তমা' ও আয়েষার উভয় চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন শ্রীমতী বিনোদিনী।

দুর্গেশনন্দিনী

গিরিশচন্দ্র তার প্রত্যেকটি নাটকের বিভিন্ন চরিত্রগুলিকে তার আকৃতি—কণ্ঠস্বর—পরিবেশ—তাদের হাঁটাচলা—ইত্যাদির প্রতি গভীর নজর দিতেন। তাই তার অভিনীত চরিত্রগুলি অনন্য জীবন্তরূপ ধারণ করত দর্শকের হৃদয়ে। একটা অসাধারণ অভিনয়

নৈপুণ্য রঙ্গমঞ্চকে প্রভাবিত করেছিল দীর্ঘদিন। সেই মেঘনাদ-রাম, পশুপতি, ক্লাইভ, নগেন্দ্রনাথ, জগৎসিংহ, সর্বত্রই অভিনয় পটুতা একই খাতে প্রবাহিত হয়েছিল।

'দুর্গেশনন্দিনী' নাটক চলাকালে মঞ্চে অনবধানবশতঃ বেনজীর অবস্থায় জগৎসিংহবেশী গিরিশচন্দ্র রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করা মাত্রই পা হড়কিয়ে পড়ে যান তাতে প্রচণ্ড আঘাতে বাম হাতের কব্জি ভেঙ্গে যায়—সেই অবস্থায় গিরিশচন্দ্র যন্ত্রনায় কাতর হয়ে কোন রকমে মঞ্চ ত্যাগ করে বাড়ীতে বন্দী হয়ে থাকেন প্রায় তিন মাস।

।। চৌদ্দ ।।

এদিকে *ন্যাশন্যাল থিয়েটারে* নানাভাবে ও সময়ে সত্ত্বাধিকারীর ব্যাপারে হাত বদল হয়। থিয়েটার ভাড়া নিয়ে নাটক অভিনীত করার ব্যবস্থা হলেও শৃঙ্খলার অভাবে নানাভাবে অপরিচ্ছন্নতার মানসিকতা বেশ ঝাকিয়ে বসেছিল। দীর্ঘ পরিশ্রমে যে ন্যাশন্যাল থিয়েটার দর্শক মহলে আদর্শ-আনন্দের উৎস ছিল তা সত্যিকারের শৃঙ্খলাপরায়ণ মালিকের এবং নেতৃত্বের অভাবে নষ্ট হতে চলেছিল। এমন একটি সময় এসেছিল দর্শকদের সংখ্যা বাড়াবার জন্য নানাবিধ উপহার (আংটি, কানের দুল, আয়না, রুমাল, সাবান, এসেন্স) প্রভৃতি দেওয়া হত। কিন্তু তাতেও হবার কিছু নয়। স্বাভাবিকভাবেই 'ন্যাশন্যাল থিয়েটার' বন্ধ হয়ে যায়। ভুবনমোহনবাবু দেনার দায়ে থিয়েটার নিলামে দেন। থিয়েটার জগতে সে এক দুঃসহ সময়। অনেক চেষ্টা করেও থিয়েটারের হাল ফেরানো গেল না। অবশেষে নিলামে কলকাতার এক **মাড়োয়ারী প্রতাপচাঁদ জহুরী থিয়েটার** কিনে নেন।

নাটকানুরাগীদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছিল। অনেকসময় স্থানীয় মহিলারাও থিয়েটারে আসতেন। তবে তাদের জন্য আলাদা তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না। মাঝে মাঝে পুরুষ দর্শকদের মধ্যে নানা ধরণের অস্থিরচিত্ততার এবং পানদোষজনিত অসুস্থ পরিবেশের আধিক্য হওয়ায় মহিলাদের অনেকেই থিয়েটারে আসতে চাইতেন না। এদিক থেকে প্রতাপচাঁদ জহুরী যখন ন্যাশন্যাল থিয়েটারের ভারগ্রহণ করলেন তখন তিনি থিয়েটারকে একটা সুস্থ পরিচ্ছন্ন পরিবেশে—বিশেষ করে থিয়েটারের কর্মীদের নির্দিষ্ট বেতন, নিয়মমত উপস্থিতি এবং সর্বোপরি অর্থ লেনদেনের যথাযথ হিসাবপত্তর বিষয়ে নজর দিতে শুরু করেন। থিয়েটারে ভাল নাটক এবং দর্শকের ভাল লাগা পরিবেশ সম্পর্কে প্রতাপচাঁদের ভাবনা ছিল প্রথম থেকেই। উপযুক্ত অভিনেতাদের নিয়ে ভাল নাটকের জন্য যোগ্য সুপরিচালক দরকার। নাটক যদি ভাল অভিনয় হয় এবং দর্শকের অনুকূলে যায় তা হলে দর্শক আগমন ও তার সঙ্গে সঙ্গে অর্থের আগমনও হবে একথা তিনি বুঝেছিলেন—তাই প্রথম থেকেই যোগ্য নাট্য পরিচালকের ক্ষেত্রে

গিরিশচন্দ্রকে ভেবেছেন। কারণ থিয়েটারকে ব্যবসাভিত্তিক করতেই হবে। তাই নিজে গিরিশচন্দ্রকে সর্বক্ষণের জন্য বেতনভোগী ম্যানেজার করার প্রস্তাব দিলেন প্রতাপচাঁদ।

কিন্তু গিরিশচন্দ্র তখন পার্কার কোম্পানীর অফিসে বুককিপারের কাজে গভীরভাবে যুক্ত। তাই গিরিশচন্দ্র প্রতাপচাঁদের অনুরোধ একেবারেই নস্যাৎ না করে বললেন,

> ....আমি অফিসের কাজ বজায় রেখে যেমনভাবে সন্ধ্যার পর থিয়েটারে এসে শিক্ষাদান এবং প্রয়োজনে অভিনয় করতাম, আপনার থিয়েটারেও সেরূপ করব, এরজন্য কারোর থেকে এখন যেমন অর্থ নিইনি, আপনার কাছ থেকেও আমি কোন অর্থ গ্রহণ করব না।

কিন্তু প্রতাপচাঁদের ইচ্ছা গিরিশচন্দ্র পুরো সময় থিয়েটারে থেকে অভিনয় শিক্ষা, পরিচালনা এবং অভিনয় করুন—কারণ গিরিশচন্দ্রের পরিচালনা ও অভিনয় সম্পদ এতদিন দেশের মানুষকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছে—তা প্রতাপচাঁদ জানতেন। তাই তিনি নিজে গিরিশচন্দ্রের বাড়ীতে গিয়ে দেখা করলেন এবং বললেন,

> ....না, না বাবু—তা হবে না, দুটো কাজ একজনের দ্বারা ভাল হবে না। আপনাকে অফিসের কাজ ছেড়ে দিয়ে আমার থিয়েটারে সকল সময়ের জন্য থাকতে হবে। আমি আপনাকে বর্তমানে মাসে একশত টাকা দেব এবং থিয়েটারে যে পরিমান লাভ হবে আপনার বেতনও তেমনভাবে বাড়ানো হবে। আপনাকে আমার থিয়েটারে চাই-ই। দেশের মানুষ আপনাকে ভালভাবে গ্রহণ করেছে। আমি নাটক দেখেছি—সর্বত্র আপনার প্রতিভা আমাকে, দেশের নাট্যরসিকদের হৃদয়ে জ্বল জ্বল করছে।

গিরিশচন্দ্র প্রতাপচাঁদের আগ্রহ ও বিষয়বুদ্ধির স্তর ভালভাবে অনুভব করলেন। গিরিশচন্দ্র একজন বড় অভিনেতা—কিন্তু নাটকের সহ অভিনেতাদের সুচারুরূপে তৈরী না করলে তাদের অভিনয়ের সৌরভ তার নিজের অভিনয়কে সুরভিত করতে পারবে না। তাই এ ক্ষেত্রে যদি ন্যাশন্যাল-এ পুরো সময়ের জন্য যোগদান করা যায় তাহলে অনেক সময় নিয়ে ভাল অভিনেতা তৈরীর পথ ও সুগম হবে। তাতে রঙ্গজগতেরও কল্যাণ ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে মনোযোগ দেওয়া যাবে। এই ভেবে গিরিশচন্দ্র প্রতাপচাঁদ জহুরীর প্রস্তাব গ্রহণ করলেন—পার্কার কোম্পানীর চাকুরী ছেড়ে দিলেন। গিরিশচন্দ্র নিজে গিয়ে পার্কার সাহেবকে সব খুলে বললেন। পার্কার সাহেব বেদনাভিভূত হয়ে গিরিশচন্দ্রকে হাত দুটো ধরে বললেন,

> আপনি কোম্পানী ছাড়বেন না—বেশ তো—থিয়েটার ও কাজ করবেন—দুটোতেই আপনি থাকুন তাতে আমার কোন আপত্তি নেই—আপনি আমাদের ছেড়ে যাবেন না।

গিরিশচন্দ্র কাতরভাবে জানালেন তা হয়না। থিয়েটারে যুক্ত হলে কোম্পানীর কাজ তেমনভাবে আমার পক্ষে নজর দেওয়া সম্ভব হবে না।

এর পর পর গিরিশচন্দ্র তার কাজের সব হিসাব নিকাশ জড়িত কাগজপত্তর পার্কার সাহেবকে বুঝিয়ে দিলেন।

পার্কার সাহেব গিরিশচন্দ্রকে কাছে ডেকে একটি হীরার আংটি গিরিশচন্দ্রকে আঙ্গুলে পরিয়ে দিলেন এবং কান্নায় ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

এই প্রথম গিরিশচন্দ্র বেতনভোগী হলেন থিয়েটারের কাজে।

গিরিশচন্দ্র ন্যাশন্যালে যোগদান করেই প্রবীন ও প্রতিভাবান নাট্যশিল্পীদের আহ্বান জানালেন তাঁর সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য। অল্পকালের মধ্যে অনেকেই গিরিশচন্দ্রের আহ্বানে আবার একত্রিত হলেন—জমজমাট হল 'ন্যাশন্যাল থিয়েটার'—মধ্যমণি গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

।। পনের।।

দীর্ঘদিন নানা সংশয়জড়িত বাধা ছিন্ন ভিন্ন করে গিরিশচন্দ্র নব উদ্যমে বাংলা নাট্য জগতে আপন সত্তার স্ফুরিত অনুরণে এগিয়ে যেতে চাইলেন। তিনি ভাবছেন, ভাল প্রতিভার স্ফুরণ চাই, তাই ভাল নাটক চাই।

প্রবীনদের অনেকেই—ধর্মদাস সুর, অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, নীলমাধব চক্রবর্তী, ক্ষেত্রমণি, কাদম্বিনী, লক্ষ্মীমণি, বিনোদিনী প্রভৃতিগণ গিরিশচন্দ্রের আখড়ায় এসে গেলেন।

গিরিশচন্দ্র এবার গভীর মনোনিবেশ করলেন নতুন নাটকের জন্য। কিন্তু বিষয়টা এতটা সহজ ও আয়াসের মধ্যে নয়। এযাবৎকালে যে সকল নাটকে অভিনয় করে বঙ্গসমাজে নাট্যরসিকদের মন জয় করে এসেছেন তাদের সবটাই উপন্যাস-কাব্য থেকে নাটক করা। দীনবন্ধু মিত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, নবীন চন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—এঁদের রচনাকে নাটকের উপযোগী করে মঞ্চস্থ করা এবং তাতে বিশেষ বিশেষ চরিত্র অভিনয় করে গিরিশচন্দ্র খ্যাতি অর্জন করেছেন।

এখন একটি নাট্যমঞ্চের পুরোপুরি বেতনভোগী কর্মী, পরিচালক ও অভিনেতা। প্রতাপচাঁদের অর্থ সেই অর্থের যথাযথ আয় বর্ধিত না হলে বদনাম হবে। তাই নতুন

হামির

নাটকের জন্য গিরিশচন্দ্র বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কাছে একটি 'নাটক' চাইলেন। 'মহিলা' কাব্য রচয়িতা সুরেন্দ্রবাবু রাজস্থানের ঐতিহাসিক কাহিনীর রসদে একটি নাটক রচনা করে গিরিশচন্দ্রকে পাণ্ডুলিপি দিলেন। নাটকটির নাম *'হামির'*। বাঙালি দর্শকের কাছে এযাবৎকাল নাটকের সংলাপের মাঝে মাঝে গানের ঝর্ণায়

অভিষিক্ত চেতনা গভীরভাবে রসায়িত হয়ে এসেছে। নতুন নাটকে কোন গান ছিল না। গিরিশচন্দ্র বার বার 'হামির' নাটকটি পড়লেন—অভিনয়ের জন্য রিহার্সালও দিলেন। কিন্তু তেমনভাবে জমছে না দেখে একেবারে বর্জন না করে কিছু গান রচনা করলেন এবং ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলি যুক্ত করলেন। মোট ৪ টি গান সহ দৃশ্যকল্পনায় গভীরভাবে মঞ্চস্থ হল 'হামির'। **গিরিশচন্দ্র হামিরের অভিনয় করলেন।** অভাবনীয় সার্থকতায় কলকাতার রসিকদের মন প্রাণ দখল করলেন গিরিশচন্দ্র। 'হামির' চরিত্রের অভিনয় আংগিক খুবই সংবেদনশীল প্রক্ষেপে দর্শককূল মোহিত।

কিন্তু গিরিশচন্দ্রের তৃপ্তি হল না। নাটকের অভিনয়ে মানব জীবনের প্রতিচ্ছবি জীবন্ত হয়ে দর্শকের তথা সমাজের ভাবনা ও চিন্তায় প্রভাব ফেলতে হবে। তাই নাটক চাই।

রাত্রিতে বাড়ী এসে আলাদা ঘরে বসে, কখনও বা অন্ধকারে পায়চারী করতে করতে, কখনও বা প্রত্যুষে সকলের অজান্তে গঙ্গার তীরে একাকী ঘুরে ঘুরে নূতন নাটকের কথা চিন্তা করতে করতে অবশেষে গিরিশচন্দ্র ৩ টি নাটক নিজেই রচনা করলেন *'মায়াতরু'*—*'মোহিনীপ্রতিমা'* এবং *'আলাদিন'*।

সম্পূর্ণ নতুন ধরনের অন্তর স্পর্শকরা সংলাপ এবং গান যুক্ত করে গিরিশচন্দ্র ন্যাশন্যাল থিয়েটারের মান মর্যদাকে সামনে তুলে আনলেন।

'মায়াতরু' নাটকে মূলভাব গীত। বলা যায় গীতিনাটক। হৃদয় উথালপাতাল করা গানের শব্দ ও সুর—অভিনয়ের দিনই দর্শকদের মাতোয়ারা করে তুলেছিল। বিরাট সার্থকতার সাড়া জাগানো এই গীতিনাটকটি গিরিশচন্দ্রকে আবার উচ্চস্তরে নিয়ে এল। **বঙ্কিমচন্দ্র গানের কথা শুনে নিজে *'মায়াতরু'* দেখতে এসেছিলেন। তিনি শুধু মুগ্ধ হননি—নাটকের শেষে নিজে গিয়ে গিরিশচন্দ্রকে গান ও অভিনয়ের জন্য প্রশংসা করলেন। 'না জানি সাধের প্রাণে কোন প্রাণে প্রাণ পরায় ফাঁসি'** যত্র তত্র সাধারণের মুখে মুখে এতই প্রচারিত হয়েছিল যে, ব্রাহ্মসমাজের কর্তাব্যক্তিদের মধ্যেও এ নিয়ে বেশ শোরগোল জেগেছিল। সমাজের আচার্য রাজনারায়ণ বসুও 'মায়াতরু' দেখতে এসেছিলেন। আনন্দিত হয়ে গিরিশচন্দ্রের ভবিষ্যৎ জীবনে অধ্যাত্মবোধের প্রকাশের ইংগিত দিয়েছিলেন।

'মোহিনীপ্রতিমা' এর পরের নাটক ' মোহিনী প্রতিমা'—প্রেমের স্নিগ্ধ গভীরতায় দর্শকের হৃদয় হরণ করল গিরিশচন্দ্র। এই নাটকের নায়িকা 'সাহানা'। *এই চরিত্রটি অভিনয় করেছিলেন শ্রীমতী বিনোদিনী*।

একজন স্ত্রীলোক অন্তর শক্তির প্রভাবে তার প্রিয়ার সম্পর্কে ভাবতে ভাবতে নিজেই পাষাণ হয়ে গেলেন। বিধাতার করুণায় সেই প্রিয়ার সন্দর্শনে হঠাৎ পাষাণবৎ কণ্ঠে বলল,

....হে পরমেশ্বর, আমি যার জন্য ভেবে ভেবে পাষাণ হয়েছি, এখণে যদি মানুষ হয়ে একটু কথা বলতে পারি.....

তৎক্ষণাৎ সেই পাষাণী প্রাণ পেল—মানুষ হল।

প্রেমের এমন গভীর তন্ময় তপস্যায় মুগ্ধ দর্শককূল। ধন্য ধন্য করে 'মোহিনীপ্রতিমা' কলকাতার পথে পথে প্রেমের নীরব প্রতীক্ষার পূর্ণতার আনন্দ ছড়িয়ে পড়ল।

'আলাদিন' নাটকের গানগুলির মধ্যেও দর্শক আপন প্রাণ সৌরভ লাভ করে মুগ্ধ হয়েছে। **গিরিশচন্দ্র *'আলাদিন'* নাটকে 'কুহকী'র ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।** এই নাটকের অন্য আর একটি আকর্ষন ছিল নাচ। গান ও নাচ যেন দর্শকের হৃদয় মাতোয়ারায় ছন্দায়িত হয়ে উঠতো—আনন্দ উচ্ছল ফোয়ারায় রঙ্গমঞ্চে তুফান জাগত।

গিরিশচন্দ্র যখন যে কাজে যুক্ত হতেন তা পুরোপুরি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে সম্পূর্ণ করতেন। তার জন্য অনেক সময় কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত নিতে দেরী অনিবার্যভাবে হোত। নতুন নাটকের জন্য নানা দিক থেকে সচেষ্ট গিরিশচন্দ্র। গীতিনাট্য অভিনয়ে দর্শক সমাজে সুনাম হয়েছে সত্য কিন্তু গিরিশচন্দ্রের তাতে তৃপ্তি হল না। তাই তিনি নাটকের অভিনয়ের হ্যাণ্ডবিলে নতুন নাটকের জন্য বিজ্ঞাপন দিতেন।

তাতে ও ভাল নাটকের কোন সন্ধান গিরিশচন্দ্র পেলেন না। রাত্রিতে বাড়ী এসে রাত্রি জাগরণে অস্থির চিত্ততায় ছট্‌ফট্ করতেন। অত্যন্ত সন্তর্পনে জীবনের সেই সব রাত্রি তাকে বার বার তাড়া করত রঙ্গমঞ্চের দিকে। অবশেষে নিজেই অগ্রসর হলেন নাটক রচনায়।

নাটকীয় ভাবনায় আবৃত মন—তাই নাটকের গতিপথ তাঁর জানা। গিরিশচন্দ্র *'আনন্দ রহো'* এই নামে একটি নাটক রচনা করলেন। সারারাত তিনি নাটকটির বিভিন্ন

আনন্দ রহো

চরিত্র নিজে অভিনয় করে করে নাটকটির ভাব সম্পদের ওজন বুঝতে চাইলেন। এমনি কয়েকটি রাত্রি অতিবাহিত করে একদিন সবাইকে খবর দিলেন নতুন নাটকের রিহার্সালে। বিষয়টি ঐতিহাসিক—ঘটনার বেড়াজালে অন্তর উত্তরণের প্রবাহিত বেগ যুক্ত করে 'আনন্দ রহো' নাটক। রাণা প্রতাপ ও বাদশা আকবর—যুদ্ধ আর যুদ্ধ—তারপর 'সন্ধিপ্রস্তাব'। পুরোটা ঐতিহাসিক চরিত্র হলেও ঐতিহাসিক নাটক হোল না। প্রধান একটি কাল্পনিক চরিত্র 'বেতাল'—গিরিশচন্দ্রের অন্তরসত্তার রূপকলা—একান্ত নিজস্ব মানসিক উত্তরণের বিস্তার। এক অভিনব সৃষ্টি। বাইরের শক্তির প্রচন্ডতায় মানসিক শক্তির প্রভাব—সেখানে জীবন প্রবাহের গতিমাত্রায় শুধু 'আনন্দ' হয়ে থাকার চেষ্টা করা। 'বেতাল' চরিত্রের সুখদুঃখ সবটাই আছে কিন্তু তাতে অবসিত না হয়ে নিঃস্বার্থভাবে পরসেবা পর-উপকারের মধ্যে দিয়ে জীবনের অমৃত-আনন্দ আস্বাদন লাভ করার পথ দেখিয়ে ছিলেন গিরিশচন্দ্র। দর্শকদের মনও আনন্দ রসের ঝর্ণায় অবগহিত হয়েছে সত্য কিন্তু সামগ্রিক তৃপ্তির সার্থকতা নাটকটিতে

তেমন লাভ করা যায়নি। ভাবাবেগের প্রবলতা দর্শকদের ভাসিয়েছে কিন্তু হৃদয়কে ততটা মুগ্ধতায় নিয়ে যেতে পারেনি।

গিরিশচন্দ্রের চিন্তায় ভাঁজ পড়ছে—ভাল নাটক চাই—নইলে নাট্য-সম্পদ আসবে না। আর ভাল নাটক না হলে দর্শক ও আসবেন না—অর্থ লাভ হবে না। প্রতাপচাঁদের ভাবনা বেড়ে যাবে—নাটকের শণিদশা হবে। এ ধরনের চিন্তায় বেশ বিব্রত, অনেকটা হতাশার বিচ্ছিন্নতায় ক্লান্ত গিরিশচন্দ্র।

গিরিশচন্দ্র জানতেন বাংলার বাঙালি নদীমাতৃক কমনীয় মানসিক ভাবালুতায় মজে থাকে। এবং তা এখনও বর্তমান বাংলার পৌরাণিক ঘটনায় ও নানা চরিত্রে। পৌরাণিক ঘটনার সাথে সাথে দেশ ও সমাজের যে ছবি বাঙালি ভালবাসে এবং অনুসরণ করতে এগিয়ে আসে অন্য কোন ঘটনায় তা সম্ভব নয়।

গিরিশচন্দ্র বাঙালির হৃদয়ানুভবের পাঁজরে হাত দিলেন—বুঝলেন, রামায়ণ ও নানা পৌরাণিক কাহিনীর বিচিত্র কাহিনীতে ভরপুর। সেখান থেকেই অতি সন্তপর্ণে

রাবণবধ

'রাবণ' চরিত্রকে কেন্দ্র বিন্দু করে *'রাবণবধ'* নাটক নিজেই রচনা করলেন। 'রাবণবধ' অভিনীত হল ন্যাশন্যালে। বিপুল সাড়া জাগল—ধন্য ধন্য হয়ে উঠল নাট্যশালা ন্যাশন্যাল থিয়েটার। দর্শকদের বিশাল সমাবেশ এবং অন্তর প্রসারিত চেতনালোকে মুগ্ধতার তৃপ্তি বহন করে পথে পথে 'রাবণবধ'-এর প্রশংসা। নাটকের রস ও শব্দচয়নে গভীরতায় সবাই খুশী। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র অভিনন্দিত হলেন। *গিরিশচন্দ্র রাম-এর ভূমিকায় সম্পূর্ণ একটি* অনন্য ধারায় ছন্দময় অমিত্রাক্ষরকে নতুন করে ব্যবহার করলেন। সেই ছন্দ সম্পূর্ণ একান্তভাবে গিরিশচন্দ্রের নাটকীয় ভাবনায় সিক্ত—নাম হল *'গৈরিশছন্দ'*।

এই গৈরিশছন্দে পরবর্তী পর্যায়ে বেশ কিছু পৌরাণিক নাটক রচনা করার আবেগ গভীরভাবে গিরিশচন্দ্রের নাটক রচনার শিল্পবোধে প্রসারিত হতে লাগল। কিন্তু খুব সহজ আয়াসে নতুন ছন্দের স্বীকৃতি আসবে না, একথা গিরিশচন্দ্র ভালভাবে জানতেন। তাই অবসর পেলেই অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে ছন্দের রাজ্যে বিচরণ করে তার সৃষ্ট কলা-রসের পরীক্ষা নিরীক্ষা করতেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীর স্বীকৃতি তখন যে কোন সাহিত্য চর্চায় খুবই অপরিহার্য ছিল। 'রাবণবধ' নাটকের ব্যবহৃত গৈরিশছন্দের বিষয়ে ঠাকুরবাড়ীর সংস্কৃতিবান মানুষরা গভীরভাবে পর্যালোচনা করলেন এবং অবশেষে প্রকাশিত 'ভারতী' পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখলেন,

> ....আমরা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রের নতুন ধরণের অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিশেষ পক্ষপাতী। ইহাই যথার্থ অমিত্রাক্ষর ছন্দ। ইহাতে ছন্দের পূর্ণ স্বাধীনতা ও মিষ্টত্ব উভয়ই রক্ষিত রয়েছে...

গিরিশচন্দ্র তাঁর নবসৃষ্ট ছন্দের প্রচলনের গুরুত্ব সম্পর্কেও খুবই সচেতন ছিলেন। কবি নবীনচন্দ্র সেন, অক্ষয় সরকার তখনকার সাহিত্যজগতের বিশেষ ব্যক্তিত্বদের কাছে নতুন ছন্দের বিষয়ে তাঁর অভিমত প্রকাশ করে তাঁদের মতামত জানতে চেয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্র রেঙ্গুনে নবীনচন্দ্র সেনকে তার 'ছন্দ' সম্পর্কে নিজের কৈফিয়ৎ দিয়ে একটি পত্রও দিয়েছিলেন,

> ....তুমি যুদ্ধ না করিলে কি হয়? আমি যুদ্ধ করব। যুদ্ধ আর কিছু নয়। গৈরিশ ছন্দের একটা কৈফিয়ৎ। গৈরিশছন্দ বলে যে একটা উপহাসের কথা আছে, তার প্রতিবাদ। প্রতিবাদ এই, আমি বিস্তর চেষ্টা করে দেখেছি, গদ্য লিখি সে বড় স্বতন্ত্র, কিন্তু ছন্দোবদ্ধ ব্যতীত আমরা ভাষাকথা কইতে পারি না। চেষ্টা করলেও ভাষা-কথা কইতে গেলেই ছন্দ হবে। সেই জন্য ছন্দে কথা নাটকের উপযোগী। উপস্থিত দেখা যাক্, কোন ছন্দে অধিক কথা হয়। দীর্ঘ ত্রিপদী, লঘু ত্রিপদী বা যে যে ছন্দ বাংলায় ব্যবহার হয় সকলগুলি পয়ারের অন্তর্গত। অমিত্রাক্ষর ছন্দ পড়বার সময় আমার যেমন ভাঙ্গা লেখা তেমনি ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়তে হয়। যেখানে বর্ণনা সেখানে স্বতন্ত্র, কিন্তু যেখানে কথাবার্তা সেখানেই ছন্দ ভাঙ্গা।....

'রাবণবধ' নাটকের কাহিনীর মধ্যে 'দূর্গোৎসব' বাঙালির অন্তর আকুতির সুসংবদ্ধ সংযোজন। বাল্মীকী রামায়ণে বিষয়টি নেই। শুধুমাত্র বাঙালি কবি কৃত্তিবাসে তার উল্লেখ মাত্র আছে। গিরিশচন্দ্র বাঙালির মনন ও হৃদয় অনুভব করে উক্ত 'রাবণবধ' নাটকে এমনভাবে স্বচ্ছ সুন্দর ভাষায় সংযোজন করেছেন যা এক অর্থে বাঙালি দর্শকদের নিজস্ব, আপন ঘরের কাহিনীতে পর্যবসিত হয়ে সর্বজনীন রূপ লাভ করেছে।

গিরিশচন্দ্র এগিয়ে চললেন। ন্যাশন্যাল থিয়েটারের প্রভাব কলকাতার দর্শক সমাজে অত্যন্ত সচেতন আনন্দে ভরপুর। গিরিশচন্দ্র তা অনুভব করে এগিয়ে চললেন। বাড়ীতে যতটুকু সময় থাকেন—তাতে সেই নাটক আর নাটকের ভাবনা। 'রাবণবধ' নাটকের

সীতার বনবাস

সফলতায় গিরিশচন্দ্র সেই রামায়ণের কাহিনীতেই আপন তেজশক্তির স্নিগ্ধ আকুতি উজার করে দিয়ে *'সীতার বনবাস'* নাটক রচনা করলেন। সমগ্র রামায়ণের সবচেয়ে করুণ বেদনার স্পর্শ গিরিশচন্দ্র আবেগ ও হৃদয়কে যুক্ত করলেন। *নিজে রামচন্দ্রের ভূমিকায়*—লক্ষণের ভূমিকায় মহেন্দ্রলাল বসু—ভরতের ভূমিকায় অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়—*লব ও কুশের ভূমিকায় যথাক্রমে বিনোদিনী ও কুসুমকুমারী*। আর *সীতার ভূমিকায় কাদম্বিনী দেবী*—অভাবনীয় হৃদয় বিদারক অভিনয়—যা থিয়েটারে দর্শকদের বেদনাবিদ্ধ করে কান্নায় কান্নায় অবসিত করে তুলেছিল। বিষয়ে করুণ পরিবেশ তার উপর গিরিশচন্দ্রের আবেগ মিশ্রিত শব্দ চয়ন—

সর্বোপরি অভিনয়। ভাব - কবিত্ব এবং চারিত্রিক মহত্ব 'সীতার বনবাস' নাটকটিকে দর্শকসমাজ অত্যন্ত প্রশংসার সাথে গ্রহণ করেছিলেন।

'ভারতী' পত্রিকায় 'সীতার বনবাস' নাটকটি সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর উল্লেখ করেছেন....

.....গিরিশবাবুর রচিত পৌরাণিক দৃশ্য কাব্যগুলিতে তাঁর কবিত্ব শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। তিনি তাঁর বিষয়গুলির সৌন্দর্য ও মহত্ব কবির ন্যায় বুঝেছেন ও তা অনেক স্থলে কবির ন্যায় প্রকাশ করেছেন।....

....সীতা বর্জনের ভার লক্ষণের প্রতি অর্পিত হলে লক্ষণ রামকে যা কহেছিলেন, তা অতি সুন্দর।

....সীতার শেষ প্রার্থনা অতি মনোহর হয়েছে। যখন পৃথিবীতে জীবনের কোন বন্ধন নেই, অথচ জীবন রক্ষা কর্ত্তব্য, এমন দেবতার কাছে প্রার্থনা করা, সন্তানবাৎসল্য ভিক্ষা করা ....

জগৎ মাতা,
শিখা ওগো দুহিতারে জননীর প্রেম!
ছিন্ন অন্য ডুরি,
প্রেমে বাঁধা রেখ মা সংসারে,
ওরে, কে অভাগা এসেছ জঠরে।

অতি সুন্দর হয়েছে—

যবে গভীরা যামিনী, বসি দ্বারে
শিশু দুটি ঘুমায় কুটীরে
চাঁদপানে চাহি কাঁদি সই
চাঁদ মুখ পড়ে মনে।

'সীতার বনবাস' নাটকখানি গিরিশচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামে উৎসর্গ করে বলেছিলেন

....মাতৃ-ভাষা জানি না বলা ভাল নয়, মন্দ। মহাশয়ের 'বেতাল' পাঠে বুঝলাম। আচার্য! আমার পরীক্ষা গ্রহণ করুন। আমি চিরদিন মহাশয়কে মনে মনে বন্দনা করি।

গিরিশচন্দ্রের পরবর্তী নাটক, চতুর্থ নাটক *'অভিমুন্যবধ'*। বাঁধনহারা জন তরঙ্গের করতালিতে নাটকটির সাফল্যকে গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার ভবিষ্যৎ দিগ্‌দর্শন করে দিল।

অভিমণ্যুবধ

ন্যাশন্যাল থিয়েটার দর্শকদের অন্তরে এঁটে রইল সমস্ত হৃদয় দিয়ে। আর তার চালনা শক্তিতে প্রাণতরঙ্গের প্রবাহকে অপ্রতিহত করে তুলছিলেন গিরিশচন্দ্র।

এই *'অভিমুন্যবধ'* নাটকে *গিরিশচন্দ্র দ্বৈতভাবে যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধন ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।* শুধু তিনি নন, গিরিশচন্দ্র তাঁর অনুগামী অভিনেতাদেরও দ্বৈতভূমিকায় অভিনয় করিয়েছিলেন—যেমন, শ্রীকৃষ্ণ ও দ্রোণাচার্যের ভূমিকায় কেদারনাথ চৌধুরী; ভীম ও গর্গ-এর ভূমিকায় অমৃতলাল মিত্র; অর্জুন ও জয়দ্রথ এর ভূমিকায় মহেন্দ্রলাল বসু; সুভদ্রা—গঙ্গামনিচ; উত্তরা—বিনোদিনী; রোহিনী—কাদম্বিনী এবং অভিমূন্য—অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়।

এই *'অভিমুন্যবধ'* নাটকে গিরিশচন্দ্র প্রত্যেকটি চরিত্রের মহত্বকে কোন অনিবার্য ঘটনার বেড়াজালে আবদ্ধ করেন নি—বরং মৃত্যুজনিত বেদনার শেষ পর্যায় থেকে চরিত্রগুলিকে তুলে এনেছেন দর্শকের রক্ত মাংসের আস্বাদনের বিচিত্র উপলব্ধিতে—কান্নায়, বেদনায়—অভিমানে—কোথাও নিয়তির কাছে আত্মসমর্পন করেননি—তাই অভিমুন্য মরেনি—অর্জুন মরেনি—কৃষ্ণ মরেনি। গিরিশচন্দ্র মৃত্যুকে অনিবার্য করেন নি। মৃত্যুকে আবশ্যকতায় গিরিশচন্দ্র স্বাভাবিকভাবেই চরিত্রগুলিকে আমাদের কাছে গ্রহনীয় করে তুলেছেন। সেখানে 'নিয়তি' ততটা কাজ করতে পারেনি। এখানেই গিরিশচন্দ্র অনন্য। নানা দিক থেকে গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা বিপুল তেজে ছুটছে তো ছুটছে। এরই মধ্যে সেই একই বৃত্তায়নে *'লক্ষ্মণবর্জন'* নাটক রচনা করলেন বাংলার দর্শকদের হৃদয়ের কথকথায়। কবিত্ব ও ভাবের স্বকীয় সত্তার অপূর্ব প্রকাশভংগীতে সত্যকে সামনে রেখে রামকে নিয়ে 'লক্ষণবর্জন' করালেন ও ভাবের গভীরতায় শাশ্বত সত্যকে প্রকাশ করলেন—বীরের জন্য বীর নয়— প্রেমের জন্যই বীর এবং তা মহৎ হয়ে দর্শকের হৃদয়কে বেশী করে দোলা দিয়েছে। অভিনয়ের প্রতিটি কলা মূল ভাবনার রসকে আস্বাদন করিয়ে গিরিশচন্দ্র 'লক্ষণ বর্জনে' নিজের স্বকীয়তার প্রমাণ দিলেন।

লক্ষ্মণবর্জন

সেবা মম পূর্ণ এতদিনে
আত্ম বিসর্জনে পূজা করি সম্পূরণ!
ত্যাগ শিক্ষা মোরে শিখাইলা দয়াময়
করি আপনা বঞ্চন;......

বক্তব্যের ভেতর থেকে ত্যাগ-বোধের পবিত্র গন্ধ রঙ্গমঞ্চের প্রতিটি স্তম্ভকে মিষ্টত্ব দান করে সুষমামন্ডিত করেছিল। দর্শক আনন্দ রসাস্বাদনের পুলকে বিভোর হয়ে গেলেন।

দর্শক সমাগম ও অভিনীত নাটকের সাফল্য গিরিশচন্দ্রকে প্রেরণা ও উৎসাহ এত দিয়েছিল যে তিনি তারপর পর পর *'সীতার বিবাহ', 'রামের বনবাস', 'সীতাহরণ', 'ব্রজবিহার'* নাটক রচনা করে অভিনয় করান। সীতাহরণ নাটকে **গিরিশচন্দ্র বিশ্বামিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন**। পরবর্তী নাটকগুলি তেমনভাবে দর্শকরা গ্রহণ করেননি তবে বিরূপতা হয়নি।

গিরিশচন্দ্র এরপর একটি ব্যঙ্গ নাটক *'ভোট মঙ্গল'* রচনা করেন এবং ন্যাশন্যাল থিয়েটারে এ ধরণের নাটক প্রথম অভিনীত করান। বড়লাট লর্ড রিপন কলকাতা করপোরেশনের জন্য প্রথম স্বায়ত্তশাসন প্রথা প্রচলন করেন। তাই করপোরেশনের কমিশনার নির্বাচন। এই নিয়ে কলকাতায় গরম গরম বিধি ব্যবস্থাসহ নানা গর্জন। এমনি ভাবনায় গিরিশচন্দ্র ' ভোটমঙ্গল' নাটক রচনা করেন এবং **ঐ ব্যঙ্গ নাটকে 'নাচওয়ালার' ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র নিজে অভিনয় করে কলকাতার** মানুষকে হাসির মাদকতায় নতুন রস-আস্বাদন করিয়েছিলেন। নাট্যভাবনায় এই ধরণের ব্যঙ্গ রসাত্মক পরিকল্পনায় দর্শকদের হাসির মজার অন্তরালে বেশ কিছু সামাজিক কথা, ব্যক্তিজীবনের ভাল-মন্দ ছড়ানো জড়ানো কথাও স্থান পায় তাতে নাটকের রস ঘনীভূত হয় এবং আলোচনার সূত্র হয়ে যায়।

ভোটমঙ্গল

গিরিশচন্দ্র প্রতিনিয়তই নিজেকে তার স্বাভাবিক গুণ ও মেজাজে সমাজের তথা মানুষের উত্তরণের ভূমিকা তৈরীতে সহযোগিতা করতে উদ্যোগ নিতেন—তার রচিত নাটকগুলির মধ্যে বিষয় ও কাহিনীর পশ্চাদপটে সে ভাবনা বিশেষভাবে গতিশীল থাকত, যার ফলে দর্শক-পাঠক বার বার বিষয়ের নানাবিধ চিন্তার জট খুলে মুক্ত-চিন্তার বাধাহীন গতিতে বিচরণ করতে সুযোগ পেত এবং আনন্দ পেত।

'ভোটমঙ্গল' নাটকের পর গিরিশচন্দ্র এদেশের দর্শকদের কাছে ইটালীয়ান অপেরার প্রভাবকে কার্যকর করার অভিপ্রায়ে *'মলিনমালা'* এই নামে একটি নাটক রচনা করে ন্যাশন্যালে মঞ্চস্থ করালেন। পুরোটাই গানের মধ্য দিয়ে কিছু রস সঞ্চার। 'লহরকুমার' এই ভূমিকায় বিখ্যাত সংগীত শিল্পী রামতারণ সান্যাল—যাঁকে গিরিশচন্দ্র তার অনেক নাটকের অন্তগর্ত গানে সুর সংযোজনের সহযোগিতা পেয়েছেন। সেক্ষেত্রে নাট্যকারের গান রচনায় কিছুটা ধীর-গতি তথা ভাবনার গতিও নিয়ন্ত্রণে রাখতে বাধ্য হতেন। কিন্তু 'মলিনমালা' নাটকের ব্যাপারে রামতারণবাবু গিরিশচন্দ্রকে পুরোমাত্রায় স্বাধীনভাবে গান রচনার কথা বললেন এবং সেইমত গিরিশচন্দ্র গানগুলি রচনা করেছিলেন। নাটকটি অভিনয়কালে রামরতনবাবু গিরিশচন্দ্রের রচিত গানগুলি যথাযোগ্য ভাব সমৃদ্ধিতে সুর সংযোজন করেছিলেন। গানগুলি ভালভাবে গীত হয়েছিল কিন্তু দর্শকগণের তেমন তৃপ্তিবর্ধিত হয়নি।

মলিনমালা

এরপর গিরিশচন্দ্র বাঙালির চিত্তে সংরক্ষিত আর একটি মহাকাব্য 'মহাভারত' থেকে কাহিনীর বিস্তারে মনোনিবেশ করলেন। *'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'* গিরিশচন্দ্র রচনায় ও অভিনয়ে গভীর কৃতিত্ব লাভ করেছিলেন। মহাভারতের সেই চরিত্রগুলি ঘটনার মধ্যে আবদ্ধ না রেখে জীবন্ত মানুষের মত শোক-দুঃখ-বেদনা-সুখ ও আনন্দ বহন করে দর্শকের সহমর্মি হয়ে নিত্যকালের সহচর হয়ে উঠল। বিভিন্ন চরিত্রগুলি অভিনয়-দ্যুতিতে দশ[illegible]

পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস

প্রীতি উদয় হয়েছিল। ঘটনা সকলের জানা—কিন্তু চরিত্র চিত্রণে এবং কাহিনীর উপস্থাপনায় যে বেগ তাতে চরিত্র ও দর্শক একাকার হয়ে গেলেন।

অর্জুন যখন বলছেন, (মহেন্দ্রলাল বসু)

বার বার দ্রৌপদীর অপমান—
সম্মুখে আমার!
বনবাস, পরবাস,
লুক্কায়িত ক্লীববেশ—
ভগবান! কিম্বাধিক আর?
হৃদয়ে অনল যত,
শরানল প্রজ্বলিত তত
করিব সমর-স্থলে,
খান্ডব-দাহনে হেন অগ্নি না জন্মিল!
দেখিব দেখিব—অক্ষয় তূণীর দ্বয়
কত শত করিবে প্রসব
সব্যসাচী করে মোর,
বুঝিব—বুঝিব গান্ডীবের কত বল!

অভিনয়দীপ্ত স্বরক্ষেপন দর্শকদের মাতোয়ারা করে অর্জুনের ভাব শক্তির ধীর-উদ্দীপক সংকল্পে একাকার হয়ে গেল।

গিরিশচন্দ্র নিজে কীচক ও দুর্যোধনের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। যেখানে দ্রোপদী কীচক দ্বারা অপমানিতা ও লাঞ্ছিতা হলেন যখন দ্রোপদীর বেদনা সিক্ত অভিমান সঞ্জাত ক্ষোভের প্রকাশে ভীমকে লক্ষ্য করে বললেন,

ধিক্ ধিক্ বীরাঙ্গনা বলি মনে করি অভিমান।
তিন দিন যদি বয়ে যায়
কীচক না হারায় পরাণ
ভগবান, আত্মহত্যা না ডরিব—
পাসারিব দুঃশাসনে—
বেণী না বাঁধিয়া,
জলে তনু দিব বিসর্জন!
নিদ্রিত। কি শুইয়াছ মহানিদ্রা-কোলে—
উব উব সূপকার—

তখন দর্শক ভাবছেন—কি আর এখন হবে। কিন্তু কীচক (গিরিশচন্দ্র) উপস্থিত হয়ে

প্রভাত-সমীরে শীতল না হয় প্রাণ,
জ্বলে—দেহ জ্বলে,

উষ্ণভালে না পরশে বায়ু
উষ্ণ ওষ্ঠ সলিলে সরস নাহি হয়।

সম্পূর্ন ভিন্ন একটি চিন্তায় আত্ম-অনুশোচনার জ্বালা ছড়িয়ে দিয়ে দর্শকদের হতবাক্ করে দিলেন অভিনয়ের দীপ্ত শান্ত অথচ হৃদয়-তপ্ততার অনুশোচনার বিচ্ছুরিত স্পন্দনে। শুধু মুগ্ধতা নয়—স্তব্ধ হয়ে গেলেন দর্শকগণ। মৃত্যু চূড়ান্ত শাস্তি নয়, অন্তর যন্ত্রনার তীব্র কশাঘাত প্রতিনিয়ত যেভাবে হৃদয়কে চুরমার করে দিতে পারে তারই প্রকাশ করলেন গিরিশচন্দ্র কীচকের ভূমিকায়। গিরিশচন্দ্র মানুষকে খুঁজেছেন। সেই মানুষ খোঁজার জন্য নানাভাবে আপন অন্তর-সমৃদ্ধ চেতনার মাশুল গুনে গুনে দিয়ে চলেছেন অনবরত।

প্রতাপচাঁদ জহুরীর 'ন্যাশন্যাল থিয়েটারে' গিরিশচন্দ্র তাঁর রচিত নাটকের শেষ অভিনয় 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'। 'মাধবী কঙ্কনে' (রমেশচন্দ্র দত্ত রচিত) র অভিনয় করিয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র সেই ন্যাশন্যাল থিয়েটারে।

।। ষোল ।।

প্রায় দু'বৎসর গিরিশচন্দ্র প্রতাপচাঁদের ন্যাশন্যাল থিয়েটারে কাজ করলেন। এই কার্যকালে গিরিশচন্দ্র ৯টি নাটক ও ৬টি গীতিনাট্য রচনা করেছেন এবং থিয়েটারে অভিনয় করিয়েছেন। গিরিশচন্দ্র তার নিজস্ব শক্তি ও অভাবনীয় প্রতিভা স্ফুরণে বাংলা নাটক ও অভিনয়কে প্রাণ দান করেছিলেন। সে সম্পর্কে 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' প্রবন্ধে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন,

> .... এতদিন থিয়েটার নাটকের জন্য পরমুখাপেক্ষী ছিল। পরদত্ত অনুগ্রহে পুষ্ট তার ক্ষীণকায় ঠিক পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারছিল না। আজ দীনবন্ধুর নাটক, কাল বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস নাটকাকারে অভিনীত হয়ে কায়ক্লেশে যেন থিয়েটারের মর্যাদা রাখতেছিল। তারপর দুর্ভিক্ষের সময় যেমন অন্নের বিচার থাকে না, লোকে কদন্ন আহার করে, তেমনি যার তার ছাই পাঁশ রাবিশ নাটক অভিনয়ের চাপে রঙ্গমঞ্চ প্রাণশূণ্য হয়ে পড়তে লাগল। নাট্যবাণীর বরপুত্র গিরিশচন্দ্র এর সেই মৃতকল্প দেহে জীবন সঞ্চার করলেন। তাঁর সময় হতেই লোকে বুঝল, কেবলমাত্র অভিনয় প্রতিভা লয়ে জন্মালেই নাট্যশালার সর্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি করতে পারা যায় না। নাট্যবাণীর পূজার প্রধান উপকরণ—ইহার প্রাণ—ইহার অন্ন—পাঠক। গিরিশচন্দ্র এ দেশের নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মানে—তিনি অন্ন দিয়ে ইহার প্রাণরক্ষা করেছিলেন, বরাবর স্বাস্থ্যকর আহার দিয়ে একে পরিপুষ্ট করেছিলেন; ইহার মজ্জায় মজ্জায় রস সঞ্চার করে ইহাকে আনন্দপূর্ণ করে

> তুলেছিলেন। আর এজন্যই গিরিশচন্দ্র Father of the native stage. এর খুড়ো, জ্যাঠা আর কেহ কোন দিন ছিল না, ইহা এক প্রকার অভিভাবকশূণ্য বেওয়ারিশ অবস্থায় চলছিল, পড়ছিল ধূলায় গড়াচ্ছিল। যে অমৃত পানে বাঙলার নাট্যশালা পঞ্চাশ বৎসরাধিক বেঁচে আছে, প্রকৃতপক্ষে সে অমৃতের ভান্ড বহন করে এনেছিলেন গিরিশচন্দ্র। কাজেই বাঙলা নাট্যশালার পিতৃত্ব্যের গৌরবের অধিকারী একা গিরিশচন্দ্র।....
>
> রূপ ও রঙ্গ / শ্রাবণ ১৩২২

গিরিশচন্দ্রের রচিত নাটক, তাঁর পরিচালনা ও তাঁর অভিনয় সবকিছু যুক্ত হয়ে প্রতাপচাঁদের ন্যাশন্যাল থিয়েটারের অর্থাগম ও খ্যাতি তুঙ্গে উঠেছিল।

গিরিশচন্দ্র নিজের হাতে তাঁর নাটক খুব একটা রচনা করতেন না। মাঝে মাঝে রাত্রিতে বাড়ী এসে প্রস্তাবিত নাটকের কাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংলাপের উপযুক্ততার বিস্তৃতিতে ব্যস্ত থাকতেন।

বাড়ীতে নাটকের সহকর্মী, বন্ধু-বান্ধবদের ডেকে এনে খাতা কলম দিয়ে বসাতেন— আর নিজে কখনো বসে, কখনো দাঁড়িয়ে পায়চারী করতে করতে মুখে মুখে একই সঙ্গে পরপর নাটকের সংলাপ, চরিত্র সহ যা যা প্রয়োজন সব বলে যেতেন। আর মুখের কথা শুনে অমৃতলাল বসু—কেদারনাথ চৌধুরী—অমৃতলাল মিত্র—সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার—দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রভৃতি হিতৈষী শুভানুধ্যায়ী নাটুকেরা অনুলিখন করতেন অত্যন্ত সন্তর্পণে। কখনো বা ভাবের বিপুল বেগে গিরিশচন্দ্র অত্যন্ত দ্রুত গতিতে মুখে মুখে একই সঙ্গে কয়েকটি নাটকের তৈরী সংলাপ বলে যেতেন— অনুলেখকদের কলমে কালি তুলে লিখবার অবকাশ হোত না—সেদিকে গিরিশচন্দ্রের এতটুকু দেখার সময় নেই—অনুলেখকদের কেহ কেহ গিরিশচন্দ্রের বলা বাক্য বা ঘটনা পুরোটা অনুসরণ করতে না পেরে দ্রুততার সঙ্গে পুনরায় বলার জন্য বলতেন— তাতে গিরিশচন্দ্র বিরক্ত হতেন— খেই হারিয়ে যেত— ভাব-উচ্ছ্বল বেগে প্রচন্ড বাধা আসতো—তিনি বলতেন,

> .... কি ক্ষতি করলে জানো? যা বলেছি, তা তো আর মনে নেই—আর যা বলতে চেয়েছিলাম তা ও মনে নেই—সব গোলমাল হয়ে গেল—

এভাবেই গিরিশচন্দ্র ন্যাশন্যাল থিয়েটারের জন্য পর পর নাটক রচনা করেছেন। অনুলেখকদের কাছ থেকে পান্ডুলিপি তিনি একান্ত নির্জনে বসে নাটকীয় ভঙ্গিমায় নানা স্বর মেপে দেখে নিতেন—প্রয়োজনে পরিবর্তন ও সংযোজন করে তবে নাটকের যোগ্য করে অভিনয়ের জন্য রিহার্সাল করাতেন এবং অভিনীত হোত।

গিরিশচন্দ্র তাঁর জীবন পর্যালোচনায় অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। বিচিত্র ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যদিয়ে পথ কেটে কেটে তাকে চলতে হয়েছে—এবং সেভাবেই তার

নাট্যজীবনের বীজ উপ্ত হয়েছে প্রতিদিনের জীবন চর্যায়। নাটককেও তিনি সেভাবেই অত্যন্ত সাবলীল ভাষা ও ভঙ্গিমার মধ্যে অনুরণিত করে সহজতর করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন—তাই তার নাটকের সংলাপে অযথা কোন উপমা বা কঠিন শব্দ অলংকার তেমন স্থান পায়নি। তিনি বলতেন,

.... নাটকের ভাষা যত প্রাঞ্জল হবে, অভিনয়ও সেরূপ সাফল্যমন্ডিত হবে। আমি যেখানে সহজ কথায় ঠিক মনোভাব পরিস্ফুট হচ্ছে না বুঝেছি—সেস্থানেই মাত্র উপমা ব্যবহার করেছি নচেৎ উপমা বা অলংকার ছটায় ভাবকে ভারাক্রান্ত করতে প্রবৃত্ত হইনি। নাটকের ভাষা সরল ও স্বাভাবিক হলে উচ্চশিক্ষিত হতে অল্পশিক্ষিত পর্যন্ত্য সকলেই সমভাবে উপভোগ করে থাকে। ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দও এই উদ্দেশ্যেই প্রবর্তন করেছিলাম।....

গিরিশচন্দ্র ব্যবহারিক জীবনে অত্যন্ত স্পষ্টবক্তা ছিলেন। অন্তরের ও বাইরের নানা পরিবেশে যে তাপ উত্তাপ জাগতো তিনি অত্যন্ত গভীরভাবে তার সমাধান করতেন। সাহস ও শক্তির সম্মিলিত রূপ গিরিশচন্দ্রের শারীরিক গঠনে মজবুত। তাই কোন বিষয়ে বিচার বিশ্লেষণ না করে নুয়ে যেতেন না। তর্ক করতেন, নানাভাবে যুক্তির আশ্রয়ে নিজের বোধকে প্রকাশ করতে এতটুকু কিন্তু কিন্তু করতেন না। স্পষ্টভাবে সরাসরি তা ভাল, মন্দ বিচার করেই সিদ্ধান্ত জানাতেন। তাতে প্রিয়জন-বন্ধুজন এমন কি যারা গিরিশচন্দ্রকে আন্তরিকভাবে আপন মানুষ বলে ভাবতো তারাও ক্ষুন্ন হতেন, বিব্রত হতেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র পুরোপুরি সেদিক থেকে অনড় থাকতেন।

বাড়ীতে বেশীক্ষণ থাকতেন না। সুযোগ সময় পেলেই বাড়ীর নিকটবর্তী গঙ্গার ঘাটে ঘাটে ঘুরে বেড়াতেন—কখনও বা কিছুক্ষণ একটি জায়গায় বসে গঙ্গায় আসা বিভিন্ন মানুষের ব্যবহার দেখতেন। এমনি একদিন গিরিশচন্দ্র ভারী মানসিকতায় গঙ্গার ঘাটে ঘুরছেন, হঠাৎ কানে ভেসে এল —

.... অভেদে ভাব রে মন কালা আর কালী
মোহন মুরলীধারী চতুর্ভূজা মুন্ডমালী।।

দাঁড়িয়ে গেলেন গিরিশচন্দ্র। চুপ করে গেরুয়াধারী গায়কের দিকে লক্ষ্য করে গানটি শুনতে শুনতে বেশ থেমে রইলেন

....কালী কি কালা বলিলে, কালে ছোঁয় না কোন কালে
কালের কর্ত্রী কালী সেই, কালা আমার মা কালী।।

গিরিশচন্দ্র বেশ মেতে গেলেন—হাস্য-উজ্জ্বল তৃপ্তিভরা মনে সজাগ হয়ে গান শুনছেন,

.... কভু শিব, কভু শক্তি, পুরুষ আর প্রকৃতি
ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা মূর্তি, কভু কাল, কভু বা কালী।

গায়ক নাচতে নাচতে কথাগুলি পরম আদর ও দরদ দিয়ে গাইছেন—

.... অপার লীলা বুঝিতে, কে পারে এ ত্রিজগতে
হন উদয় যার হৃদেতে, সে জানে এক সকলি।।

গিরিশচন্দ্র এবার বসলেন, খুব মেজাজে গানের তালে তাল মিলিয়ে বিভোর হয়ে শুনছেন,

.... শৈব, গাণপত্য, শক্তি, সৌর আর যে বিষ্ণু-ভক্তি,
প্রভেদ ভাবিলে ব্যর্থ, বৃথা সে দলাদলি
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব রাম, দুর্গা কালী রাধা শ্যাম
সবে এক, একে সব, একের বলে সবাই বলী।

গিরিশচন্দ্র চোখ বুঝলেন—ভেসে আসছে

'সবে এক, একে সব, একের বলে সবাই বলী'—বারবার মনে মনে উচ্চারিত হচ্ছে।

ক্লান্ত গিরিশচন্দ্র। চোখে মুখে তখন ভাবানুসিক্ত নতুন বোধের অনুরণন। সেই...সবে এক, একে সব, একের বলে সবাই বলী।

কিছুক্ষণ নীরব, প্রায় স্তব্ধ বিহ্বলতায়, স্পন্দনহীন। অনেক কিছু ভাবতরঙ্গের দোলায় আপনা থেকে ভেসে চলছেন—ঠিক সেই সময় মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক গিরিশচন্দ্রকে দেখে থেমে গিয়ে কাছে এসে বললেন,

গিরিশবাবু যে, কি সুন্দর গান রচনা করেছেন আপনি—

"আমার এ সাধের তরী প্রেমিক বিনা নেইনি কারে" মাইরী! অপূর্ব, অপূর্ব।

গানের কলি বলতে বলতে চলে গেলেন।

গিরিশচন্দ্র পথিকের চলে যাওয়া পথে চেয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ কেটে যায়—একদল, তারা 'তারকনাথের চরণে লাগে' বলতে বলতে গঙ্গার ছায়াস্নিগ্ধ নিকোণো জায়গায় সারাদিনের উপাসান্তে ফলাদি নিয়ে বসল।

গিরিশচন্দ্র তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে— পরিধানে গৈরিক, কাঁধে বাঁক। একটু সময় পরে ওরা গঙ্গায় অবগাহন করে ফলাহার করে বাঁক কাঁদে 'জয় বাবা তারকনাথের চরণে লাগে' বলতে বলতে এগিয়ে গেল।

....ওরা কেন এমন করে জীবনটাকে নষ্ট করে—কি পায় ওরা—কোথায় তারকনাথ—কে তারকনাথ! নির্বোধ দেশ, নির্বোধ দেশবাসী—কোন কাজ নেই, কেবল অন্ধের মত ঠাকুর দেবতার জন্য শরীর পাত করছে। আরে, নিজের দিকে, নিজের শরীরের দিকে তাকা—ভোগ কর—স্ত্রী পুত্র সংসারে মন দাও—তারকনাথ —তারকনাথ বলে কিছু হবে না।

কিছুক্ষণ পরে—কেউ নেই, ঈশ্বর বলে কেউ নেই—সব মিথ্যা, সব বুজরুকীর আড্ডা—আর মিথ্যার বেসাতিতে এদের সুস্থ মন সংসারকে অসুস্থ—অপরিচ্ছন্ন করে কর্ত্তব্য বিমুখ করে রেখেছে—সেই তারকনাথের দলেরা!

এমনি ভাবতে ভাবতে কিছুটা ক্রোধে, বেদনায় ও হতাশায় গিরিশচন্দ্র আস্তে, আস্তে উঠলেন—ধীর গতিতে চিন্তামগ্ন বিরাট বপুকে বইয়ে চললেন আপন বাড়ীতে।

বাড়ীতে এসেই চুপ করে বসে রইলেন সামনের খোলা বারান্দার এক কোণে।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে এল। গিরিশচন্দ্রও ভেতরে গেলেন।

আজ শরীরও কেমন যেন অসহযোগিতা করছে। হোমিওপ্যাথ ঔষধ একটু সেবন করলেন।

গিরিশচন্দ্র সেসময় নাস্তিক্যবোধের অনেক লেখা পড়তেন। সমাজ ও মানুষের অন্তর প্রবাহের স্বাভাবিক গতিকে—জোর করে করে কিছু মানুষ ভগবান - ভগবান বলে, রুদ্ধ করতে উঠে পড়ে লেগেছে। গিরিশচন্দ্র তা মোটেই সমর্থন করেন না।

গিরিশচন্দ্র দ্বিতীয়বার বিবাহের পর পরই ন্যাশন্যাল থিয়েটারের কাজ এবং নাটক রচনা ও অভিনয় ইত্যাদির মধ্য দিয়ে একটি সুপ্রতিষ্টার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে প্রবেশ করে গুরুত্ব লাভ করছেন কলকাতার সুধী - বুদ্ধিজীবীদের কাছে। নাম ডাকও সর্বত্র—তাই কোন দিক থেকে কোনভাবেই গিরিশচন্দ্রের মানসিকতায় এমন কিছুর প্রভাব কার্যকর হবে না যা তাকে তার আসন থেকে সরিয়ে নেওয়া যায়।

সুখের সংসার গিরিশচন্দ্রের। এমনি এক সময় তিনি দুরারোগ্য অসুখে হঠাৎ আক্রান্ত হলেন—অসুখটি বিসুচিকা। কাল বিলম্ব না করে চিকিৎসার ব্যবস্থা হল—কিন্তু রোগের লক্ষণ ও উপসর্গ দ্রুত বেড়ে গেল। বন্ধু, ডাক্তার— হোমিওপ্যাথি—এলোপ্যাথি—কবিরাজী—সবাই এল—পাড়ায় হৈ চৈ পরে গেল—গিরিশচন্দ্র অসুস্থ—প্রাণ সংশয়ে আক্রান্ত। এ যাত্রা বোধ হয় গিরিশচন্দ্রকে হারাতে হবে চিরদিনের জন্য। এখন শুধু অপেক্ষা সেই অশুভ ক্ষণের দুর্বিসহ মুহূর্তের জন্য। রাত্রিতে চিকিৎসকরা প্রায় সকলেই জবাব দিয়ে গেছেন—শুধু মৃত্যুর চূড়ান্ত ক্ষণের অপেক্ষা।

এমনি নানা প্রতিকূলতায় পাড়ার ছেলেরা—ভক্তরা রাতদিন জেগে থেকে সেবা শুশ্রূষা করার জন্য প্রতিক্ষা করছে— ভোরের অপেক্ষায়। কিন্তু অবিশ্বাস্য একটি অলৌকিক অদৃশ্য কাজ ঘটে গেল সেই রাত্রির নিস্তব্ধ নীরবতার অন্তর ভেদ করে—গিরিশচন্দ্র অবসিত— বর্হিজগতের কোন ঘটনা কোন শব্দ-দৃশ্য তার অনুভবের বাইরে—ঠিক সেই সময় নিঃসঙ্গ গভীরে তিনি দেখলেন, তাঁর স্বর্গগতা জননী ধীরে ধীরে কাছে এসে নিজের হাতে কিছু একটা গিরিশের মুখে দিয়ে অমৃত হাস্যে বললেন,

> .... এই লও মহাপ্রসাদ তোমার জন্য এনেছি—ভাল হয়ে যাবে সুস্থ হয়ে যাবে—ভয় নেই....।

তারপর, তারপর সবটাই অন্ধকার। গিরিশচন্দ্র ধীরে ধীরে সুস্থ হতে লাগলেন— হাত পা সমস্ত দেহে একটা আলোর সন্তরণ যেন মহা মৃত্যু সাগর পার করে তীরে উঠে এল—তাকিয়ে দেখলেন চারদিকে— কোথায় সেই মুখ, কোথায় সেই কণ্ঠ, সেই হাসি-হাসি অমৃত অনুরণন! সেই হাত, সেই স্নিগ্ধ তৃপ্তির সর্বক্লান্তিহরা পরশ— কোথায়! শুধু ঠোঁট দুটোতে সেই মহাপ্রসাদের রেশটুকু এখনও যেন লেগে রয়েছে—আর তা দেহের সর্বত্র রোমন্থন করে নবজীবনের স্পন্দনে আলো—আকাশ—বাতাসে মিশিয়ে দিচ্ছে। গিরিশচন্দ্র বিস্মিত, গিরিশচন্দ্র নতুন মানুষের রক্তে অভিষিক্ত, গিরিশচন্দ্রের অন্তর যেন নব-অভিসারের জাগরণে পুলকিত। কিছুই বুঝেও যেন মানসিক কোষ থেকে কোন বার্তা গ্রহণ করবে সঠিক স্তর বিভাজনে সমর্থ হলেন না। শুধু বিস্ময়াবিষ্ট, অহেতুক বিহ্বলতায় চোখ দুটো বার বার কি যেন খুঁজছে—আলতো চাউনির মায়াজড়ানো দৃষ্টিতে পলকহীন আকুতি।

বাড়ীর সবাই, স্ত্রী—ভাই আত্মীয় পরিজনরা যেন হারিয়ে পাওয়ার পরম পাওয়ায় আনন্দ-কান্নায় গিরিশচন্দ্রকে জড়িয়ে, জড়িয়ে পরম করুণাময়ের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। পাড়ায় যেন মহা ধূম লেগেছে—সবাই ছুটে আসছে গিরিশ আলয়ে— সোজা ঢুকে পড়ছে গিরিশচন্দ্রকে চাক্ষুষ দেখতে, পা জড়িয়ে প্রণাম করতে। গিরিশচন্দ্র আরো কেমন যেন ওলটপালট হয়ে বীতিমত নতুন মানুষ, নতুন চেতনায় আলো-আকাশের মধ্য পথ কেটে এগিয়ে যাবার সাহস পেলেন।

ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিদিনের নানা ঘটনায়— ভেতরে ও বাইরে— হৃদয় যখন হতাশায় ক্ষতবিক্ষত হতে চায় তখন তীর খোঁজার ব্যাকুলতা জাগে তীব্রভাবে।

আজ সেই গিরিশচন্দ্র যেন সেই রাত্রির মধ্য থেকে অত্যন্ত অল্প আয়াসে একটা সুখ আনন্দ অনুভব করলেন। তিনি এক জায়গায় লিখেছেন,

> .... বন্ধু বান্ধবহীন, চারিদিকে বিপদজাল, দৃঢ়পণ শত্রু সর্বনাশের চেষ্টা করছে এবং আমার কার্য তাদের সম্পূর্ণ সুযোগ প্রদান করছে। উপায়ান্তর না দেখে ভাবলাম, ঈশ্বর কি আছেন! তাঁকে ডাকলে কি উপায় হয়? মনে মনে প্রার্থনা করলাম যে, হে ঈশ্বর, যদি থাক এ অকূলে কূল দাও। গীতায় ভগবান বলেছেন, কেহ কেহ আর্ত হয়ে আমাকে ডাকে, তাকে ও আমি আশ্রয় দেই। দেখলাম গীতার কথা সম্পূর্ণ সত্য। সূর্যোদয়ে অন্ধকার যেরূপ দূর হয়, অচিরে আশা-সূর্য উদয় হয়ে হৃদয়ের অন্ধকার দূর করল, বিপদ সাগরে কূল পেলাম।

গিরিশচন্দ্র তা সত্বেও সন্দেহের বেড়াজাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে পারছেন না। নাস্তিক কালাপাহাড়ের উদ্দাম শক্তি তাঁর রক্তে শৈশব-যৌবনকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে অত্যন্ত ধাঁধাহীনভাবে। প্রতিদিনকার নানা ঘটনার বুননিতে সেই সংশয় জাল খুবই ঘনীভূত হয়েছে অনবরত। বিদ্যুৎচ্ছটার মত একটু আলো আর কতটা অবিশ্বাসের

অন্ধকারকে ভেদ করে আলোময় করতে পারে! তাই নব জীবন লাভ করার পর গিরিশচন্দ্র যখনই একান্তে থেকেছেন—ছুটে গেছেন পাড়ায় সেই সব বৃদ্ধ সনাতনপন্থী মানুষদের কাছে, অন্তর প্রসারের, আলোর ঝর্ণায় অভিষিক্ত হবার পথ—উপায় জানার জন্য। একান্ত অশান্ত অস্থির মত্ততায় ঘেরা মন যেন কোথাও শান্তি পাচ্ছে না—বার বার ছট্‌ফট্‌ করে একবার ঘরে—আবার ঘরের বাইরে— সেই একটি জিজ্ঞাসা—ভগবান কি? কোথায়! কেমন করে আলো আকাশের মত তাঁকে দেখতে পাব—মাখামাখি করব। প্রিয়জন—'প্রতিবেশী—বিদ্যান—বৃদ্ধ— সবার কাছ থেকে একটি মাত্র উত্তর শুনেছেন গিরিশচন্দ্র, 'গুরুর দরকার—তাঁর নির্দেশে, তাঁর দেখিয়ে দেওয়া পথে তোমার ইচ্ছা, তোমার প্রশ্নের উত্তর তুমি পাবে। চাই গুরু—চাই সদগুরু। তা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই—গুরুই হোল একমাত্র সেতু।'

সংসার জীবনে, ব্যক্তি জীবনে সকল সমস্যার, সংশয় ও জিজ্ঞাসার উত্তর সেই গুরুর সান্নিধ্যে—তাঁর নির্দেশিত পথে। গুরুর উপদেশই গিরিশচন্দ্রের একমাত্র অবলম্বন—তা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

আবার শুরু হল—গুরু কি? গুরু কে? গিরিশচন্দ্র আরো বিব্রত আরো চিন্তাহীন অন্ধকারের অতলে যেন হারিয়ে যেতে লাগলেন। এমনি বেশ কিছুদিন যায়—হঠাৎ হৃদয়টা চমক দিয়ে নাড়া দিল— সেই.....'বাবা তারকনাথ, তোমার চরণে সেবা লাগি'..... সেই গেরুয়াধারী বাঁকধারীদের মনে পড়ল গিরিশচন্দ্রের—'পার করে গা বাবা তারকনাথ' কলকাতার রাস্তায়, গঙ্গার ঘাটে ঘাটে অবিরাম ধ্বনিতে খালি গায়ে 'বাবা তারকনাথের জয়' ধ্বনি।

উঠে বসলেন গিরিশচন্দ্র। চোখ মুখ থেকে যেন সব ক্লান্তি দুর হল— কোথা থেকে যেন আলোর ঝর্ণা সব ক্লেদ ধুয়ে মুছে দিয়ে পথ দেখিয়ে দিল। তারকনাথের শরণ নিলেন গিরিশচন্দ্র। তিনিও হবিষ্যান্ন করে, গঙ্গাস্নান সেরে তারকনাথের অর্চনা করে খালি পায়ে হেঁটে তারকধাম তারকেশ্বরে গেলেন—ধর্ণা দিলেন, পূজো দিলেন।

শিবপূজা যথাবিহিতভাবে আপামর মানুষের সাথে একাকার হয়ে সমাপন করে কলকাতায় ফেরার পথে তারকনাথের মহিমায় শক্তি-স্পন্দনের আনন্দ সম্পদে গান করতে করতে কলকাতার পথে রওনা হলেন। ভোলামনে ভোলাসুরে গান আর গান—

ওরে হরে সন্ন্যাসী!

মিট্‌বে প্রেমের ক্ষুধা, সুধা পাবিরে রাশি রাশি।
দেখ্‌রে আমি প্রেমের তরে জটা ঘটা শিরোপরে
জাহ্নবী শিরে বিহরে প্রেম অভিলাষী।
যুগে যুগে করে ধ্যান, হয়নি প্রেমের তত্ত্বজ্ঞান
ভেবে পরম শক্তি, চাইনি মুক্তি আজও রে শ্মশানবাসী।

ক্ষীরোদ সাগর মন্থন করে সুরাসুর সুধা হরে
বিদিত আছে চরাচরে, আমি গরল-প্রয়াসী।
নিয়ে বাঘের ছাল আর ধুতরা ফুল দেখবো প্রেমের পাইকি কূল,
ন কুলে আছেরে কূল, প্রেম-নীরে সদাই ভাসি।
ভূত নাচে সব ফেরে সঙ্গে মত্ত সদা ভুতের রঙ্গে
হবি অভিভূত ভূতের ভঙ্গে, মহাকাল, আমি নাশি।
প্রাণতো কেবল চায় ভোগ হয়রে তার যোগাযোগ,
সুখ আশে কর্মভোগ, আমি সুখে উদাসী।
সুখ পাবিনে সুখের তরে, মিছে ঘুরিস ভ্রান্ত নরে,
দুঃখ ধরে থাকলে পরে, সুখ তোমার হবে দাসী।
দেখরে চেয়ে দারাসূত তোর মত সব অভিভূত
কেন মনকে নিয়ে থাতামুত, আপন গলায় দাও ফাঁসী।

একান্ত অসহায় বোধে সব ফেলে দিয়ে গিরিশচন্দ্র তারকনাথের শরণ নিলেন। প্রতিনিয়ত আকুল হয়ে প্রার্থনা করে বলতেন,

হে লোকনাথ, হে সর্বপাপ সংহারকর্তা তারকনাথ আমার ভেতরের সব 'না', সব সংশয় দূরীভূত কর—কৃপা কর—পথ দেখাও—অন্ধকার থেকে তোমার আলোয় আমাকে শুদ্ধ কর—উপযুক্ত করে তোল। আমায় গুরু দাও, গুরু কি জানি না—ওরা বলে গুরু ছাড়া হবে না—তারকনাথ, তারকনাথ—কৃপা করে, গুরু দর্শন দাও।

কেমন যেন একটা আলাদা মানসিকতায় গিরিশচন্দ্র চেয়ে চেয়ে থাকেন—কাকে যেন খুঁজে খুঁজে আবার অপলক চাউনিতে সর্বগ্রাসী ব্যাকুলতায় পরম করুণাময় 'তারকনাথ'কে আহ্বান করছেন। ঘরের ভেতরে কারু সাথে কথা নেই, স্ত্রী কাছে এসে বসতেই গিরিশচন্দ্র কেমন যেন আলগা হয়ে যেতেন। এক মন, এক ভাবনা— সেই 'তারকনাথ'। কালীঘাটে একা কাহাকেও না বলে চলে যেতেন—হাড়িকাঠের কাছে নিজের মাথা হেঁট করে প্রার্থনা করতে করতে নয়নজলে ধূয়ে দিতেন সেই স্থান। মা, মা, বলে কাঁদতেন। গিরিশচন্দ্র বিশ্বাস করলেন, এভাবে মাকে ডাকলে 'মা' অবশ্যই সাড়া দেবেন। এই বিশ্বাসবোধ গিরিশচন্দ্রের বড় সঞ্চয়—যা পরবর্তী সময়ে খুবই ঘনীভূত হয়ে আনন্দ-—সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন অনেকের।

সেই বাগবাজারের গিরিশচন্দ্র মাতৃভাবে সকল সময় বিভোর। বিশ্বাস ও একাগ্রতার পরিপূর্ণতা তাঁর চিত্তলোককে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করেছিল।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে পথিপাশ্বস্থ মন্দির—নানা লৌকিক দেবদেবীর মূর্তি দেখলেই গিরিশচন্দ্র দাঁড়িয়ে যেতেন— চোখ বুজে অন্তর যুক্ত করতেন মাতৃমূর্ত্তির পদতলে।

গঙ্গার ঘাটে, শ্মশানঘাটে মাঝে মাঝে একাকী আনমনে ঘুরে ঘুরে 'তারকনাথে'র

সন্ধান করতেন। আজ অন্তরে ভেতর বাইরের কোন পার্থক্য নেই গিরিশচন্দ্রের। জীবন মন্থন করে যে সুধার পরশ হৃদয় পদ্মের অনুভবে লাভ করেছেন—তা থেকে গিরিশচন্দ্রকে আজ কোন কিছুতেই সরিয়ে আনতে পারবে না। জীবন উত্তরণের আলো তিনি দেখেছেন—বিশ্বাস করছেন একদিন তার 'মা' তার 'তারকনাথ' তাকে দেখা দেবেনই। এই বিশ্বাস থেকেই গিরিশচন্দ্রের অন্তরে এক নতুন শক্তি এল—তা হল *'ইচ্ছাশক্তি'*। তিনি নিজেও জানেন না— কেমন করে কিভাবে তাঁরই মুখ নিঃসৃত কথা কেমন যেন সত্য হয়ে যেতে লাগল। এ এক অভাবনীয় অচিন্ত্যনীয় অনুভূতিতে গিরিশচন্দ্র বিভোর হলেন।

হোমিওপ্যাথি করার এবং তাতে বিশ্বস্ত চেতনার সাথে সেই নবলব্ধ 'ইচ্ছাশক্তি'তে গিরিশচন্দ্র বন্ধু-বান্ধব প্রিয়জনদের কঠিন কঠিন রোগ নিরাময় করে চলেছেন। উপকৃত ও হয়েছেন অনেকে। তাতে গিরিশচন্দ্রের কথাবার্তা হাবভাব চলাফেরা সবটাতেই আর সকলের বিশ্বাস তথা অনুরাগ বেড়ে যেতে লাগল।

পাড়ার 'পঞ্চানন্দ ঠাকুর', 'সিদ্ধেশ্বরী দেবী' এখন গিরিশচন্দ্রের নিত্য পূজা পায়। ভক্তি ও নিষ্ঠার নবরূপ পাড়া প্রতিবেশীদের হৃদয় জয় করে চলেছেন তিনি। হাঁটতে হাঁটতে মাঝে মাঝে 'মা'—'করুণাময়ী মা গো' বলতে বলতে গিরিশচন্দ্র হাটে বাজারে চলাফেরা করছেন। সবাই অবাক বিস্ময়াবিষ্ট নয়নে বারবার তাকিয়ে থাকে নাটুকে গিরিশচন্দ্রের ভাব পরিবর্তনে।

গিরিশচন্দ্রের অন্তরজুড়ে তখন 'মা' - 'মা' ডাক আর তার সর্বাংগ আচ্ছন্ন করে একটা ভাবসমৃদ্ধ অনুভবের মাধুর্যচ্ছটা। বন্ধুদের কাছে ডেকে এনে প্রায়ই বলতেন,

কষ্ট কিছুই নেই—কেবল মা'র শরণ নে। 'মা'কে ডাক, 'মা'কে ডাক। 'মা'র কাছে কিছুই চাইবি না যেন! শুধু 'মা' 'মা' বলে কেঁদে কেঁদে সন্তানের মত জড়িয়ে থাক— তবেই দেখবি 'মা' নিজে এসে তোর ক্লান্তি নাশ করবে— তোকে শান্ত স্নিগ্ধ প্রেমে নিয়ে যাবে।

অবিশ্বাসী নাস্তিক কালোপাহাড়ী মানসিকতার ষন্ডা গুন্ডা বাগবাজারের গিরিশচন্দ্রের জীবন ও জীবনযাত্রার পরিবর্তনে একটা বিশেষ ঘটনা—পাড়ায়—বন্ধুবান্ধবদের কাছে। অনবরত 'মা' 'মা'; 'কালী' 'করালবদনা' উচ্চারণ করতে করতে গিরিশচন্দ্র কখনো হাসতে হাসতে চলেছেন—আবার 'কখনো বা অভিমানে অন্তর বেদনায় 'মা' বেটিকে অন্তর দিয়ে চেচিয়ে ডেকে বলতেন 'শুধু তোমায় আমি ডাকব—তোমার কাছে কিছু চাইব না মা,—শুধু ডাকব—তোমায় ডাকব—বলব, আমায় তোমার কোলে বসিয়ে দাও—মা গো, আর কিছু চাই না।'

....গিরিশচন্দ্র অভিনয়ান্তে একদিন নির্জনে অন্ধকারে বসে শ্রীশ্রী জগন্মাতাকে সকাতরে ডাকছেন, এমন সময় তাঁর মনে হল, ঘর যেন দিব্য আবেশে পূর্ণ

> হচ্ছে এবং দূর হতে কে যেন তাঁকে সম্বোধন করে বলছেন, গিরিশ তুই আমাকে দেখতে চেয়েছিস্, আমি এসেছি, দ্যাখ। ইহ জীবনের যত আশা ভরসা, আনন্দ উল্লাস—সর্বস্ব অন্তর হতে পরিত্যাগ করে দ্যাখ, কারণ, নিজে শব না হলে কেহ কখন শবশিবাকে দেখতে পায় না এবং আমার দর্শনলাভের পর সংসারে আবার কেহ কখন ফিরে আসে না। অতএব শব হয়ে আমাকে দেখতে প্রস্তুত হ, মুহূর্তমাত্র পরেই আমি তোর সম্মুখে আসছি।

গিরিশচন্দ্র বললেন,

> ঐরূপ শুনিবামাত্র প্রাণভয়ে হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠল এবং এখনি মরলে আমার পুত্রকন্যার এবং আমার মুখাপেক্ষী আমার দরিদ্র বন্ধুবর্গের কি দশা হবে, সেসকল কথা যুগবৎ মনে উদয় হল। তখন চক্ষু মুদ্রিত করে বারংবার বলতে লাগলাম, 'না, ঐরূপে তোমাকে এখন দেখতে পারব না। ' তখন পূর্বাপেক্ষা স্পষ্ট শুনতে পেলাম, 'আচ্ছা, না দেখবি ত আমার নিকট হতে বর গ্রহণ কর, আমার আগমন কখনও ব্যর্থ হয় না, ইহ সংসারে লভ্য যা কিছু তোর ইচ্ছা হয়, তাই চেয়ে নে।'
>
> তখন রূপরসাদিবিশিষ্ট ভোগ্য পদার্থের যে কোনটি চেয়ে লব বলে কল্পনা করতে লাগলাম, জগতে বিবেকবুদ্ধি, তদুপভোগেরই ভীষণ পরিণাম ছবি জলন্তবর্ণে অঙ্কিত করে পূর্ণ হতেই মৃত্যুভয়ে এস্ত হৃদয়ের সম্মুখে ধারণ করতে লাগল। তখন সভয়ে বলে উঠলাম, 'আমি বর লব না'। ধীরে গম্ভীর স্বরে পুনরায় উত্তর এল, —আমার আগমন কখন ও ব্যর্থ হবে না, যদি বরও না লবে ত আমায় ডেকে আনলি কেন—আমার অভিসম্পাত গ্রহণ কর, আমার এ উদ্যত খড়গ তোর কিসের উপর পতিত করে বিনষ্ট করব, তা বল। শুনে, মনে ভীষণ ভয় হ'ল, কিন্তু ভয় হলেও বিবেকবুদ্ধি বলে উঠল— দেবতাকে মন্দ দ্রব্য দিতে নেই! তখন ভেবে চিন্তে বললাম, মা, সুনট বলে আমার যে সুনাম আছে তার উপর তোমার খড়গ পতিত হোক। উত্তর এল 'তথাস্তু'। পরে আর কিছু দেখলাম না, শুনতে পেলাম না। শাস্ত্রে যে বলতে শুনেছি, দেবতার ক্রোধও বরের তুল্য। কারণ এ দর্শনের পর হতেই সত্যাসত্যই আমার নটত্বের যশকে আমার সুলেখক বলে খ্যাতি ক্রমে সম্পূর্ণরূপে প্রছন্ন করে ফেলেছিল।

উদ্‌বোধন : ১৫ষ বর্ষ - ৪র্থ সংখ্যা : বৈশাখ ১৩২০.

গিরিশচন্দ্রের জীবনরসে নানা যে কোন ঘটনায় 'মা - মা' ডাক প্রায়ই অনেকেই শুনেছেন। এমন কি রঙ্গমঞ্চে ও কথার ফাঁকে ফাঁকে এই 'মা মা' ডাক এবং অন্যান্য অভিনেতা-নেত্রীদের মধ্যেও 'মা মা' ডাক শোনা যেত অত্যন্ত আন্তরিক শ্রদ্ধায় অন্তর পূজায়।

মাঝে মাঝে আসনে বসে অসুরনাশিনী শ্যামামায়ের স্তোত্রপাঠ করতেন গভীর মনোযোগ দিয়ে—তখন তাঁর সমস্ত দেহের রূপ ও স্পন্দন একটা অবর্ননীয় দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত— সেই কণ্ঠস্বরে স্তোত্রের স্বরক্ষেপে উত্থান ও তার মিল যেন সমস্ত পরিবেশকে ধূপ-দীপে মধুর করে তুলত। একটা প্রশান্ত অনুভূতির আন্তরিক উল্লাসে গিরিশচন্দ্র যেন অন্য মানুষ হয়ে যেতেন।

।। সতের।।

অভিনয় ও নাটক রচনার পাশাপাশি জীবন-মন্থন-জাত অনুভবের বিস্তারে গিরিশচন্দ্র অত্যন্ত তৎপর। তাই নানা প্রতিকুলতার মধ্যেও তিনি তাঁর লক্ষ্য থেকে সরে যাননি।

প্রতাপচাঁদ জঁহুরীর অনুরোধে গিরিশচন্দ্র পার্কার কোম্পানীর চাকুরী ছেড়ে ন্যাশন্যাল থিয়েটারে মাসিক বেতনে দু'বৎসর কাজ করেছেন। প্রতাপচাঁদ যেভাবে তার থিয়েটার শুরু করার সময় যা যা বলেছিলেন—পরবর্তী সময়ে তিনি গিরিশচন্দ্রের ও অন্যান্য অভিনেতা ও কর্মীদের প্রতি তা রক্ষা করেন নি। ব্যবসায়িক দিক থেকে অর্থ পেয়েছেন—সুনাম পেয়েছেন কিন্তু কথা রাখেননি। তাই গিরিশচন্দ্র দু'বৎসরের সময় পর্যন্ত যে বাধ্যবাধকতা ছিল তা পূরণ করেই ন্যাশন্যাল থিয়েটার ত্যাগ করেন। গিরিশচন্দ্রের সাথে সাথে অন্যান্য অভিনেতারাও অন্যত্র চলে গেলেন। গিরিশচন্দ্র বাঙালি-অভিনেতা-ন্যাশন্যালে যা অভিনীত হোত তা সবটাই বাংলাভাষায় বাঙলার জীবন সমাজ ও সংস্কৃতির পটভূমিকায়। শেষের দিকে প্রতাপচাঁদের তা পছন্দ হচ্ছিল না। যেভাবে নাটক ও নাটকের অভিনয়ে মুগ্ধ, দর্শক-সমাজের আগ্রহ বেড়ে যাচ্ছিল তাকে অন্যভাবে আরও ব্যাপকভাবে থিয়েটারের মধ্য দিয়ে প্রসারিত করার নতুন নতুন পরিকল্পনাও গিরিশচন্দ্র প্রতাপবাবুকে দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রতাপবাবুর বাঙালি বিরোধিতা প্রছন্নভাবে নানা কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল—তাই গিরিশচন্দ্র, যাকে প্রথম যেভাবে, যে আন্তরিকায় ন্যাশন্যাল থিয়েটারে এনেছিলেন, পরিকল্পনার প্রতি এতটুকু ইতিবাচক ভাবনার প্রকাশ করলেন না। বিষয়টি পশ্চাৎপটে কি আছে গিরিশচন্দ্র বুঝেছিলেন—তাই দু'বৎসরের সময় অতিক্রম করার পর তিনি আর রইলেন না।

বাঙলা নাটকের রমরমায় গিরিশচন্দ্রের উপস্থিতি এবং তাতে ব্যবসা হচ্ছে এ চিন্তায় তৎকালের বেশ কিছু অবাঙালী হিন্দুস্থানী—বিশেষ করে এদেশীয় মারোয়াড়ী যুবকদের মধ্যে উৎসাহ জেগেছিল। ন্যাশন্যাল থিয়েটারের সুনাম এবং অর্থলাভ দুইই তখন খুবই সকলের কাছে স্বীকৃত। বহু মারোয়াড়ী ছেলেরা বাংলা নাটক দেখতে আসতেন ন্যাশন্যালে। একদিকে আনন্দ বিতরণের মহাভোজ অপরদিকে তাতে অর্থাগম সুপ্রশস্ত।

কলকাতার খুব নামজাদা হোরমিলার কোম্পানীর একজন দালাল শ্রীগুন্মুখ রায় বাঙালি সহকর্মীদের সঙ্গে প্রায়ই ন্যাশন্যাল থিয়েটারে আসতেন—নাটক দেখতেন, আনন্দ পেতেন। তবে মনে অনেকদিনের আশা—ন্যাশন্যাল থিয়েটারের মত একটি নাট্যমঞ্চের প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজেই এর সব দায়িত্ব বহন করেন। একদিন সময় এসে গেল। গুন্মুখ রায় বন্ধু প্রসিদ্ধ বাগবাজারের কার্তিকচন্দ্র মিত্রকে তার মনের কথা প্রকাশ করলেন। কার্তিকবাবু গুন্মুখকে উৎসাহিত করেন। গুন্মুখ নতুন ভাবে রঙ্গমঞ্চ করবেন—কিন্তু তার জন্য জমি চাই। কার্তিকবাবু নিজে থেকেই বললেন, তার ৬৮নং বিডন স্ট্রীটের জমি থেকে এক খণ্ড জমি লিজ নিয়ে কাজ শুরু করা যেতে পারে। গুন্মুখ রায় পথ পেয়ে গেলেন—কার্তিকচন্দ্র মিত্রের ৬৮নং বিডন স্ট্রীটের এক খণ্ড জমি লিজ নিয়ে পাকাভাবে থিয়েটার তৈরী করলেন। ন্যাশন্যাল থিয়েটার ছিল কাঠের তৈরী আর এ থিয়েটার পুরোটাই পাকা ইট দিয়ে তৈরী।

নতুন পাকা নাট্যমঞ্চ তৈরী হল বিডনস্ট্রীটে—**নাম রাখা হল 'স্টার থিয়েটার'**। গুন্মুখ ছুটলেন গিরিশচন্দ্রের কাছে। গিরিশচন্দ্র গুন্মুখকে ফেরালেন না। রঙ্গমঞ্চ তৈরীর সময় কয়েকবার নকসা নিয়ে গুন্মুখ গিরিশচন্দ্রের কাছে গিয়েছিলেন—পরামর্শ নিয়েছেন এবং সেভাবে 'স্টার থিয়েটার' তৈরী করেছেন।

গিরিশচন্দ্র সম্পূর্ণ হাস্যরসবর্জিত **একটি পৌরাণিক নাটক 'দক্ষযজ্ঞ' দিয়ে স্টার থিয়েটারের সূচনা হল**। সর্বস্তরের দর্শকদের প্রসন্ন সহযোগিতায় নাটকটি অভিনীত হয়ে সুনাম লাভ করল। **'দক্ষ' এর ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রের অভিনয়** নতুন করে রঙ্গজগতের নাট্যমোদীদের অন্তর চেতনাকে নাড়া দিয়েছিল ন্যায় অন্যায় বোধের বিচার পদ্ধতি। সাহিত্য—পিপাসু অনেক সুধীজনের কাছে 'দক্ষযজ্ঞ' নাটকের গিরিশচন্দ্রের ভূমিকায় খুবই আর্কষণীয় হয়েছিল। দক্ষের জীবন একটা গভীর সত্যনিষ্ঠ গাম্ভীর্যের পরিপূর্ণতা অভিনয়ের আংঙ্গিকে গিরিশচন্দ্র যেভাবে রূপদান করেছেন তা এককথায় সেদিন ছিল তা অসাধারণ। বজ্রদীপ্ত কাঠিন্যের প্রবলতা গভীরভাবে অন্তরকে আলোড়িত করেছিল। এই নাটকে 'দশ মহাবিদ্যার' আগমন ও প্রস্থান পরিকল্পনায় দর্শকদের মধ্যে আনন্দ উৎসাহ জাগিয়েছিল অত্যন্ত গভীর মাত্রায়।

দক্ষযজ্ঞ

'দক্ষযজ্ঞ' নাটক রচনার সময়ে গিরিশচন্দ্রের মানসিক অবস্থায় 'মা' এই নাম ও ধ্যান গভীরভাবে শক্তি ও প্রেরণা জুগিয়েছিল। কালীঘাটের কালীমন্দিরে সেসময় প্রায় প্রতিদিন একান্তভাবে নিজস্ব অভিরুচির সময় বেছে নিয়ে তিনি সেখানে যেতেন এমনভাবে, যাতে কেউ তাকে বাধা দেবার সুযোগ পেত না। পাণ্ডাদের কাছ থেকে নিজেকে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন করে 'দক্ষযজ্ঞের' বিভিন্ন অংশে অভিনয় করতেন—যাতে প্রসন্নচিত্তে 'মা'র আশীর্বাদ সন্তানের উপর বর্ষিত হয়। কালীঘাটের 'মা'র সম্মুখে অভিনয় করে পরম তৃপ্তিতে অন্তর পূর্ণ করে আনন্দ মেজাজে সরাসরি বাড়ী এসে

আবার 'মা', 'মা' বলে ধ্যান করতেন।

এদিকে 'দক্ষযজ্ঞের' সাফল্য গিরিশচন্দ্রকে অনুপ্রাণিত করল—দর্শকদের রুচি-অনুগত আর একটি নাটক *'ধ্রুবচরিত্র'* রচনায়।

বাংলার কথকতা একটা শিল্প। বহুদিন থেকে পাড়ায় কিছু কিছু ধর্মপ্রাণ মানুষ পৌরাণিক কাহিনী শোনাতে মন্দিরে, কখনও বা নিবিড় ছায়াস্নিগ্ধ বট গাছের নিচে বেদী তৈরী করে আসরের ব্যবস্থা করে 'কথকতা' করতেন। পাড়ার ধর্মপ্রাণ মানুষেরা বিশেষ করে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা সেখানে উপস্থিত হতেন এবং কথকতার মুখ থেকে কাহিনীর আলোকে বিভিন্ন চরিত্রের কথোপকথনের মাধ্যমে সম্মুখে চলাফেলার স্বপ্নালোকে বিচরণ করে আনন্দ লাভ করতেন। একজন মাত্র কথক, কিন্তু তার কণ্ঠের মাধ্যমে বিভিন্ন ঘটনার পরিচ্ছন্ন বিস্তারে বিভিন্ন চরিত্রের অভিনয়— সে এক অনিন্দ্য সুন্দর ভাবানু প্রেরণায় মাধুর্যভরে দিত আসরকে। এমনি একটি 'কথকতা'র আসরে গিরিশচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন আন্তরিক অবসর কাটাতে। কথকের ভাব বিস্তার ও বিভিন্ন চরিত্রের স্ব স্ব চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষমতা দেখে খুবই বিস্মিত হলেন এবং সে কাজটি নাটকের মধ্য দিয়ে আরো আরো অধিক সংখ্যক দর্শককূলকে প্রভাবিত করার মানসিকতা তার মনে জেগে গেল।

কাহিনীর ঘটনা ও চরিত্রগুলি যুক্ত করে একজন মানুষের (কথকের) কাছ থেকে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের কথা ও ভাবের অনুরণন সৃষ্টি করা বিভিন্ন রসের পরিবেশন— খুবই কঠিন। গিরিশচন্দ্র সেই 'কথকতা'র পুরো ব্যাপারটি অনুধাবন করে নিজেই কয়েকজন বন্ধুদের ডেকে এনে পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে 'ধ্রুব'কে বেছে নিয়ে বিভিন্ন রসে, বিভিন্ন কথায় ও ভংগীমায় বিভিন্ন চরিত্র সৃষ্টি করে শোনালেন। শ্রোতৃবৃন্দ খুবই আনন্দ পেলেন এবং গিরিশচন্দ্রকে সাধুবাদ দিলেন।

ধ্রুব চরিত্র

এরপরই গিরিশচন্দ্রের মনে নতুন নাটক *'ধ্রুব চরিত্র'* নাটকাকারে রচনা করার পরিকল্পনা করেন। নাটকটি রচনার পর তার অভিনয় করার দিকে গিরিশচন্দ্র গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। 'স্টার থিয়েটারে' গিরিশচন্দ্রের এটি দ্বিতীয় নাটক। ভক্তিরসে সিক্ত পুরাণের কাহিনীকে অবলম্বন করে গিরিশচন্দ্র এই নাটক দর্শকদের হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে দিয়েছিলেন আপন প্রতিভার গুণে। ধ্রুব চরিত্রের (ভূষণ কুমারী) অভিনয় এবং গান 'ফুটিলে ফুল ধ্রুব তোলে না, ফুলে পূজা হবে তা তো [illegible] না' প্রায় পাড়ায় পাড়ায় কাজে অকাজে মুখে মুখে লোকেদের মধ্যে প্রায়ই শোনা যেত। অমৃতলাল বসুর 'বিদুষক' চরিত্রটির অভিনয়ে দর্শকসমাজ নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের প্রভূত ভাব সমৃদ্ধ চেতনার স্পর্শে আলোকিত হয়েছিলেন।

'স্টার থিয়েটার' পরবর্তী তৃতীয় নাটক গিরিশচন্দ্রের *'নলদময়ন্তী'*। এই নাটকের কাহিনীর সঙ্গে রস-সমৃদ্ধ গান ও নাচ একটি বিশেষ মাত্রা দান করেছিল। দর্শক সমাজে

দীর্ঘদিন নাটকের গান-বিশেষ করে *শ্রীমতী বিনোদিনীর 'দময়ন্তী'র* জীবন্ত অভিনয়

নলদময়ন্তী

গভীরভাবে প্রসারিত হয়েছিল। এই নাটকের অভিনয়ের কলাকৌশল তথা পরিচালনার সুউচ্চগ্রামে গিরিশচন্দ্রকে তাঁর প্রতিভার ভাস্বরতা দান করেছিল।

'স্টার থিয়েটার' খুবই অল্পসময়ের মধ্যে কলকাতায় নাট্যামোদী দর্শকদের হৃদয় জয় করে নিয়েছিল। অর্থাগমও বেশ ভালভাবেই আসছিল। কিন্তু শ্রীগুন্মুখ রায় অবাঙ্গালী—তাঁর পারিবারিক ও সামাজিক রীতিনীতিতে নাটক ব্যবসা—তথা নাট্যমঞ্চে মেয়েদের নিয়ে অভিনয় করায় ব্যবসাকে সায় দিচ্ছিল না পরিবারের সংরক্ষণ মানসিকতা। তাই শ্রীগুন্মুখ পদে পদে পারিবারিক সংরক্ষণতায় শিকার হতেন। প্রথম প্রথম শ্রীগুন্মুখ তা তেমন করে ভাবতেন না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে নাট্যালয় থেকে অর্থাগম এবং তাতে তার পারিবারিক সামাজিক বাধ্যবাধকতায় একটা বিষন্নতার অপরিচ্ছন্নতা তাকে গ্রাস করল। শ্রীগুন্মুখ তাতে অসুস্থ হলেন এবং পারিবারিক—সামাজিক বাধ্যতায় নাট্যমঞ্চ 'স্টার থিয়েটার' ছেড়ে দিতে মনস্থ করলেন। তিনি এ বিষয়ে সিধান্ত নেবার জন্য গিরিশচন্দ্রকে একদিন তার বাড়ীতে ডেকে পাঠালেন। গিরিশচন্দ্র তখন 'স্টার থিয়েটারে'—শ্রীগুন্মুখ নিজে অসুস্থ শরীরে গিরিশচন্দ্রের সাথে দেখা করে বললেন, ...আমি অনেক টাকা দিয়ে এই 'স্টার থিয়েটার' বানিয়েছি—নানা কারণে আমি তা থেকে সরে যেতে চাইছি। আপনি এই থিয়েটারের প্রাণ এবং মূল পরিচালক। আপনারা আমাকে কিছু টাকা (এগার হাজার) দিয়ে দিন, আমি আপনাদের 'স্টার থিয়েটার' এর সমস্ত শর্ত ও মালিকানা ছেড়ে দেব।

গিরিশচন্দ্র শ্রীগুন্মুখের কথা শুনলেন—বাংলা নাট্যশালা ও তার সাথে যুক্ত শিল্পীদের ও অন্যান্য নাট্য সহকর্মীদের কথা চিন্তা করে গিরিশচন্দ্র চোখ বুজে রইলেন কিছুক্ষণ—তারপর 'মা' - 'মা' বলে কালীর ধ্যান করে সোজা দাঁড়িয়ে বললেন,—ঠিক আছে গুন্মুখ, আমি সব কথা শুনলাম, 'স্টার থিয়েটার' আমরাই নেব—আপনাকেও এগার হাজার টাকা দেব এবং স্টার থিয়েটার আমরা নেব।... গিরিশচন্দ্র 'স্টার থিয়েটারের' তার সহকর্মী অভিনেতাদের কাছে গুন্মুখের কথা সব বললেন। তারপর পায়চারী করতে করতে বললেন, তোমাদের মধ্যে যে এগার হাজার টাকা দেবে তাকেই 'স্টার থিয়েটার' এর মালিকানা পাবে। প্রসিদ্ধ অভিনেতা ও গিরিশচন্দ্রের সুহৃদ অমৃতলাল মিত্র উৎসাহিত হয়ে বললেন, আমরা টাকা সংগ্রহ করছি। 'স্টার থিয়েটার' আমরাই নিয়ে নেব।

এরপর *অমৃতলাল মিত্র, হরিপ্রসাদ বসু—দাসুচরণ নিয়োগী* মিলিত হয়ে মোট টাকার মধ্যে কিছু টাকা সংগ্রহ করলেন—এবং বাকী (এগার হাজার টাকার) টাকা জোঁড়াসাকোর কৃষ্ণধন দত্ত মশায়ের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে মোট এগার হাজার

টাকা গিরিশচন্দ্রের হাতে দিলেন। গিরিশচন্দ্র চোখ বন্ধ করে আবার সেই 'মা' - 'মা' এর ধ্যান করতে করতে স্মিতহাস্যে ঘর থেকে বেরিয়ে অসুস্থ শ্রীগুন্মুখ রায়কে এগার হাজার টাকা দিয়ে এলেন। শ্রীগুন্মুখ রায় বেদনার্ত হৃদয় গিরিশচন্দ্রকে কাছে টেনে শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে উদাস নয়নে চেয়ে হাত বাড়িয়ে টাকা নিলেন এবং বললেন, 'স্টার থিয়েটার' এর সমস্ত শর্ত আপনার নামে রেজিস্ট্রী করে দিচ্ছি।

গিরিশচন্দ্র দ্রুত বললেন, না, না, আমার নামে নয়—যারা এই টাকাটা এনেছে, তাদের নামে এই রেজিস্ট্রী হবে। আমি আপনাকে দু'একদিনের মধ্যে নামগুলি দেব।

শ্রীগুন্মুখ রায় বললেন,—আপনার উপর আমার দেবতার মত বিশ্বাস শ্রদ্ধা রইল। আপনি যা যা যেভাবে বলবেন আমি সেইমত ব্যবস্থা করব—বেদনাসিক্ত আর্দ্রকণ্ঠে কথাগুলি বললেন।

'স্টার থিয়েটার' এর ব্যাপারে অমৃতলাল মিত্র, হরিপ্রসাদ বসু, দাসুচরণ নিয়োগী ও অমৃতলাল বসু এই চারজনকে গিরিশচন্দ্র 'স্টার থিয়েটারের' স্বত্ত্বাধিকারী স্থির করলেন। তিনি স্বত্ত্বাধিকারীদের মধ্যে রইলেন না।

যথাসময়ে শ্রীগুন্মুখ রায় গিরিশচন্দ্র প্রদত্ত চার জনের নামে 'স্টার থিয়েটার' এর সমস্ত দায় দায়িত্ব পুরো মালিকানা রেজিস্ট্রী করে দিলেন।

সেদিন গিরিশচন্দ্র গঙ্গার ঘাটে গেলেন—তারপর একাকী কালীঘাটে কালীমন্দিরে গিয়ে 'মা'র ধ্যান করলেন। সমস্ত মনপ্রাণ একটা অনির্বচনীয় মোহমুক্তির আনন্দ আলোকে ভরে গেল।

গিরিশচন্দ্র তার ছোটভাই অতুলকৃষ্ণ ঘোষের কাছে সত্যবদ্ধ হয়ে একদিন বলেছিলেন, ... যতদিন আমি থিয়েটারে যুক্ত থাকব, কোনভাবেই কোন পরিস্থিতিতেই থিয়েটারের মালিক হব না।

আজ সেই সত্য রক্ষা করলেন গিরিশচন্দ্র।

।। আঠার ।।

নবপর্যায়ে গিরিশচন্দ্র সুপারিশকৃত চারজন স্বত্ত্বাধিকারীদের **মালিকানায় 'স্টার থিয়েটার'**। গিরিশচন্দ্র নিজে নাটক রচনা তার অভিনয় শিক্ষা ও অভিনয় অধ্যক্ষতা স্বাধীনভাবে করছেন। অভিনেতাদের চরিত্র চিত্রণে গভীরভাবে অত্যন্ত সময় দিয়ে অভিনয় শিক্ষা দিচ্ছেন—তাতে গিরিশচন্দ্রের অন্তর-শক্তির প্রকাশ ব্যাপকভাবে সেসময় পরিলক্ষিত হয়েছিল।

গড়ের মাঠে তখন International Exhibition চলছিল। কলকাতায় এর আগে এত বড় Exhibition হয়নি। ভারতের নানাস্থান থেকে বড় বড় অভিজাত সম্প্রদায়ের

মানুষেরা কলকাতায় এসেছে— চৌরঙ্গীর উপর তাদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য যাদুঘর থেকে গড়ের মাঠ পর্যন্ত্য একটি বড় সেতু তৈরী হয়েছিল। বিরাট জন সমাবেশ থেকে বহু লোক 'স্টার থিয়েটারে' নিয়মিত নাটক *'নলদময়ন্তী'* দেখবার জন্য আসত। তাতে প্রচুর অর্থ আয় হয়েছিল 'স্টার থিয়েটারের'। গিরিশচন্দ্রের পরামর্শমত স্বত্ত্বাধিকারীগণ যে অর্থ ঋণ করেছিলেন কৃষ্ণধনবাবুর কাছ থেকে, তা পুরোটা পরিশোধ করা হল। 'স্টার থিয়েটার' ঋণমুক্ত হয়ে গেল।

'নলদময়ন্তী'র সার্থক অভিনয় ও অর্থ আগমনহেতু অভিনেতাদের এবং কর্মীদের মধ্যে প্রেরণা ও উৎসাহ বেড়ে গেল। গিরিশচন্দ্রও তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে মুকুন্দরাম

কমলে কামিনী

চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য থেকে কাহিনী নিয়ে *'কমলে কামিনী'* নাটক রচনা করেন এবং 'স্টারে' অভিনয় করান। কাহিনীর অন্তর্নিহিত আবেদন বাঙালির হৃদয়কে গভীরভাবে সহজভাবে প্রভাবিত করল। তাই নাটকটি সফল অভিনয়ের মাধ্যমে ভালভাবে দর্শক সমাগমে চলছিল। নাটকের মধ্যে কালীদহে 'কমলে কামিনী'র দৃশ্যটি দর্শকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষনীয় হয়েছিল। নাটকে সমুদ্রের বর্ণনা নিঁখুতভাবে করা হয়েছিল—অথচ গিরিশচন্দ্র সমুদ্র দর্শন ইতোপূর্বে করেন নি। ঐ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি স্বাভাবিকভাবে বলেন,

> .... আমি এ পর্যন্ত সাগর দেখিনি, তবে নানা বই-এ সমুদ্রের বর্ণনা পড়েছি, লোকের মুখে শুনেছি— সেইভাবেই লিখেছি।

এইবার 'বৃষকেতু' ও 'হীরের কুল', 'শ্রীবৎস চিন্তা' নাটকগুলি অভিনীত হয় 'স্টার থিয়েটারে'।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ *'বৃষকেতু'* অভিনয় দর্শন করিবেন। বিডন স্ট্রীটের যেখানে পরে

বৃষাকেতু

'মনোমোহন থিয়েটার' হয়, পূর্বে সেই মঞ্চে— 'স্টার থিয়েটার' অভিনয় হত। থিয়েটারে এসে বক্সে দক্ষিণাস্য হইয়া বসিলেন। ....

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ.....নরেন্দ্র এসেছে?

> ...অভিনয় হইতেছে। কর্ণ ও পদ্মাবতী করাত দুই দিকে দুইজন ধরিয়া বৃষকেতুকে বলিদান করিলেন। পদ্মাবতী কাঁদিতে কাঁদিতে মাংস বন্টন করিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অতিথি আনন্দ করিতে করিতে কর্ণকে বলিলেন, এইবার এস, আমরা একসঙ্গে বসিয়া রান্না মাংস খাই। অভিনয়ে কর্ণ বলিতেছেন, তা আমি পারিব না, পুত্রের মাংস খেতে পারিব না। ...

অভিনয় সমাপ্ত হইল ঠাকুর রঙ্গমঞ্চের বিশ্রামঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গিরিশ, নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তরা বসে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি)—এ কি তোমার থিয়েটার না তোমাদের?

গিরিশ—আজ্ঞে আমাদের।

রামকৃষ্ণ—আমাদের কথাটাই ভাল, আমার বলা ভাল নয়। কেউ কেউ বলে আমি নিজেই এসেছি, এ সব হীনবুদ্ধি অহংকারে লোকে বলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ৫ খণ্ড।

'শ্রীবৎসচিন্তা' নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের পৌরাণিকত্ব আছে কিন্তু 'বাতুল' চরিত্রটি সম্পূর্ণ গিরিশচন্দ্রের নিজস্ব সৃষ্টি। মৃত্যুকে গ্রাহ্য না করে, দুঃখকে গ্রহণ করে এবং নানাভাবে ঠাট্টা করা ইত্যাদি কতগুলি গুণে চরিত্রটির সৃষ্টি।

।। উনিশ ।।

গিরিশচন্দ্রের মানসিক অবস্থা তখন জাতি জাগরণের রসদ অন্বেষণ করা এবং তা নাটকের মধ্যদিয়ে সুন্দরভাবে সুখকর খাদ্য করে পরিবেশন করা। বাঙালির মানসিকতার উপর কোন কথা, কোন কাহিনী ও তার রস স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হবে—হয় তা গিরিশচন্দ্র ভালভাবে নিজের জীবন পর্যালোচনায় অনুভব করেছিলেন। বড় বড় উচ্চ আদর্শের জটিল ব্যাখ্যায় এতটুক মনকে জড়িত না করে গিরিশচন্দ্র তাই সহজ ও সরল মানুষের চিত্তলোকের দর্পনে যা যা দেখেছেন তাকেই নাটকের মাধ্যমে এ যাবৎকাল প্রকাশ করেছেন এবং অভিনয়ের মাধ্যমে তা পরিচ্ছন্ন পরিবেশে রসসমৃদ্ধ করেছেন।

বাঙালির মনে 'কানু বিনা গীত নাই'। তাই কৃষ্ণ রাধা এবং তারই নবীন প্রবাহিত সত্তার গভীর আলোড়নকারী মানব ধর্মের শ্রেষ্ঠ মানুষের চরিত্র চিত্রনে গিরিশচন্দ্র এবার মন দিলেন। নিমাই তথা চৈতন্যকে কেন্দ্র করে *'চৈতন্যলীলা'* **রচনা করলেন এবং 'স্টার থিয়েটারে' প্রথম অভিনয় করলেন ১৮৮৪-২রা আগস্ট তারিখে।**

> "বখাটে নট ও অখাঁটি নটীবৃন্দ দ্বারা দেশে ধর্ম প্রচার হল। ছিঃ ছিঃ—এ কথা মনে আসলেও স্বীকার করতে নেই, তাতে মহাপাপ আছে। কিন্তু কে জানে কেমন, তারিখে এটুকু গোলমাল করে, মনে হয় যেন এই নগণ্য সম্প্রদায়কে জঘন্য বেদীতে শ্রীকৃষ্ণ মহিমা কীর্ত্তন করতে শুনিয়েই ধর্ম-বিপ্লবকারী বীরগণ অন্তরে ঈষৎ কম্পিত হলেন আর ধর্মপ্রাণ হিন্দু জাগরিত হয়ে ব্রজরাজ ও নবদ্বীপচন্দ্রের বিশ্বমোহন প্রেম প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে সংকীর্তন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল, গীতা ও চৈতন্য চরিত্রের বিবিধ সংস্করণ দেশ ছেয়ে পড়ল। বিলাত ফেরৎ বাঙালী সন্তানও লজ্জিত না হয়ে সগর্বে আপনাকে হিন্দু বলে পরিচয় দিতে আরম্ভ করল।"

চৈতন্যলীলা—অমৃতলাল বসু

চৈতন্য এর ভূমিকায় শ্রীমতি বিনোদিনী আর নিতাইয়ের ভূমিকায় শ্রীমতি বনবিহারিনী দেবী।

সম্পূর্ণ নাটকটিতে সংলাপের মধ্য থেকে ভাব-রস নিঃসৃত হয়ে দর্শককূলকে প্লাবিত, মোহিত এবং মুগ্ধ করে তুলেছিল। অভিনয়ে চরিত্রগুলি প্রাণবন্ত হয়ে অভিভূত করে দিয়েছিল দর্শকদের। চৈতন্যের ভূমিকায় শ্রীমতি বিনোদিনী অদ্বিতীয়া।

গিরিশচন্দ্র এই নাটকে সর্বস্তরের মানুষকে একই মঞ্চে এনেছিলেন প্রেমভক্তি রসের পরিবেশনে।

নবদ্বীপের পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্নকে 'চৈতন্যলীলা' নাটকটি দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানান হয়। তিনি তাঁর পুত্র মথুরানাথ পদরত্নকে নাটকটি দেখে আসার জন্য বললেন।

মথুরানাথ পিতার নির্দেশে এবং আরো বহু চৈতন্যভক্তদের অনুরোধে কলকাতায় এলেন এবং 'চৈতন্যলীলা' অভিনয় দেখলেন। অভিভূত মথুরানাথ গিরিশচন্দ্রের সাথে দেখা করলেন এবং গদগদ কণ্ঠে, অত্যন্ত প্রীত হয়ে গিরিশচন্দ্রকে 'তোর মনোবাঞ্ছা গৌর পূর্ণ করবেনই' বলে চলে গেলেন।

প্রসিদ্ধ সিদ্ধভক্ত প্রবর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও 'চৈতন্যলীলা' অভিনয় দেখে প্রেমের জোয়ারে দর্শক আসনেই ভাব-মত্ত হয়ে নৃত্য করেছিলেন।

'চৈতন্যলীলা'র প্রভাব 'স্টার থিয়েটারের' স্বল্পকালীন সময়ের বেড়া ভেঙ্গে সর্বত্র, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে সংকীর্তন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করল—পালা করে দ্বারে দ্বারে ঘরে ঘরে চৈতন্য কথা, কৃষ্ণনাম প্রচারে উৎসাহিত হতে লাগলেন।

> ....জনকতেক বাপে খেদানো মায়ে তাড়ানো ছেলে আর তাদের দলভুক্ত গোটা কতক বেশ্যা মিলে—'কিশোরীর প্রেম নিবি আয়, প্রেমের জোয়ার বয়ে যায়' গেয়ে বাঙলার হরিনাম প্রচার করেছিল। এমন চেঁচান চেঁচিয়েছিল যে দক্ষিণেশ্বরের পাগলা বামুনের টনক নড়ে গিয়েছিল—স্থির থাকতে পারেননি ছুটে এসেছিলেন দেখতে— কৃপার ভিখারী কারা, থিয়েটারে এসে চিনেছিলেন তাঁর নবদ্বীপ-লীলার জগাই মাধাই এর একজন। অহেতুকী কৃপা-সিন্ধুর করুণায় পাষাণ বিগলিত হয়ে,বাঙলার নামের প্রবাহ ছুটেছিল ঠাকুর রামকৃষ্ণের স্টার থিয়েটারে পদাপর্নে গিরিশচন্দ্রের নবদ্বীপ লীলার অনুভূতি সুস্পষ্ট হয়েছিল। ...

ভক্ত গিরিশচন্দ্র—শ্রী শচন্দ্র মতিলাল।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদের 'চৈতন্যলীলা'র প্রশংসা এবং নাটকের অভিনয় সম্পর্কে শুনে মুগ্ধ হয়ে নিজে দক্ষিণেশ্বর থেকে ভক্তদের নিয়ে 'স্টার থিয়েটার' এসে নাটকটি দেখলেন। অভিনয় শেষে কোন ভক্তের জিজ্ঞাসার উত্তরে শুধু বললেন,

— আসল নকল এক দেখলাম।

.... ঠাকুর (রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব) আজ (২১ শে সেপ্টেম্বর ১৮৮৪)

কলকাতায় স্টার থিয়েটারে চৈতন্যলীলা দেখতে যাবেন। স্টার থিয়েটারের তখন সেখানে অভিনয় হত, আজকাল সেখানে কোহিনুর থিয়েটার। মহেন্দ্র মুখুর্য্যের সঙ্গে তাঁর গাড়ি করে অভিনয় দেখতে যাবেন। কোনখানে বসলে ভাল দেখা যায়, সেই কথা হচ্ছে। কেউ কেউ বললেন, এক টাকার সীটে বসলে বেশ দেখা যায়। রাম বললেন কেন, উনি বক্সে বসবেন।

ঠাকুর হাসছেন। কেউ কেউ বললেন, বেশ্যারা অভিনয় করে। চৈতন্যদেব নিতাই এ-সব অভিনয় তারা করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদিগকে)—আমি তাদের মা আনন্দময়ী দেখবো। তারা চৈতন্যদেব সেজেছে, তা হলেই বা। সোলার আতা দেখলে সত্যকার আতার উদ্দীপন হয়।

"একজন ভক্ত রাস্তায় যেতে যেতে দেখে, কতকগুলি বাবলা গাছ রয়েছে। দেখে ভক্তটি একেবারে ভাবাবিষ্ট। তার মনে হয়েছিল যে, ঐ কাঠে শ্যামসুন্দরের বাগানের কোদালের বেশ বাঁট হয়। অমনি শ্যামসুন্দরকে মনে পড়েছে। যখন গড়ের মাঠে বেলুন দেখতে আমায় নিয়ে গিয়েছিলে, তখন একটি সাহেবের ছেলে একটা গাছে ঠেসান দিয়ে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেখাও যা, অমনি কৃষ্ণের উদ্দীপন হল, অমনি সমাধিস্থ হয়ে গেলাম।.....

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ২য় ভাগ

শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ স্টার থিয়েটারে এসেছিলেন—নটনটীগণের তথা বাংলা রঙ্গালয়ের পবিত্রতা বৃদ্ধি পেল।

.... দেখিতেছ না স্বয়ং ঈশ্বর রসপ্রার্থী— যে রস স্বর্ণকান্তি কিশোরী বৃন্দাবনে উপভোগ করিতেছিলেন সেই রস আস্বাদনে লুব্দ হয়ে স্বয়ং ঈশ্বর ধরনীতলে অবতীর্ণ হয়ে ধরায় বিলুণ্ঠিত। বুঝিতে পারিতেছ না—নাই পারো, অমৃতের আস্বাদ পাইয়াছ— তোমার মৃত্যু নাই। রসাস্বাদনের তৃপ্তির সঙ্গে আস্বাদন— আকাঙ্ক্ষা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। অনন্তকাল এ রসের অন্ত নাই। অনন্তরস অনন্তকাল আস্বাদ করো।

আহা, তুমি দীনভাবে দূরে দন্ডায়মান? চন্ডাল? তুমি মহা পাতকী? তাতে দোষ কি, এসো এ কিশোরীর রসাস্বাদনে তোমার মানা নাই। আহা তুমি 'ব্যভিচারিণী'—তাই কি তুমি কুণ্ঠিত? এ বৈকুণ্ঠের রস-গানে কুণ্ঠিত হইও না, রসময়ী কিশোরী এ-রসদাত্রী, তোমার নিমিত্ত তিনি কাতরা, তোমার তিনি তাঁর সঙ্গিনী করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন তোমার সঙ্গে না লইয়া তিনি গোলকে যাইবেন না, অকুণ্ঠ হৃদয়ে বৈকুণ্ঠের রস-সাগরে ঝম্প প্রদান করো। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য গৌরাঙ্গদেব করতালি দিয়া নৃত্য করিতে করিতে হরিধ্বনি করিয়া জীবকে ডাকিতেছেন, 'এসো', 'এসো', চিরানন্দ উপভোগ

করো! এ আনন্দময় আস্বাদনে কাহার ও বাধা নাই, এক বাধা সন্দেহ। যদি কোটী জন্ম মহাপাপ করিয়া থাকো তথাপি তোমার শঙ্কা নাই, দেখিতেছ না—আমি তোমায় কোল দিবার নিমিত্ত বাহু প্রসারণ করিয়া রহিয়াছি। যদি কুটিল তর্কযুক্তি তোমায় আসিতে বাধা দেয়, তুমি বৃন্দাবন-ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করো— সেই ভাব তরঙ্গে জটিল তর্কযুক্তি ভাসিয়া যাবে।

ভক্ত গিরিশচন্দ্র :
শ্রীশ্রীচন্দ্র মতিলাল

গিরিশচন্দ্র চৈতন্যলীলায় চৈতন্যের ভূমিকায় বিনোদিনীর বিষয়ে লিখেছেন,

.... গৌরাঙ্গ মূর্তির ব্যাখা—অন্তঃকৃষ্ণ বহিঃ রাধা-পুরুষ ও প্রকৃতি এক সঙ্গে জড়িত। এই পুরুষ প্রকৃতির ভাব বিনোদিনীর অঙ্গে প্রতিফলিত হইত। বিনোদিনী যখন 'কৃষ্ণ কই, কৃষ্ণ কই?' বলিয়া সংজ্ঞাহীনা হইত, তখন বিরহবিধুরা 'রমণীর' আভাস পাওয়া যাইত। আবার চৈতন্যদেব যখন ভক্তগণকে কৃতার্থ করিতেছেন, তখন পুরুষোত্তম-ভাবের আভাস বিনোদিনী আনিতে পারিত। অভিনয় দর্শনে অনেক ভাবুক এরূপ বিভোর হইয়াছিলেন যে বিনোদিনীর পদধুলি গ্রহণে উৎসুক হল।

....বিনোদিনী অতি ধন্যা, পরমহংসদেব করকমল দ্বারা তাহাকে স্পর্শ করিয়া শ্রীমুখে বলিয়াছিলেন,—'চৈতন্য হোক'। .....

'আমার কথা' শ্রীমতী
বিনোদিনীর ভূমিকা।

গিরিশচন্দ্রের মন ও প্রাণ উন্মুক্ত। মন ও মুখ এক। তিনি 'সুরা' পান করতেন প্রকাশ্যে—তার জন্য কোন সংশয় বা লজ্জা তাঁকে এতটুকু স্পর্শ করেনি।

'চৈতন্যলীলা' নাটকের অভাবনীয় ভক্তি প্রবাহের ধারায় মুগ্ধ হয়ে কলকাতা তথা বাইরের কয়েকজন বৈষ্ণব গোস্বামী পরমভক্ত বৈষ্ণব গিরিশচন্দ্রের সাথে তাঁর বাড়ীতে দেখা করতে এসেছিলেন। গিরিশচন্দ্র তখন সুরা পান করছিলেন—সামনে কিছু সুরা ভর্তি বোতল রাখা ছিল। উপস্থিত গোস্বামীগণ ভাবলেন, গিরিশচন্দ্র ঔষধ পান করছেন। গিরিশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিসের জন্য—কি ঔষধ পান করছেন।

গিরিশচন্দ্র নির্ভীক কণ্ঠে অম্লানবদনে বললেন, ঔষধ নয়, মদ পান করছি। কথাটি শুনে উপস্থিত গোস্বামীগণ রেগে গিরিশের গৃহ ত্যাগ করে চলে গেলেন।

গিরিশচন্দ্র মদ খেতেন কিন্তু বেতাল হতেন না।

।। কুড়ি।।

শৈশব অতিক্রম করে যৌবনে জীবনের দিশাহীন শৃংঙ্খলাহীন দিনগুলির মধ্য থেকে অত্যন্ত গভীর আকুতিতে কখনও প্রকাশ্যে কখনও বা অপ্রকাশ্যে একটা মুক্ত পবিত্র প্রাণবায়ুর খোঁজ করতেন গিরিশচন্দ্র। অন্তরে যে তীব্র ব্যাকুলতায় কালীঘাটে—তারকেশ্বরে ছুটে যেতেন—মা - মা বলে কাঁদতেন—'গুরু চাই, গুরু দেখিয়ে দাও', বলে তারকনাথের কাছে প্রার্থনা করতেন—তা ধীরে ধীরে পাকা হতে লাগল গিরিশের মধ্যে। নাটক রচনায় তার বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশিত হয়ে যেতো অজানতে। সে যে অনন্ত ক্ষুধা—কিসে তা মিটবে—ধন তা মেটাতে পারে না, নারী তা মেটাতে পারে না, যশ তা মেটাতে পারে না, প্রতিভা তা মেটাতে পারে না—তাই গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক কাহিনীর চরিত্র থেকে সেই 'মেটার' রাস্তায় পথ কেটে কেটে চলতে লাগলেন নাটকের মধ্য দিয়ে।

'চৈতন্যলীলা' লিখলেন— কে যেন অদৃশ্যহস্তে লেখালেন—ঠাকুর রামকৃষ্ণ স্বইচ্ছায় এলেন সেই ' চৈতন্যলীলা দেখার জন্য—গিরিশচন্দ্রকে আকর্ষণ করার জন্য—রুদ্ধ দুয়ারের অন্ধকার সরিয়ে দিয়ে আলোর হাতছানি দেবার জন্য। ঠাকুর 'স্টারে' এসেছেন—গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা' দেখলেন—সকলের অজানতে পুঁতে দিয়ে গেলেন আনন্দ অমৃতবৃক্ষ গিরিশের জন্য।

তারপর থেকে গিরিশচন্দ্র কেমন যেন হয়ে গেলেন। এ বিষয়ে তাঁর নিজের কথায় রামকৃষ্ণ দর্শন ও অনুভব সম্পর্কে বলেছেন,

> ....বহুদিন পূর্বে 'Indian Mirror' এ দেখেছিলাম যে, দক্ষিনেশ্বরে একজন পরমহংস আছেন, তথায় স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের সশিষ্যে গতিবিধি আছে। আমি হীনবুদ্ধি, ভাবলাম যে, ব্রাহ্মরা যেমন হরি, মা প্রভৃতি বলা আরম্ভ করেছেন, সেইরূপ এক পরমহংস ও খাড়া করেছেন। হিন্দুরা যাঁহাকে পরমহংস বলে, সে পরমহংস ইনি নন। তাহার পর কিছুদিন বাদে শুনলাম,

আমাদের বসুপাড়ায় ৺দীননাথ বসুর বাড়ীতে পরমহংস এসেছেন। কৌতুহল বশতঃ দেখতে গেলাম—কিরূপ পরমহংস। সেইখানে গিয়ে শ্রদ্ধার পরিবর্তে তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধা বয়ে আনলাম। ৺দীননাথ বাবুর বাড়ীতে যখন আমি উপস্থিত হই, তখন পরমহংস কি উপদেশ দিচ্ছেন ও কেশববাবু প্রভৃতি তা আনন্দ করে শুনছেন। সন্ধ্যা হয়েছে, একজন সেজ জ্বেলে এনে পরমহংসদেবের সামনে রাখল। তখন পরমহংস পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—"সন্ধ্যা হয়েছে?"

আমি এই কথা শুনে ভাবলাম, 'ঢং দেখ, সন্ধ্যা হয়েছে, সম্মুখে সেজ জ্বলছে, তবু ইনি বুঝতে পারছেন না যে, সন্ধ্যা হয়েছে কি না!' আর কি দেখব, চলে আসলাম।

এর কয়েক বৎসর পরে রামকান্ত বসু স্ট্রীটস্থ ৺বলরাম বসুর ভবনে পরমহংসদেব আসবেন। সাধুত্তম বলরাম তাঁকে দর্শন করবার নিমিত্ত পাড়ার অনেকেই নিমন্ত্রণ করেছেন। আমারও নিমন্ত্রণ হয়েছিল—দর্শন করতে গেলাম। দেখলাম পরমহংসদেব এসেছেন, বিধুকীর্তনী তাঁকে গান শুনাবার জন্য নিকটে আছে। বলরামবাবুর বৈঠকখানায় অনেক লোক-সমাগম হয়েছে। পরমহংসদেবের আচরণে আমার একটু চমক হল। আমি জানতাম, যাঁরা পরমহংস ও যোগী বলে আপনাকে পরিচয় দেন, তাঁরা কারও সঙ্গে কথা কন না, কাকেও নমস্কার করেন না; তবে কেউ যদি অতি সাধ্যসাধনা করে, পদসেবা করতে দেন। এ পরমহংসের ব্যাপার সম্পূর্ণ বিপরীত। অতি দীনভাবে পুনঃ পুনঃ মস্তক ভুমি স্পর্শ করে নমস্কার করছেন। এক ব্যক্তি আমার পূর্বের ইয়ার, তিনি পরমহংসকে লক্ষ্য করে ব্যঙ্গ করে বললেন, "বিধু ওঁর পূর্বের আলাপী, তার সঙ্গে রঙ্গ হ'চ্ছে।" কথাটা আমার ভাল লাগল না। এমন সময় অমৃতবাজার পত্রিকার সুবিখ্যাত সম্পাদক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ উপস্থিত হলেন। পরমহংসদেবের প্রতি তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা বোধ হল না। তিনি বললেন, "চল, আর কি দেখবে?" আমার ইচ্ছা ছিল, আরো কিছু দেখি, কিন্তু তিনি জেদ করে আমায় সঙ্গে নিয়ে আসলেন। **এই আমার দ্বিতীয় দর্শন।**

আবার কিছুদিন যায়, স্টার থিয়েটারে (৬৮নং বিডন স্ট্রীট) "চৈতন্যলীলা"র অভিনয় হচ্ছে, আমি থিয়েটাবের বাইরে compound -এ ঘুরে বেড়াচ্ছি, এমন সময়ে মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক একজন ভক্ত (এখন তিনি স্বর্গগত) আমায় বললেন, "পরমহংসদেব থিয়েটার দেখতে এসেছেন, তাঁকে বসতে দাও ভাল, নচেৎ টিকিট কিনছি।" আমি বললাম, "তাঁর টিকিট লাগবে না, কিন্তু অপরের টিকিট লাগবে।" এই বলে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে অগ্রসর হচ্ছি,— দেখলাম, তিনি গাড়ী থেকে নেমে থিয়েটারের compound-এর মধ্যে প্রবেশ করছেন; আমি না নমস্কার করতে করতে তিনি আগে নমস্কার করলেন, আমি নমস্কার করলাম, পুনর্বার তিনি নমস্কার করলেন, আমি আবার নমস্কার করলাম, পুনর্বার তিনিও নমস্কার করলেন। আমি ভাবলাম, এইরূপই তো দেখছি চলবে। আমি মনে মনে নমস্কার করে তাঁকে উপরে নিয়ে এসে একটি Box-এ বসালাম ও একজন পাখাওয়ালা নিযুক্ত করে দিয়ে শরীরের অসুস্থতা বশতঃ বাড়ী চলে আসলাম। **এই আমার তৃতীয় দর্শন।**

আমার চতুর্থ দর্শন বিবৃত করবার পূর্বে আমার নিজের অবস্থা বলা প্রয়োজন। আমাদের পঠদ্দশায় যাঁরা "Young Bengal" নামে অভিহিত হতেন, তাঁরাই সমাজে মান্যগণ্য ও বিদ্বান্ বলে পরিগণিত ছিলেন। বাঙ্গালায় ইংরাজী শিক্ষায় তাঁরাই প্রথম ফল। তাঁদের মধ্যে অনেকেই জড়বাদী, অল্পসংখ্যক ক্রিশ্চিয়ান হয়ে গিয়েছেন এবং কেউ কেউ ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করেন। কিন্তু হিন্দুধর্মের প্রতি আস্থা তাঁদের মধ্যে প্রায় কারও ছিল না বললেও বলা যায়। সমাজে যাঁরা হিন্দু ছিলেন, তাঁদের মধ্যে মতভেদ, শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব চলে এবং বৈষ্ণব-সমাজে এমন নানা শ্রেণীতে বিভক্ত যে, পরস্পর

পরস্পরের প্রতিবাদী। ইহা অন্যান্য মতও প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক মতেই অপর মতাবলম্বীর নরক-ব্যবস্থা। এর উপর অনেক যাজক ব্রাহ্মণ ভ্রষ্টাচার হয়েছেন। সত্যনারায়ণের পুঁথি নিয়ে শ্রাদ্ধ করেন, মেটে দেওয়ালে পাইখানার ঘটী হতে জল দিয়ে গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা ধারণ করেন। তার উপর ইংরাজীও দু'পাতা পড়ছে, কালাপাহাড় জগন্নাথ ভেঙ্গেছে প্রভৃতি। আবার জড়বাদীরা বুদ্ধিবিদ্যায় সকলের শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য, ঈশ্বর না-মানা বিদ্যার পরিচয, এ অবস্থায় স্বধর্মের প্রতি আস্থা কিছুমাত্র রইল না; কিন্তু মাঝে মাঝে ঈশ্বর নিয়ে সমবয়স্ক বন্ধুর সঙ্গে তর্ক-বিতর্কও চলে; আদি-সমাজেও কখনও কখনও যাওয়া-আসা করি, একটি ব্রাহ্মসমাজও পাড়ার কাছে ছিল, সেখানেও মাঝে মাঝে যাই। কিন্তু কিছু বুঝতে পারলাম না। ঈশ্বর আছেন কি না সন্দেহ, যদি থাকেন, কোন্ ধর্মাবলম্বী হওয়া উচিত? নানা তর্কবিতর্ক করে কিছু স্থির হল না, এতে মনের অশান্তি হতে লাগল। একদিন প্রার্থনা করলাম, 'ভগবান, যদি থাকো, আমায় পথ নির্দেশ করে দাও।' এর কিছুদিন পরেই দাম্ভিকতা এল। ভাবলাম, জল-বায়ু-আলো—ইহজীবনের যা প্রয়োজন, তা অর্জন রয়েছে; তবে ধর্ম, যা অনন্ত-জীবনের প্রয়োজন তা এত খুঁজে নিতে হবে কেন? সমস্তই মিথ্যা কথা; জড়বাদীরা বিদ্বান—বিজ্ঞ, তাঁরা যে-কথা বলেন, সেই কথাই ঠিক। ধর্মের আন্দোলন বৃথা; এইরূপ তমসাচ্ছন্ন হয়ে চতুর্দশ বর্ষ অতিবাহিত হল। পরে দুর্দিন এসে ঠিক নিশ্চিন্ত থাকতে দিল না। দুর্দিনের তাড়নায় চতুর্দিক অন্ধকার দেখে ভাবতে লাগলাম, বিপদ-মুক্ত হবার কোনও উপায় আছে কি? দেখেছি, অসাধ্য রোগ হলে তারকনাথের শরণাপন্ন হয়ে থাকে, আমারও তো কঠিন বিপদ; একরূপ উদ্ধার হওয়া অসাধ্য, এ সময়ে তারকনাথকে ডাকলে কিছু হয় কি? পরীক্ষা করে দেখা যাক্। শরণাপন্ন হবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সেই চেষ্টাই সফল হল, বিপজ্জাল অচিরে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। আমার দৃঢ় ধারণা জন্মাল— দেবতা মিথ্যা নয়। বিপদ হতে তো মুক্ত হলাম, কিন্তু আমার পরকালের উপায় কি? আবার মনোমধ্যে ঘোর দ্বন্দ্ব, কোন্ পথ অবলম্বন করি? তারকনাথের মহিমা দেখেছি, তারকনাথকেই ডাকি। ক্রমে দেব-দেবীর প্রতি বিশ্বাস জন্মাতে লাগল, কিন্তু সকলেই বলে যে, গুরু ব্যতীত উপায় নেই। ভাবলাম, কেন উপায় নেই? এই তো ঈশ্বরের নাম রয়েছে, ঈশ্বরকে ডাকলে কেন উপায় হবে না? কিন্তু সকলেই বলে, গুরু ব্যতীত উপায় হয় না। তবে গুরু কাকে করব? শুনতে পাই, গুরুকে ঈশ্বরজ্ঞান করতে হয়; কিন্তু আমার ন্যায় মনুষ্যকে ঈশ্বর জ্ঞান কিরূপে করি? মন অতি অশান্তিপূর্ণ হল। মনুষ্যকে গুরু করতে পারি না।

"গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।"

এই বলে গুরুকে প্রণাম করতে হয়। সামান্য মানুষকে দেখে ভণ্ডামি কিরূপে করব? ঈশ্বরের নিকট অকপট-হৃদয়ের প্রয়োজন, গুরুর সঙ্গে ঘোর কপটতা করে কিরূপে তাঁকে পাব। যাক, আমার গুরু হবে না। বাবা তারকনাথের নিকট প্রার্থনা

করি, যদি গুরুর একান্ত প্রয়োজন হয়, তিনি কৃপা করে আমার গুরু হোন। শুনেছিলাম, নরবেশ ধরে কখনো কখনো মহাদেব মন্ত্র দিয়ে থাকেন। যদি আমার প্রতি তাঁর এরূপ কৃপা হয়, তবেই। নচেৎ আমি নিরুপায়। কিন্তু তারকনাথের তো কই দেখা পাই না, তবে আর কি করব? প্রাতে একবার ঈশ্বরের নাম করব, তারপর যা হয় হবে। এসময়ে একজন চিত্রকরের সঙ্গে আমার আলাপ হয়, তিনি একজন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ছিলেন, সত্য হোক, আর মিথ্যা হোক, একদিন তিনি আমায় বললেন, "আমি প্রত্যহ ভগবানকে ভোগ দিই, তিনি গ্রহণ করেন, কখনো কখনো রুটিতে দাঁতের দাগ থাকে, কিন্তু এ ভাগ্য গুরুর নিকট উপদিষ্ট না হলে হয় না।" আমার মন বড়ই ব্যাকুল হল। তার নিকট হতে চলে গিয়ে ঘরের দোর বন্ধ করে রোদন করতে লাগলাম। এ ঘটনার তিন দিন পরে আমি কোন কারণবশতঃ আমাদের পাড়ার চৌরাস্তায় একটি রকে বসে আছি, দেখলাম চৌরাস্তার পূর্বদিক হতে নারায়ণ, আর দুই একটি ভক্ত সমভিব্যাহারে পরমহংসদেব ধীরে ধীরে আসছেন। আমি তাঁর দিকে চক্ষু ফেরানো মাত্রই তিনি নমস্কার করলেন। সেদিন আমি নমস্কার করায় পুর্নবার নমস্কার করলেন না। আমার সম্মুখ দিয়ে ধীরে ধীরে চৌমাথার দক্ষিণ দিকের রাস্তায় চললেন। তিনি যাচ্ছেন—আমার বোধ হতে লাগল, যেন অজানিত সূত্রের দ্বারা আমার বক্ষঃস্থল তাঁর দিকে কে টানছে। তিনি কিছুদূর গিয়েছেন, আমার ইচ্ছা হল, তাঁর সঙ্গে যাই। এমন সময় তাঁর নিকট হতে আমায় ইচ্ছা হল, তাঁর সঙ্গে যাই। এমন সময় তাঁর নিকট হতে আমায় একজন ডাকতে আসলেন। কে, আমার স্মরণ হচ্ছে না। তিনি বললেন, "পরমহংসদেব ডাকছেন।" আমি চললাম, পরমহংসদেব ৺বলরামবাবুর বাটীতে উঠলেন, আমিও তাঁর পশ্চাতে গিয়ে বৈঠকখানায় উপস্থিত হলাম। (তৎকালে বলরামবাবু দেহ পরিত্যাগ করেন নাই।) বলরামবাবু বৈঠকখানায় শুয়েছিলেন, বোধ হল পীড়িত, পরমহংসদেবকে দেখামাত্র সসম্ভ্রমে উঠে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন। বসে বলরামবাবুর সঙ্গে দুই একটি কথা বলবার পর পরমহংসদেব হঠাৎ উঠে, "বাবু আমি ভাল আছি—বাবু আমি ভাল আছি।"—বলতে বলতে কিরূপ এক অবস্থাগত হলেন। তারপর বলতে লাগলেন—"না না,—ঢং নয়—ঢং নয়।" অল্প সময় এইরূপ অবস্থায় থেকে পুনরায় আসন গ্রহণ করলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'গুরু কি?' তিনি বললেন, "গুরু কি জান, যেন ঘটক।" আমি ঘটক কথা ব্যবহার করছি, তিনি এই অর্থে অন্য কথা ব্যবহার করেছিলেন। আবার বললেন, "তোমার গুরু হ'য়ে গেছে।" 'মন্ত্র কি?' জিজ্ঞাসা করাতে বললেন, "ঈশ্বরের নাম।" দৃষ্টান্ত দিয়ে বলতে লাগলেন, "রামানুজ প্রত্যহই গঙ্গাস্নান করতেন। ঘাটের সিঁড়িতে 'কবীর' নামে এক জোলা শুয়েছিল। রামানুজ নামতে নামতে তাঁর শরীরে পাদস্পর্শ করায় সবল দেহে ঈশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞানে 'রাম' শব্দ উচ্চারণ করলেন। সেই রাম নাম কবীরের মন্ত্র হল; আর সেই নাম জপ করে কবীরের সিদ্ধি লাভ হল।" থিয়েটারেরও কথা পড়ল। তিনি বললেন,—"আর একদিন আমায় থিয়েটার দেখিও।" আমি উত্তর

করলাম, "যে আজ্ঞে, যেদিন ইচ্ছা দেখবেন।" তিনি বললেন, "কিছু নিও।" আমি বললাম, 'ভালো, আট আনা দেবেন।' পরমহংসদেব বললেন,—"সে বড় র‍্যাজলা জায়গা।" আমি উত্তর করলাম, 'না, আপনি সেদিন যেখানে বসেছিলেন, সেইখানে বসবেন।' তিনি বললেন, "না, একটি টাকা নিও।" আমি 'যে আজ্ঞে' বলায় এ কথা শেষ হল।

বলরামবাবু তাঁর ভোগের নিমিত্ত কিছু মিষ্টান্ন আনালেন। তিনি একটি সন্দেশ হতে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করলেন মাত্র। অনেকেই প্রসাদ ধারণ করলেন। আমার ইচ্ছা ছিল, কে কি বলবে, লজ্জায় পারলাম না। এর কিছুক্ষণ পরেই হরিপদ নামে এক ভক্তের সঙ্গে পরমহংসদেবকে প্রণাম করে বলরামবাবুর বাটী হতে বের হলাম। পথে হরিপদ আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন দেখলেন?" আমি বললাম, 'বেশ ভক্ত।' তখন আমার মনে খুব আনন্দ হয়েছে, গুরুর জন্যে হতাশা আর নেই। ভাবছি, গুরু করতে হয় এইরকম। এই তো পরমহংস বললেন, আমার গুরু হ'য়ে গিয়েছে, তবে আর কার কথা শুনি?

যে কারণে মনুষ্যকে গুরু করতে অনিচ্ছুক ছিলাম, তা একরূপ বলেছি, কিন্তু এখন বুঝছি যে, আমার মনের প্রবল দম্ভ থাকায় আমি গুরু করতে চাই নি। ভাবতাম— এত কেন? গুরুও মানুষ, শিষ্যও মানুষ তাঁর নিকট জোড়হাত করে থাকবে, পদসেবা করবে, তিনি যখন যা বলবেন, তখন তা যোগাব, এ একটা আপদ জোটান মাত্র। পরমহংসদেবের সঙ্গে এই দম্ভ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। থিয়েটারে প্রথমেই তিনি আমায় নমস্কার করলেন, তার পর রাস্তায়ও আমায় প্রথম নমস্কার করলেন। তিনি যে নিরহঙ্কার ব্যক্তি, আমার ধারণা জন্মিল এবং আমার অহঙ্কারও খর্ব হল। তাঁর নিরহঙ্কারিতার কথা আমার মনে দিন দিন উঠে। বলরামবাবুর বাটীর ঘটনার কিছুদিন পরে আমি থিয়েটারের সাজ-ঘরে বসে আছি, এমন সময় শ্রদ্ধাস্পদ ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় ব্যস্ত হয়ে এসে আমায় বললেন, "পরমহংসদেব এসেছেন।" আমি বললাম, ভাল Box-এ নিয়ে গিয়ে বসান।' দেবেন্দ্রবাবু বললেন, "আপনি অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসবেন না?" আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, 'আমি না গেলে তিনি আর গাড়ী থেকে নামতে পারবেন না!' কিন্তু গেলেম। আমি পঁহুছিয়েছি, এমন সময় তিনি গাড়ী থেকে নামছেন। তাঁর মুখ-পদ্ম দেখে আমার পাষাণ-হৃদয়ও গলল। আপনাকে ধিক্কার দিলাম, সে ধিক্কার এখনও আমার মনে জাগছে। ভাবলাম, এই পরমশান্ত ব্যক্তিকে আমি অভ্যর্থনা করতে চাইনি? পরে নিয়ে গেলেম। তথায় শ্রীচরণ স্পর্শ করে প্রণাম করলাম। কেন যে করলাম, তা আমি আজও বুঝতে পারছি না। আমার ভাবান্তর হয়েছিল নিশ্চয়, আমি একটি প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুল নিয়ে তাঁকে দিলাম। তিনি গ্রহণ করলেন, কিন্তু আমায় ফিরিয়ে দিলেন, বললেন,—"ফুলের অধিকার দেবতার আর বাবুদের, আমি কি করব?" Dress Circle-এর দর্শকের, Concert-এর সময় বসবার জন্য Star Theatre -এর দ্বিতলে, স্বতন্ত্র একটি কামরা

ছিল। সেই কামরায় পরমহংসদেব আসলেন। অনেকগুলি ভক্ত তাঁর সঙ্গে আসলেন। পরমহংসদেব একখানি চৌকিতে বসলেন, আমিও অপর এক চৌকিতে বসলাম। কিন্তু দেবেনবাবু প্রভৃতি ভক্তেরা অপর চৌকি থাকা সত্ত্বেও বসছেন না। দেবেনবাবুর সঙ্গে আলাপ ছিল। আমি পুনঃ পুনঃ বলতে লাগলাম, 'বসুন না।' কিন্তু তিনি অসম্মত। কারণ বুঝতে পারলাম না। আমার এতদূর মূঢ়তা ছিল যে, গুরুর সঙ্গে সম আসনে বসতে নেই, এটা আমি জানতাম না। পরমহংসদেব আমার সঙ্গে নানা কথা বলতে লাগলেন। আমার বোধ হতে লাগল যে, কি একটা স্রোত যেন আমার মস্তক অবধি উঠেছে ও নামছে। ইতিমধ্যে তিনি ভাবনিমগ্ন হলেন। একটি বালকভক্তের সঙ্গে ভাবাবস্থায় যেন ক্রীড়া করতে লাগলেন। বহু পূর্বে আমি দুর্দান্ত পাষণ্ডের নিকট পরমহংসদেবের নিন্দা শুনেছিলাম, এই বালকের সঙ্গে এইরূপ ক্রীড়া দেখে আমার সেই নিন্দার কথা মনে উঠল। পরমহংসদেবের ভাব ভঙ্গ হল। তিনি আমায় লক্ষ্য করে বললেন,— " তোমার মনে বাঁক (আড়) আছে।" আমি ভাবলাম, অনেক প্রকার বাঁক তো আছেই বটে, কিন্তু তিনি কোন্ বাঁক লক্ষ্য করে বলছেন, তা বুঝ্যত পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম,— "বাঁক যায় কিসে?" পরমহংসদেব বললেন,— "বিশ্বাস করো!"

আবার কিছুদিন গত হল, আমি বেলা তিনটার সময় থিয়েটারে এসেছি, একটি চিরকুট পেলাম যে, মধু রায়ের গলিতে রামচন্দ্র দত্তের ভবনে পরমহংসদেব আসবেন। পড়ামাত্র আমাদের চৌরাস্তায় বসে আমার হৃদয়ে যেরকম টান পড়েছিল, সেইরকম টান পড়ল। আমি যেতে ব্যস্ত হলাম, কিন্তু আবার ভাবতে লাগলাম যে, অজানিত বাটীতে বিনা নিমন্ত্রণে কেন যাব? ঐ অজানিত সূত্রের টানে সে বাধা রইল না। চললাম, অনাথবাবুর বাজারের নিকটে গিয়ে ভাবলাম, যাব না। ভাবলে কি হয়, আমায় টানছেন। ক্রমে অগ্রসর হই আর থামি। রামবাবুর গলির মোড়ে গিয়ে থামলাম। পরে রামবাবুর বাড়ী গিয়ে পৌঁছলাম। দোরে রামবাবু বসে আছেন। ভক্তচূড়ামণি সুরেন্দ্রনাথ মিত্রও ছিলেন। সুরেন্দ্রবাবু আমায় স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করলেন, কেন আমি তথায় গিয়েছি? আমি বললাম, 'পরমহংসদেবকে দর্শন করতে।' রামবাবুর বাড়ীর কাছেই সুরেন্দ্রবাবুর বাটী। তিনি তথায় আমায় নিয়ে গেলেন এবং তিনি কিরূপে পরমহংসদেবের কৃপা পেলেন, তা আমায় বলতে লাগলেন। আমার সে কথা ভাল লাগল না। আমি তাঁরই সঙ্গে রামবাবুর বাটীতে ফিরে আসলাম। তখন সন্ধ্যা হয়েছে, রামবাবুর উঠানে রামবাবু খোল বাজাচ্ছেন, পরমহংসদেব নৃত্য করছেন। গান গাইছেন,—"নদে টল্‌মল্ টল্‌মল্ করে গৌর-প্রেমের হিল্লোলে।" আমার বোধ হতে লাগল, সত্যই যেন রামবাবুর আঙ্গিনা টল্‌মল্ করছে। আমার মনে খেদ হতে লাগল, এ আনন্দ আমার ভাগ্যে ঘটবে না। চক্ষে জল আসল। নৃত্য করতে করতে পরমহংসদেব সমাধিস্থ হলেন, ভক্তেরা পদধূলি গ্রহণ করতে লাগলেন, আমার ইচ্ছা হল, গ্রহণ করি, কিন্তু লজ্জায় পারলাম না, তাঁর নিকটে গিয়ে পদধূলি গ্রহণ করলে

কে কি মনে করবে। আমার মনে যে মুহূর্তে এইরূপ ভাবের উদয় হল, তৎক্ষণাৎ পরমহংসদেবের সমাধি ভঙ্গ হল ও নৃত্য করতে করতে ঠিক আমার সম্মুখে এসে সমাধিস্থ হলেন। আমার আর চরণস্পর্শের বাধা রইল না। পদধূলি গ্রহণ করলাম। সংকীর্তনের পর পরমহংসদেব রামবাবুর বৈঠকখানায় এসে বসলেন। আমিও উপস্থিত হলাম। পরমহংসদেব আমারই সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমার মনের বাঁক যাবে তো?' তিনি বললেন, "যাবে।" আমি আবার ঐ কথা বললাম। তিনি ঐ উত্তর দিলেন। আমি পুনর্বার জিজ্ঞাসা করলাম, পরমহংসদেবও ঐ উত্তর দিলেন। কিন্তু মনোমোহন মিত্র নামে একজন পরমহংসদেবের পরম ভক্ত রূঢ়স্বরে আমায় বললেন,— "যাও না, উনি বললেন, আর কেন ওঁকে ত্যক্ত ক'চ্ছ?" এরূপ কথার উত্তর না দিয়ে আমি ইতিপূর্বে কখনও ক্ষান্ত হই নি। মনোমোহন বাবুর পানে ফিরে চাইলাম, কিন্তু ভাবলাম—ইনি সত্যই বলেছেন; যাঁর এক কথায় বিশ্বাস নেই, তিনি শতবার বললেও তো তাঁর কথা বিশ্বাসের যোগ্য নয়। আমি পরমহংসদেবকে প্রণাম করে থিয়েটারে ফিরলাম। দেবেনবাবু কিয়দ্দুর আমার সঙ্গে আসলেন ও পথে অনেক কথা বুঝিয়ে আমায় দক্ষিণেশ্বরে যেতে পরামর্শ দিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন দক্ষিণেশ্বরে গেলাম। উপস্থিত হয়ে দেখি, তিনি দক্ষিণ দিকের বারান্দায় একখানি কম্বলের উপর বসে আছেন, অপর একখানি কম্বলে ভবনাথ নামে একজন পরমভক্ত বালক বসে তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন। আমি গিয়ে পরমহংসদেবের পাদপদ্মে প্রণাম করলাম। মনে মনে "গুরুর্ব্রহ্মা" ইত্যাদি— এই স্তবটিও আবৃত্তি করলাম। তিনি আমায় বসতে আদেশ করলেন এবং বললেন, "আমি তোমার কথাই বলছিলাম; মাইরি, একে জিজ্ঞাসা করো।" পরে কি উপদেশের কথা বলতে আরম্ভ করলেন। আমি তাঁকে বাধা দিয়ে বললাম, "আমি উপদেশ শুনব না, আমি অনেক উপদেশ লিখেছি, তাতে কিছু হয় না। আপনি যদি আমার কিছু করে দিতে পারেন, করুন।" এ কথায় তিনি সন্তুষ্ট হলেন। রামলাল দাদা উপস্থিত ছিলেন, তাঁকে বললেন, "কি রে—কি শ্লোকটা, বল তো?" রামলাল দাদা শ্লোকটি আবৃত্তি করলেন, —শ্লোকের ভাব,—পর্বতগহ্বরে নির্জনে বসলেও কিছু হয় না, বিশ্বাসই পদার্থ। আমার তখন মনে হচ্ছে—আমি নির্মল। আমি ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—'আপনি কে?' আমার জিজ্ঞাসার অর্থ এই যে, আমার ন্যায় দাম্ভিকের মস্তক কার চরণে অবনত হল! এ কাহার আশ্রয় পেলাম— যে আশ্রয়ে আমার সমুদয় ভয় দূর হয়েছে? আমার প্রশ্নের উত্তরে পরমহংসদেব বললেন, "আমায় কেউ কেউ বলে—আমি রামপ্রসাদ, কেউ বলে—রাজা রামকৃষ্ণ,—আমি এইখানেই থাকি।" আমি প্রণাম করে বাটীতে ফিরিছি, তিনি উত্তরের বারান্দা অবধি আমার সঙ্গে আসলেন। আমি তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম,—"আমি আপনাকে দর্শন করেছি, আবার কি আমার যাহা করতে হয়, তা করতে হবে?" ঠাকুর বললেন, "তা করো না।" তাঁর কথা আমার মনে হল, যেন যাহা করি, তা করলে দোষ স্পর্শিবে না।

তদবধি গুরু কি পদার্থ, তার কিঞ্চিৎ আভাষ আমার হৃদয়ে আসল, গুরুই সর্বস্ব আমার বোধ হল। যাঁর গুরু আছেন, তাঁর উপর পাপের আর অধিকার নেই। তাঁর সাধন-ভজন নিষ্প্রয়োজন। আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিল, আমার জন্ম সফল।

ইহার পর অনেক ঘটনা ঘটেছে, এই যে পরম-আশ্রয়দাতা, ইঁহার পূজা আমার দ্বারা হয় নাই। মদ্যপান করে ইঁহাকে গালি দিয়েছি। শ্রীচরণসেবা করতে দিয়েছি—ভেবেছি—একি আপদ। কিন্তু এ সকল কার্য করেও আমি দুঃখিত নই। গুরুর কৃপায় এ সকল আমার জন্মেছে যে, গুরুর কৃপায় একটি অমূল্য রত্ন পেয়েছি। আমার মনে ধারণা জন্মেছে যে, গুরুর কৃপা আমার কোন গুণে নহে। অহেতুকী কৃপাসিন্ধুর অপার কৃপা, পতিতবাবনের অপার দয়া— সেই জন্য আমায় আশ্রয় দিয়েছেন। আমি পতিত, কিন্তু ভগবানের অপার করুণা, আমার কোন চিন্তার কারণ নেই। জয় রামকৃষ্ণ!

।। একুশ ।।

স্টার থিয়েটারে 'চৈতন্যলীলা' অভিনীত হবার পরপরই সর্বত্র কৃষ্ণ নাম, গৌর নিতাই নাম পল্লীতে পল্লীতে সংকীর্তনের পালা করে প্রচার করা হোতে লাগল অত্যন্ত মধুর ভাব সম্পদের উজ্জ্বলতায়। সেসময় ভাবের অনুরণনে নৃত্যের প্রভাব এল-চৈতন্যলীলায়, যা দেহ ও মনের মন্দিরায় শুচিতার স্নিগ্ধ বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল।

গিরিশচন্দ্র এরপর *'শ্রীবৎস চিন্তা'* রচনা কল্লেন এবং তা অভিনয়ে নৃত্যকে যুক্ত করলেন সুপরিচ্ছন্ন ভাব প্রকাশের মাধ্যমে। একটা ভাব সমৃদ্ধ রুচিবোধের সমৃদ্ধ পরিবেশের সৃষ্টি করা হল নাটকের মধ্যে অভিনয়ের আংগিকে।

এর পর পরই গিরিশচন্দ্র *'প্রহ্লাদ চরিত্র'* নাটক রচনা করেন এবং দু'অঙ্কে নাটকটির অভিনয় করা স্টার থিয়েটারে। **প্রহ্লাদ চরিত্রের রূপদান করেছিলেন শ্রীমতি বিনোদিনী।** নাটকটির রচনা ও অভিনয় সাফল্য চারিদিক থেকে প্রশংসা আসতে লাগল। **ঠাকুর রামকৃষ্ণ 'প্রহ্লাদ চরিত্র' নাটকটি দেখেছিলেন**—

> .... শ্রীরামকৃষ্ণ আজ স্টার থিয়েটারে 'প্রহ্লাদ চরিত্র' অভিনয় দেখতে এসেছেন। সঙ্গে মাস্টার, বাবুরাম ও নারায়ণ প্রভৃতি। স্টার থিয়েটার তখন বিডন স্ট্রীটে, এই রঙ্গমঞ্চে পরে এমারেল্ড থিয়েটার ও ক্লাসিক থিয়েটারের অভিনয় সম্পন্ন হত।
>
> আজ রবিবার। ৩০ শে অগ্রহায়ণ, কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথি, ১৪ই ডিসেম্বর ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ একটি বক্সে উওরাস্য হয়ে বসে আছেন। গিরিশ এসেছেন। অভিনয় এখনও আরম্ভ হয় নি। ঠাকুর গিরিশের সঙ্গে কথা বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—বা! তুমি বেশ সব লিখেছো!

গিরিশ—মহাশয়, ধারণা কই? শুধু লিখে গেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না তোমার ধারণা আছে। সেইদিন তো তোমায় বললাম ভিতরে ভক্তি না থাকলে চালচিত্র আঁকা যায় না। —

"ধারণা চাই। কেশবের বাড়িতে নববৃন্দাবন নাটক দেখতে গিয়েছিলাম। দেখলাম, একজন ডিপুটি ৮০ টাকা মাহিনা পায়, সকলে বললে, খুব পণ্ডিত, কিন্তু একটা ছেলে লয়ে ব্যতিব্যস্ত। ছেলেটি কিসে ভাল জায়গায় বসবে, কিসে অভিনয় দেখতে পাবে, ওই জন্য ব্যাকুল। এদিকে ঈশ্বরীয় কথা হচ্ছে তা শুনবে না, ছেলে কেবল জিজ্ঞাসা করছে, বাবা এটা কি, ওটা কি? তিনিও ছেলে লয়ে ব্যতিব্যস্ত। কেবল বই পড়েছে মাত্র কিন্তু ধারণা হয় নাই।"

গিরিশ—মনে হয় থিয়েটারগুলো আর করা কেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—**না না ও থাক, ওতে লোকশিক্ষা হবে**। অভিনয় আরম্ভ হয়েছে। প্রহ্লাদ পাঠশালে লেখা-পড়া করতে এসেছেন। প্রহ্লাদকে দর্শন করে ঠাকুর সস্নেহে 'প্রহ্লাদ, প্রহ্লাদ' এই কথা বলতে বলতে একেবারে সমাধিস্থ হলেন।

প্রহ্লাদকে হস্তি-পদতলে দেখে ঠাকুর কাঁদছেন। অগ্নিকুন্ডে যখন ফেলে দিল তখনও ঠাকুর কাঁদছেন।

গোলকে লক্ষ্মী-নারায়ণ বসে আছেন। নারায়ণ প্রহ্লাদের জন্য ভাবছেন। সেই দৃশ্য দেখে ঠাকুর আবার সমাধিস্থ হলেন।

রঙ্গালয়ে গিরিশ যে ঘরে বসেন সেইখানে অভিনয়ান্তে ঠাকুরকে লইয়া গেলেন। গিরিশ বললেন, 'বিবাহ বিভ্রাট' কি শুনবেন? ঠাকুর বললেন, না, প্রহ্লাদ চরিত্রের পর ও-সব কি? আমি তাই গোপাল উড়ের[৬৭] দলকে বলেছিলাম, তোমরা শেষে কিছু ঈশ্বরীয় কথা বলো। বেশ্ ঈশ্বরের কথা হচ্ছিল আবার বিবাহ বিভ্রাট—সংসারের কথা। 'যা ছিলুম তাই হলুম। আবার সেই আগেকার ভাব এসে পড়ে। ঠাকুর গিরিশাদির সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা বলছেন। গিরিশ বলছেন, মহাশয় কি রকম দেখলেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখলাম সাক্ষাৎ তিনিই সব হয়েছেন। যারা সেজেছে তাদের দেখলাম সাক্ষাৎ আনন্দময়ী মা। যারা গোলোকে রাখাল সেজেছে তাদের দেখলাম সাক্ষাৎ নারায়ণ। তিনিই সব হয়েছেন। তবে ঠিক ঈশ্বরদর্শন হ'চ্ছে কি না তার লক্ষণ আছে। একটি লক্ষণ আনন্দ। সঙ্কোচ থাকে না। যেমন সমুদ্র—উপরে হিল্লোল, কল্লোল—নিচে গভীর জল। যার ভগবান দর্শন হয়েছে সে কখনও পাগলের ন্যায়, কখনও পিশাচের ন্যায়—শুচি-অশুচি ভেদ জ্ঞান নেই। কখন বা জড়ের ন্যায়; কেন না অন্তরে-বাহিরে ঈশ্বরকে দর্শন করে অবাক হয়ে থাকে। কখন বালকের

ন্যায়। আঁট নাই বালক যেমন কাপড় বগলে করে বেড়ায়। এই অবস্থায় তখন বাল্যভাব, কখন পৌগণ্ড ভাব—ফষ্টি-নষ্টি করে, কখন যুবার ভাব—যখন কর্ম করে, লোকশিক্ষা দেয়, তখন সিংহতুল্য।

"জীবের অহঙ্কার আছে বলে ঈশ্বরকে দেখতে পায় না। মেঘ উঠলে আর সূর্য দেখা যায় না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে না বলে কি সূর্য নাই? সূর্য ঠিক আছে।"

"তবে 'বালকের আমি' এতে দোষ নাই, বরং উপকার আছে। শাক খেলে অসুখ হয়, কিন্তু হিঞ্চে শাক খেলে উপকার হয়। হিঞ্চে শাক শাকের মধ্যে নয়। মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়। অন্য মিষ্টিতে অসুখ করে, কিন্তু মিছরিতে কফ-দোষ করে না।"

"তাই কেশব সেনকে বলেছিলাম, আর বেশী তোমায় বললে দলটল থাকবে না! কেশব ভয় পেয়ে গেল। আমি তখন বললাম 'বালকের আমি' 'দাস আমি' এতে দোষ নাই।

"যিনি ঈশ্বরদর্শন করেছেন তিনি দেখেন যে ঈশ্বরই জীব জগৎ হয়ে আছেন। সবই তিনি। এরই নাম উত্তম ভক্ত।"

গিরিশ (সহাস্যে)—সবই তিনি, তবে একটু আমি থাকে—কফ-দোষ করে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—হাঁ, ওতে হানি নাই। ও 'আমি'টুকু সম্ভোগের জন্য। আমি একটি, তুমি একটি হলে আনন্দভোগ করা যায়। সেবা-সেবকের ভাব।

"আবার মধ্যম থাকের ভক্ত আছে। সে দেখে যে, ঈশ্বর সর্বভূতে অন্তর্যামীরূপে আছেন। অধম থাকের ভক্ত বলে,—ঈশ্বর আছেন, ঐ ঈশ্বর—অর্থাৎ আকাশের ওপারে। (সকলের হাস্য)।

"গোলকের রাখাল দেখে আমার কিন্তু বোধ হল, সেই (ঈশ্বরই) সব হয়েছে। যিনি ঈশ্বরদর্শন করেছেন, তাঁর ঠিক বোধ হয় ঈশ্বরই কর্তা, তিনিই সব করছেন।"

গিরিশ—মহাশয়,আমি কিন্তু ঠিক বুঝেছি, তিনিই সব করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি বলি, 'মা, আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী; আমি জড়, তুমি চেতয়িতা; যেমন করাও তেমনি করি, যেমন বলাও তেমনি বলি।' যারা অজ্ঞান তারা বলে, কতক আমি করছি, কতক তিনি করছেন।

কর্মযোগে চিত্তশুদ্ধি হয়—সর্বদা পাপ পাপ কি—অহৈতুকী ভক্তি

গিরিশ—মহাশয়, আমি আর কি করছি, আর কর্মই বা কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—না গো, কর্ম ভাল। জমি পাট করা হ'লে যা রুইবে, তাই জন্মাবে। তবে কর্ম নিষ্কামভাবে করতে হয়।

"পরমহংস দুই প্রকার। জ্ঞানী পরমহংস আর প্রেমী পরমহংস। যিনি জ্ঞানী তিনি আপ্তসার—'আমার হ'লেই হ'ল'। যিনি প্রেমী যেমন শুকদেবাদি, ঈশ্বরকে লাভ ক'রে আবার লোকশিক্ষা দেন। কেউ আম খেয়ে মুখটি পুঁছে ফেলে, কেউ পাঁচজনকে দেয়। কেউ পাতকুয়া খুঁড়বার সময়—ঝুড়ি-কোদাল আনে, খোঁড়া হয়ে গেলে ঝুড়ি-কোদাল ঐ পাতকোতেই ফেলে দেয়। কেউ ঝুড়ি-কোদাল রেখে দেয় যদি পাড়ার লোকের কারুর দরকার লাগে। শুকদেবাদি পরের জন্য ঝুড়ি-কোদাল তুলে রেখেছিলেন। (গিরিশের প্রতি) তুমি পরের জন্য রাখবে।"

গিরিশ—আপনি তবে আশীর্বাদ করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি মার নামে বিশ্বাস ক'রো, হয়ে যাবে!

গিরিশ—আমি যে পাপী!

শ্রীরামকৃষ্ণ—যে পাপ পাপ সর্বদা করে সে শালাই পাপী হয়ে যায়!

গিরিশ—মহাশয়, আমি যেখানে বসতাম সে মাটি অশুদ্ধ।

শ্রীরামকৃষ্ণ— সে কি! হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে যদি আলো আসে, সে কি একটু একটু ক'রে আলো হয়? না, একেবারে দপ ক'রে আলো হয়?

গিরিশ—আপনি আশীর্বাদ করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ— তোমায় যদি আন্তরিক হয়, —আমি কি বলব! আমি খাই-দাই তাঁর নাম করি।

গিরিশ—আন্তরিক নাই, কিন্তু ঐটুকু দিয়ে যাবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি কি? নারদ, শুকদেব এঁরা হতেন ত—

গিরিশ—নারদাদি ত আর দেখতে পাচ্ছি না। সাক্ষাৎ যা পাচ্ছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আচ্ছা, বিশ্বাস!

কিয়ৎক্ষণ সকলে চুপ করিয়া আছেন। আবার কথা হচ্ছে।

গিরিশ—একটি সাধ, অহৈতুকী ভক্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—অহৈতুকী ভক্তি ঈশ্বরকোটির হয়। জীবকোটির হয় না।

সকলে চুপ করিয়াছেন, ঠাকুর আনমনে গান ধরলেন, দৃষ্টি ঊর্ধ্বদিকে—

শ্যামাধন কি সবাই পায় (কালীধন কি সবাই পায়)
অবোধ মন বোঝে না একি দায়।
শিবেরি অসাধ্য সাধন মন-মজানো রাঙ্গা পায়।।
ইন্দ্রাদি সম্পদ সুখ তুচ্ছ হয় যে ভাবে মায়।
সদানন্দ সুখে ভাসে, শ্যামা যদি ফিরে চায়।।
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র যে চরণ ধ্যানে না পায়।
নির্গুণে কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায়!

গিরিশ—নির্গুণে কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায়!

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি)—তীব্র বৈরাগ্য হ'লে তাঁকে পাওয়া যায়। প্রাণ ব্যাকুল হওয়া চাই। শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কেমন ক'রে ভগবানকে পাবো। গুরু বললেন, আমার সঙ্গে এসো, —এই ব'লে একটা পুকুরে লয়ে গিয়ে তাকে চুবিয়ে ধরলেন। খানিক পরে জল থেকে উঠিয়ে আনলেন ও বললেন, তোমার জলের ভিতর কি রকম হয়েছিল? শিষ্য বললে, প্রাণ আটুবাটু করছিল— যেন প্রাণ যায়! গুরু বললেন দেখ, এইরূপ ভগবানের জন্য যদি তোমার প্রাণ আটুবাটু করে তবেই তাঁকে লাভ করবে।

"তাই বলি, তিন টান একসঙ্গে হ'লে তবে তাঁকে লাভ করা যায়। বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি টান, সতীর পতিতে টান, আর মায়ের সন্তানেতে টান, এই তিন ভালবাসা একসঙ্গে ক'রে কেউ যদি ভগবানকে দিতে পারে তাহ'লে তৎক্ষণাৎ সাক্ষাৎকার হয়।"

"ডাক দেখি মন ডাকার মত কেমন শ্যামা থাকতে পারে।" তেমন ব্যাকুল হ'য়ে ডাকতে পারলে তাঁর দেখা দিতেই হবে।

" সেদিন তোমায় যা বললুম ভক্তির মানে কি—না কায়-মন-বাক্যে তাঁর ভজনা। কায়,—অর্থাৎ হাতের দ্বারা তাঁর পূজা ও সেবা, পায়ে তাঁর স্থানে যাওয়া, কানে তাঁর ভাগবত শোনা, নামগুণ কীর্তন শোনা, চক্ষে তাঁর বিগ্রহ দর্শন। মন—অর্থাৎ সর্বদা তাঁর ধ্যান চিন্তা করা, তাঁর লীলা স্মরণ মনন করা। বাক্য—অর্থাৎ তাঁর স্তব-স্তুতি, তাঁর নামগুণ কীর্তন, এই সব করা।

"কলিতে নারদীয় ভক্তি—সর্বদা তাঁর নামগুণ কীর্তন করা। যাদের সময় নাই, তারা যেন সন্ধ্যা-সকালে হাততালি দিয়ে একমনে হরিবোল হরিবোল ব'লে তাঁর ভজনা করে।

"ভক্তির আমিতে অহঙ্কার হয় না। অজ্ঞান করে না, বরং ঈশ্বরলাভ করিয়ে দেয়। এ 'আমি' আমির মধ্যে নয়। যেমন হিঞ্চে শাক খেলে পিত্তনাশ হয়, উলটে উপকার হয়, মিছরি মিষ্টের মধ্যে নয়, অন্য মিষ্টি খেলে অপকার হয়, মিছরি খেলে অম্বল নাশ হয়।"

"নিষ্ঠার পর ভক্তি। ভক্তি পাকলে ভাব হয়। ভাব ঘনীভূত হলে মহাভাব হয়। সর্বশেষে প্রেম।

" প্রেম রজ্জুর স্বরূপ। প্রেম হ'লে ভক্তের কাছে ঈশ্বর বাঁধা পড়েন আর পালাতে পারেন না। সামান্য জীবের ভাব পর্যন্ত হয়। ঈশ্বরকোটি না হ'লে মহাভাব প্রেম হয় না। চৈতন্যদেবের হয়েছিল।"

"জ্ঞানযোগ কি? যে পথ দিয়ে স্ব-রূপকে জানা যায়। ব্রহ্মই আমার স্বরূপ, এই বোধ।"

"প্রহ্লাদ কখনও স্ব-স্বরূপে থাকতেন। কখনও দেখতেন, আমি একটি, তুমি একটি, তুমি একটি; তখন ভক্তিভাবে থাকতেন।"

"হনুমান বলেছিলেন, রাম! কখনও দেখি তুমি পূর্ণ, আমি অংশ; কখনও দেখি তুমি প্রভু আমি দাস; আর রাম, যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়—তখন দেখি তুমিই আমি, আমিই তুমি।"

গিরিশ—আহা! সংসারে কি ঈশ্বরলাভ হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—সংসারে হবে না কেন? তবে বিবেক-বৈরাগ্য চাই। ঈশ্বর বস্তু আর সব অনিত্য, দু'দিনের জন্য, —এইটি পাকা বোধ চাই। উপব উপর ভাসলে হবে না, ডুব দিতে হবে!

এই বলিয়া ঠাকুর গান গাইছেন—

ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্নধন।।

"আর একটি কথা। কামাদি কুমীরের ভয় আছে।"

গিরিশ—যমের ভয় কিন্তু আমার নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না, কামাদি কুমীরের ভয় আছে, তাই হলুদ মেখে ডুব দিতে হয়। বিবেক-বৈরাগ্যরূপ হলুদ!

"সংসারে জ্ঞান কারু কারু হয়। তাই দুই যোগীর কথা আছে, গুপ্তযোগী ও ব্যক্তযোগী। যারা সংসার ত্যাগ করেছে তারা ব্যক্তযোগী, তাদের সকলে চেনে। গুপ্তযোগীর প্রকাশ নাই। যেমন দাসী সব কর্ম করছে, কিন্তু দেশের ছেলেপুলেদের দিকে মন পড়ে আছে। আর যেমন তোমায় বলেছি, নষ্ট মেয়ে সংসারের সব কাজ উৎসাহের সঙ্গে করে, কিন্তু সর্বদাই উপপতির দিকে মন পড়ে থাকে। বিবেক-বৈরাগ্য হওয়া বড় কঠিন। আমি কর্তা, আর এ-সব জিনিস আমার—এ বোধ সহজে যায় না। একজন ডিপুটিকে দেখলাম ৮০০ টাকা মাইনে, ঈশ্বরীয় কথা হচ্ছে, সেদিকে মন একটুও দিলে না। একটা ছেলে সঙ্গে ক'রে এনেছিল, তাকে একবার এখানে বসায়, একবার সেখানে বসায়। আর একজনকে আমি জানি, নাম করবো না; জপ করতো খুব, কিন্তু দশ হাজার টাকার জন্য মিথ্যা সাক্ষী দিছিলো। তাই বলছি, বিবেক-বৈরাগ্য হলে সংসারেতেও হয়।"

গিরিশ—এ পাপীর কি হবে?

ঠাকুর উর্ধ্বদৃষ্টি করে করুণস্বরে গান ধরিলেন—

ভাব শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে। নিতান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হবি।।

ভাবলে ভব ভাবনা যাক রে—

তরে তরঙ্গে ভ্রুভঙ্গে ত্রিভঙ্গে যেবা ভাবে।
এলি কি তত্ত্বে, এ মর্ত্যে কুচিত্ত কুবৃত্ত করলে কি হবে রে—
উচিত তো নয়, দাশরথিরে ডুবাবি রে—
কর এ চিত্ত প্রাচিত্ত, সে নিত্য পদ ভেবে।।

(গিরিশের প্রতি)— "তরে তরঙ্গে ভ্রুভঙ্গে ত্রিভঙ্গে যেবা ভাবে।"

"মহামায়া দ্বার ছাড়লে তাঁর দর্শন হয়। মহামায়ার দয়া চাই। তাই শক্তির উপাসনা। দেখ না, কাছে ভগবান আছেন তবু তাঁকে জানবার যো নেই, মাঝে মহামায়া আছেন ব'লে। রাম-সীতা, লক্ষ্মণ যাচ্ছেন। আগে রাম, মাঝে সীতা, —সকলের পিছনে লক্ষণ। রাম আড়াই হাত অন্তরে রয়েছেন, তবু লক্ষ্মণ দেখতে পাচ্ছেন না।

"তাঁকে উপাসনা করতে একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়। আমার তিন ভাব,—সন্তান-ভাব, দাস-ভাব আর সখী-ভাব। দাস-ভাব, সখীভাবে অনেকদিন ছিলাম। তখন মেয়েদের মত কাপড়, গয়না ওড়না পরতুম। সন্তান-ভাব খুব ভাল।

"বীরভাব ভাল না। নেড়া-নেড়ীদের, ভৈরব-ভৈরবীদের বীরভাব। অর্থাৎ প্রকৃতিকে স্ত্রীরূপে দেখা আর রমণের দ্বারা প্রসন্ন করা, এভাবে প্রায়ই পতন আছে।"

গিরিশ—আমার এক সময়ে ঐ ভাব এসেছিল।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ চিন্তিত হয়ে গিরিশচন্দ্রকে দেখতে লাগলেন।

গিরিশ—ঐ আড়টুকু আছে, এখন উপায় কি বলুন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর)—তাঁকে আমমোক্তারি দাও—তিনি যা করবার করুন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছোকরা ভক্তদের কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশাদির প্রতি)—ধ্যান করতে করতে ওদের সব লক্ষণ দেখি। 'বাড়ি করবো' এ বুদ্ধি ওদের নাই। মাগ-সুখের ইচ্ছা নাই। যাদের মাগ আছে, একসঙ্গে শোয় না। কি জানো—রজোগুণ না গেলে, শুদ্ধসত্ত্ব না এলে, ভগবানেতে মন স্থির হয় না। তাঁর উপর ভালবাসা আসে না, তাঁকে লাভ করা যায় না।

গিরিশ—আপনি আমায় আশীর্বাদ করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কই! তবে বলেছি আন্তরিক হ'লে হয়ে যাবে।

কথা বলতে বলতে ঠাকুর 'আনন্দময়ী'! 'আনন্দময়ী'! এই কথা উচ্চারণ করে সমাধিস্থ হয়েছেন। সমাধিস্থ হয়ে অনেকক্ষণ রইলেন। একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বলছেন, 'শালারা, সব কই?' মাস্টার বাবুরামকে ডাকিয়া আনলেন। ঠাকুর বাবুরাম ও অন্যান্য ভক্তদের দিকে চেয়ে প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে

বলছেন, "সচ্চিদানন্দই ভাল! আর কারণানন্দ?" এই বলে ঠাকুর গান ধরিলেন—

এবার আমি ভাল ভেবেছি।
ভাল ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি।।
যে দেশে রজনী নাই, সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।
আমি কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি।।
ঘুম ভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই যোগে যাগে জেগে আছি।
যোগনিদ্রা তোরে দিয়ে মা, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি।।
সোহাগা গন্ধক দিয়ে খাসা রঙ চড়ায়েছি।
মণি মন্দির মেজে ল'ব অক্ষ দু'টি করে কুঁচি।।
প্রসাদ বলে ভুক্তি মুক্তি উভয়ে মাথায় রেখেছি।
(আমি) কালীব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।।

ঠাকুর আবার গান ধরিলেন—

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায়।।
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা তারা সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায়।।
কালী নামের কতগুণ কেবা জানতে পারে তায়।
দেবাদিদেব মহাদেব যার পঞ্চমুখে গুণ গায়।।
দান ব্রত যজ্ঞ আদি আর কিছু না মনে লয়।
মদনের যাগ যজ্ঞ ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায়।।

"আমি মার কাছে প্রার্থনা করতে করতে বলেছিলুম, মা আর কিছু চাই না, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও।"

গিরিশের শান্ত ভাব দেখিয়া ঠাকুর প্রসন্ন হয়েছেন। আর বলছেন, তোমার এই অবস্থাই ভাল, সহজ অবস্থাই উত্তম অবস্থা।

ঠাকুর নাট্যালয়ের ম্যানেজারের ঘরে বসে আছেন। একজন এসে বললেন,—'আপনি বিবাহ বিভ্রাট দেখবেন? এখন অভিনয় হচ্ছে।'

ঠাকুর গিরিশকে বলছিলেন, "একি করলে? প্রহ্লাদচরিত্রের পর বিবাহ বিভ্রাট? আগে পায়েস মুণ্ডি, তারপর সুক্তনি!"

অভিনয়ান্তে গিরিশের উপদেশে নটীরা (Actresses) ঠাকুরকে নমস্কার করতে আসছেন। তারা সকলে ভূমিষ্ঠ হয়ে নমস্কার করল। ভক্তেরা কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে দেখছেন। তাঁরা দেখে অবাক যে, ওদের মধ্যে কেউ কেউ ঠাকুরের পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করছেন। পায়ে হাত দেবার সময় ঠাকুর বলছেন, "মা, থাক থাক; মা, থাক থাক।" কথাগুলি করুণামাখা।

তারা নমস্কার করে চলে গেলে ঠাকুর ভক্তদের বলছেন—"সবই তিনি, এক এক রূপে।"

এই বার ঠাকুর গাড়িতে উঠলেন। গিরিশাদি ভক্তেরা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গমন করে গাড়িতে তুলে দিলেন।

গাড়িতে উঠতে উঠতেই ঠাকুর গভীর সমাধিমধ্যে মগ্ন হলেন!

গাড়ির ভিতরে নারাণাদি ভক্তেরা উঠলেন। গাড়ি দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে যাচ্ছে।

রামকৃষ্ণ কথামৃত/৩য় ভাগ

'চৈতন্যলীলা' রঙ্গালয়ে অভিনয়ের পর কলকাতা তথা বাংলায় প্রেম-ভক্তির অপ্রত্যাশিত ভাবাবেগের বাঁধনহীন প্রবাহে ছোট বড়, ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে অন্তর-চৈতন্যের আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল, যার ফলে পাড়ায় পাড়ায় নাম সংকীর্তনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া আপনা থেকেই দল বেঁধে হতে লাগল। সে এক গভীর আকর্ষণীয় উন্মাদনা আর উৎসাহ। তার উপর ঠাকুর রামকৃষ্ণ নিজে রঙ্গালয়ে এসে সমাজ-অন্ত্যজ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের তারিফ করে নিজ হাতে আশীর্বাদ করে এলেন। এই সব কাহিনী সংকীর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়ে দিল সর্বত্র। ঘর ও বাহির কীর্তনে কীর্তনে-কৃষ্ণ নামে-নিমাই-নিতাইয়ের নামে আকাশে বাতাসে যেন মধু ছড়িয়ে দিল।

'অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক শ্রদ্ধেয় বৈষ্ণব ভক্তপ্রবর শিশির কুমার ঘোষ 'চৈতন্যলীলা' দেখে গিরিশচন্দ্রকে কাছে ডেকে বললেন, গিরিশ, খুব ভাল হয়েছে—এবার তোমার হাতে 'নিমাই সন্ন্যাস' নাটক দেখতে চাই।

সারারাত গিরিশ একলা ঘরে ধ্যানে নিবিষ্ট—মহাত্মা শিশিরকুমারের নির্দেশ, তাঁর ভালবাসার আবদার 'নিমাই সন্ন্যাস' নাটক রচনা করতেই হবে।

যথাকালে অনেক ভেবে চিন্তে তাঁর ধ্যানের মঞ্চে 'তারকনাথ'কে ডেকে ডেকে অবশেষে 'নিমাই সন্ন্যাস' নাটক রচনা করলেন গিরিশচন্দ্র। 'স্টার থিয়েটারে' অভিনীত হল—**নিমাই হলেন শ্রীমতি বিনোদিনী আর নিতাই হলেন শ্রীমতি বনবিহারিনী।**

নিমাই সন্ন্যাস

নিমাইয়ের এই সন্ন্যাস পর্বে অধ্যাত্ম-বোধের রস দর্শকদের নাটকের অভিনয়ের মধ্যে অনুভূত তেমনভাবে আকর্ষণ করতে না পারলেও গিরিশচন্দ্র তার অনেকটা গানের মধ্য দিয়ে কিছুটা প্রকাশ করতে পেরেছেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও 'নিমাই সন্ন্যাস' নাটক দেখেছেন এবং অধ্যাত্ম-ভাব তন্ময়তায় দু'হাত বাড়িয়ে গিরিশচন্দ্রকে আলিঙ্গন করেছিলেন—

গিরিশচন্দ্র এরপর *'প্রভাসযজ্ঞ'* নাটকটি অত্যন্ত করুণ রস-সিক্ত অন্তর আচ্ছন্ন করে রচনা করেছিলেন। দর্শক সমাজে নাটকটির মূল রসটি তেমনভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়নি—কিন্তু গিরিশচন্দ্রের ব্যবহৃত ভাষায় করুণ

প্রভাসযজ্ঞ

রসের প্রবাহ বিশেষভাবে গানের ভাষায় হৃদয়কে খুবই স্পর্শ করেছিল। যশোদা-রাধিকা থেকে শুরু করে শ্রীদাস-সুদাম চরিত্র চিত্রনে গিরিশচন্দ্র তাঁর অন্তরের প্রছন্ন বিরহ বেদনাকে রূপ দিয়েছেন।

'প্রভাসযজ্ঞ' নাটকের গানগুলি এমনভাবে সাধারনের কণ্ঠে ঘুরে ঘুরে রস-বিন্যাস করতো যে গিরিশচন্দ্র ঘরে যেতে, ঘর থেকে বাইরে যেতে-পাড়া তথা রাস্তায় গানের কলি দিয়ে তাকে জানান দিত।

তারপর গিরিশচন্দ্র একটা নতুন বিষয় ও চরিত্রের সন্ধানে অনেক পড়াশোনা করতে করতে স্যার এডুইন আরনল্ডের অবলম্বনে ভগবান বুদ্ধদেবের উপর *'বুদ্ধদেব চরিত্র'* নাটক রচনা করলেন।

বুদ্ধদেব চরিত্র

'বুদ্ধদেব চরিত্র' নাটক অভিনীত হবার পর দর্শক সমাজে এবং বুদ্ধিবাদী তথাকথিত ভদ্র বাবুদের অন্তরে গিরিশচন্দ্র গভীর প্রভাব ফেলেছিলেন অভিনয়ের কলা কৌশল প্রয়োগে। গিরিশচন্দ্র এর আগে প্রেম-ভক্তির কথা বলে বঙ্গদেশকে ভাসিয়েছেন—এবং এবার ধ্যানের শান্ত রসের সর্বগ্রাসী আকর্ষণ যেন নতুন মাত্রায় গিরিশচন্দ্র তার অন্তরলোকের সংবাদ পরিবেশন করালেন। নাটকে সিদ্ধার্থ চরিত্রের কণ্ঠে —

জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই
কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই।
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি
কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই।।
কে খেলায়, আমি খেলি বা কেন?
জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন।
এ কেমন ঘোর হবে নাকি ভোর
অধীর অধীর যেমতি সমীর অবিরাম গতি নিয়ত ধাই।
জানি না কেবা এসেছি কোথায়,
কেন বা এসেছি, কোথা নিয়ে যায়,
যদি ভেসে ভেসে কত কত দেশে
চারিদিকে গোল উঠে, নানা রোল।
কত আসে যায়, হাসে কাঁদে গায়
এই আছে আর তখনি নাই।।
কি কাজে এসেছি কি কাজে গেল
কে জানে কেমন কি খেলা হল।
প্রবাহের বারি বইতে কি পারি

যাই-যাই-কোথা? কূল কি নাই?
কর হে চেতন, কে আছ চেতন,
কত দিনে আর ভাঙ্গিবে স্বপন?
কে আজ চেতন ঘুমা'ওনা আর
দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার
কত তম নাশ হও হে প্রকাশ
তোমা বিনে আর নাহি উপায়
তব পদে তাই শরণ চাই।।

এই গানটি যেন দর্শকের জড় দেহ থেকে আত্মায় উত্তরণের জন্য আকুল আর্তি! এই ধরণের বৈরাগ্যের আকুল ব্যাকুলতা-এক মুহূর্তে সমস্ত জগৎ সংসারকে তুড়ি মেরে অনন্তে মিশে যাবার ভীম-শক্তিতে উৎসারিত। গিরিশচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনের প্রতিটি ঘটনার ভেতরকার প্রচ্ছন্ন আকাঙ্ক্ষার প্রত্যক্ষ প্রকাশ।

'বুদ্ধদেবচরিতের' সিদ্ধার্থের কণ্ঠে গানটি শোনার জন্য নরেন্দ্রনাথ দত্ত (বিবেকানন্দ) 'স্টারে' এসে নাটকটি দেখেছিলেন—গানটির ভাষা ও ভাব তাঁকে এমনভাবে প্রভাবিত করল যে, সময় সুযোগ পেলে এই ধূসর জীবনের অসার আকর্ষণ থেকে পালিয়ে যেতে উদাস হয়ে যেতেন—

....নরেন্দ্রনাথ যখন এই গানটি গভীর রাত্রিতে শয্যাত্যাগ করে সিমলার গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীটস্থ বাড়ীর দালানে আপনার মনে পায়চারী করতে করতে গাইতেন, তখন তাঁর মুখ হতে গানটি এমন শ্রুতিমধুর হত যে, বাড়ীর আশে পাশের ঘরের নিদ্রিত ব্যক্তিরা নিদ্রাত্যাগ করে স্থির হয়ে শুনতেন। সুর তাল রাগের কথা নয়, কিন্তু ভেতরের প্রাণ থেকে ঠিক নিজের অবস্থাটা প্রকাশ করে তিনি জীবন্তভাবে গানটি গাইতেন।

....যাঁরা নরেন্দ্রনাথের মুখে রাত্রিতে সেই গান শুনতেন তাদের তখন আর বাহ্যজ্ঞানের কিছু থাকত না—সংসারের মায়া মমতা ভুলে গিয়ে কোথায় সেই অসীম জগতে প্রবেশ করতেন।

স্বামী বিবেকানন্দ স্বামীজির
জীবনের ঘটনাবলী - তৃতীয় ভাগ।

সর্বজীবে দয়া—অহিংসা সাধনার সত্যকে বুদ্ধ তাঁর জীবনের একমাত্র মন্ত্র বলে অনুভব করেছিলেন—গিরিশচন্দ্র সেই সত্যকে সর্বসাধারণের ভাব ও চিন্তায় প্রকাশ্যে অনুরণিত করার সব রকম প্রক্রিয়ায় নাটকের ভাষা—অভিনয় তথা পরিবেশ—যুক্ত করেছেন।

'বুদ্ধদেব চরিত' নাটকটি দেখে পুত্র শোকাতুর পিতা শাশ্বত সত্যের অনির্বচনীয় অনুভূতির স্পন্দনে পুত্রশোক জয় করেছেন—ছুটে গিয়ে গিরিশচন্দ্রের পদযুগল ধরে অন্তরের শ্রদ্ধা জানিয়ে গেলেন।

মৃত্যু অনিবার্য—তাতে দুঃখ আছে, বেদনা আছে—আছে আর্তনাদ—কিন্তু তাতে ভেঙ্গে পড়লে চলবে না— বেদনাকে ধৈর্য্য দিয়ে বরণ করতে হবে, প্রণতঃ হতে হবে বেদনা-শোকের অদৃশ্যচরণে, তবেই শোক-তাপ থেকে অমৃতময় সত্যের আলোকিত প্রবাহে অবগাহন করা সম্ভব হবে।

'বুদ্ধদেব চরিত' এ পুত্র হারা মায়ের বেদনা এবং তা থেকে উত্তরণের কাহিনীর করুণ-সিক্ততা দর্শকদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। ঘটনা সকলের কম-বেশী জানা—কিন্তু চোখের সামনে জীবন্ত রূপকল্পে প্রতিটি ঘটনা যখন ঘটানো হচ্ছে নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে তখন দর্শক আলাদাভাবে নিজেকে অনুভব করতে পারছেন—মিশে গেছেন পুত্রহারা মায়ের সঙ্গে—যেন নিজস্ব কথা, একান্ত গোপন, অত্যন্ত আপন কথা।

নাটকের কাহিনীর উৎস যাঁর বই থেকে গিরিশচন্দ্র গ্রহণ করেছিলেন সেই সময় স্যার আরনল্ড সাহেব কলকাতায় এসেছিলেন—বিভিন্নভাবে 'বুদ্ধদেব চরিতের' কথা শুনে নিজে 'স্টার থিয়েটারে' নাটকটি দেখতে গিয়েছিলেন। নাটক শেষ হবার পর তিনি কাউকে না জানিয়ে থিয়েটারের বাইরে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করে নিজের পরিচয় জানিয়ে নাটকের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। গিরিশচন্দ্র মুগ্ধ, আনন্দিত হয়ে আরনল্ড সাহেবকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আমি আপনার কাছে ঋণী।'

গিরিশচন্দ্রের আপন সত্তায় রামকৃষ্ণ পরমহংসের ছায়া ধীরে ধীরে আছন্ন হয়ে প্রাণময় চেতনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। ব্যবহারিক জীবনের সাথে দীর্ঘদিন যে বিরোধ ছিল তা ঘুচে যাচ্ছে নানা ঘাত প্রতিঘাতের অনিবার্যতায়, আর তখনই ঠাকুর পরমহংসদেবের কথা, তাঁর সরল স্বচ্ছ পরিছন্ন প্রাণখোলা হাসির হৃদয়ভেদী দখলদারীর কাজ অত্যন্ত গভীরে কাজ করে চলেছে গিরিশচন্দ্রের অন্তরে। গিরিশচন্দ্র বুঝতে পারতেন—বুঝতে পারতেন কে যেন কোথা থেকে কোন এক অদৃশ্য টানে তাকে বিশেষ একটি স্থানের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্রের 'স্টার থিয়েটারে' কয়েকবার এসেছেন—'চৈতন্যলীলা'—'নিমাই সন্ন্যাস'—'বুদ্ধদেব চরিত'—নাটক দেখতে—সেসময় থেকেই গিরিশের ঘরের দরজায় বার বার—"খোল, খোল, আমি এসেছি— তোর কাছে এসেছি—'চেয়ে দ্যাখ গিরিশ'—এই কথাগুলি যেন অদেখা স্পর্শে মনের ভেতর থেকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে অনবরত। গিরিশ কেমন যেন মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে সেই

'সকল স্নেহমাখা আকুলতাভরা আশ্রয়দাতার উদার আহ্বানের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতেন। ভুলে যেতেন সংসার জীবনের দৈহিক বোধের চাওয়া পাওয়া। শৈশবে মাতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত—পাড়ার বখাটে রোয়াকবাজদের গুরু হয়ে অনবরত অপরিচ্ছন্ন—অসন্তোষজনিত কাজ করেছেন। এতটুকু স্নেহ-কাতরতার সুখস্পর্শ আকাংখিত হৃদয়ে অনুভব করতে পারেন নি। অনেকটা শুষ্ক-বদ মেজাজে জীবনের ভাল মন্দ বিচার না করে অবিশ্বাসের দাপটে পাড়ায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। এমনি ধারায় রোগ যন্ত্রণায় 'তারকনাথ'—'মা কালী'র বিষয়ে আকর্ষণ তথা আন্তরিক বিশ্বাস থেকে জাগ্রত ভক্ত মনের প্রকাশ গিরিশচন্দ্রকে ধীরে ধীরে তৈরী করতে ইন্ধন জুগিয়েছিল। তারপর নাটক—নাট্যকার—নট সব একই সাথে দুর্বার গতির প্রবাহে গিরিশচন্দ্র অদেখা অকুলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন—কিন্তু অন্তর শক্তির বিপুলতায় সন্তরণের মাধ্যমে ধীরে ধীরে কুলের নিশানায় এগিয়ে চললেন—তখন পেছনপানে সেই বদমেজাজী অপরিচ্ছন্ন মানসিকতা ধীরে ধীরে দূরে সরে যেতে লাগল। ঠিক এমনি মানসিক কারণে গিরিশচন্দ্র পরম করুণাময়ের আশ্রয় লাভ করলেন—ঠাকুর রামকৃষ্ণ দুয়ারে এসে নিজ হাতে ধরে তুললেন—গিরিশকে। জগতে যত স্নেহের অমৃত ভান্ডার সবটুকু উজাড় করে ঢেলে দিলেন ঠাকুর পরমহংস তাঁর প্রিয় গিরিশকে। এ বিষয়ে গিরিশচন্দ্র নিজেই মুগ্ধ বিস্ময়ে একটি প্রবন্ধে ঠাকুর রামকৃষ্ণের সাথে তাঁর অন্তরঙ্গতার অকৃত্রিম অনুগত্যভরা ব্যাকুলতায় লিখলেন—

> প্রবন্ধ লিখবার ভার যখন আমার উপর অর্পন করা হল, তখন ভাবলাম, অতি সহজ কার্যই অর্পন করা হয়েছে, কিন্তু এখন কার্যে দেখি যে, এ প্রবন্ধ লেখা অতি কঠিন। সহজ ভেবেছিলাম, তার কারণ এই যে, আমি তাঁর অপার স্নেহ উপলব্ধি করেছি, প্রত্যেক শিষ্যের থেকে সেই অপার স্নেহের কথা শুনেছি। অনেক সময়ে মুগ্ধচিত্তে সেই সকল পরস্পর আলোচনা করেছি, যে কোনও শিষ্য তাঁর প্রতি পরমহংসদেবের স্নেহের ব্যবহার যখন বর্ণনা করতেন, অমনি প্রতিঘাতে হৃদয়ে শত প্রস্রবণ উন্মুক্ত হত, শত শ্রোত বহিত, শিষ্যের কথায় যত না হোক, মুগ্ধ ভাব-ভঙ্গীতে এবং তাঁর সঙ্গে আমার অন্তরের সম অবস্থায়।
>
> তৎকালীন তা যেন সম্যক অনুভূত হত। একটি কথা, যা শিষ্য বলতেন, একটি কার্য যা বর্ণনা করতেন, সেরূপ স্নেহময় কথা, আমিও শুনেছি, আমিও সেরূপ স্নেহময় কার্যের শত শত দৃষ্টান্ত পেয়েছি, শিষ্যকে বেশী বলতে হতো না। একটি কথা বলে শিষ্য ভাবত যেন কত বলে ফেলেছে, আমিও ভাবতাম— যেন কত শুনলাম। আমি যে কথা বলতে চাইছি, আমি তা সম্পূর্ণ বলতে পারলাম কি না, তা বুঝতে পারছি না, কিন্তু শ্রোতৃবর্গকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করলে বোধহয় কতক যেন আমার মনোভাব বোঝাতে পারব। আমার জিজ্ঞাস্য, তাঁর প্রতি তাঁর মাতৃস্নেহ কিরূপ বর্ণনা করুন। আমায় এ কথা জিজ্ঞাসা করলে, আমি গুটিকত কথা মাত্র বলতে পারব,— এই মাত্র

বলব—"আহা মাতৃস্নেহ—মাতৃ-স্নেহ!" মাতার প্রতি কার্যে, প্রতি দৃষ্টিতে, প্রতি ব্যবহারে, যা আমার অনুভূত হয়েছে, তা কথায় বর্ণনা করা সাধ্যাতীত। একটা কথা আছে, পুত্রসন্তান হলে পিতৃঋণ শোধ যায়; তার অর্থ আমি এই বুঝি, যে পিতৃস্নেহ আমাদের পুত্র না হলে, আমরা কোনরূপে বুঝতে পারি না। মাতৃস্নেহ বোঝা একেবারে অসম্ভব। কিন্তু যদি মাতৃস্নেহ বোঝা কখনও সম্ভব হয়, পরমহংসদেবের স্নেহ বুঝবার কোনও উপায় নেই। আমরা মায়িক অবস্থায় অবস্থিত, পিতৃমাতৃস্নেহ মায়িক স্নেহ বললে বলা যায়। অনেক স্থলেই মায়িক স্নেহ, সন্তানের ঐহিক সুখই তাঁদের কামনা, সন্তানের সাংসারিক উন্নতি তাঁরা দেখতে চান। এরূপ দেখতে পাওয়া যায় যে, পারত্রিক উন্নতির আশায় যদি পুত্র সংসার-কার্যে মনোনিবেশ না করে, তা পিতামাতার বিরক্তির কারণ হয়, সমস্ত সদ্‌গুণ সম্পন্ন হলেও যদি বিবাহ করতে না চায়, তাতে পিতামাতা অসন্তুষ্ট হন, উপদেশ দিয়ে থাকেন যে, পারত্রিক উন্নতির সময় আছে, সংসার-ধর্ম শেষ করে তারপর পারত্রিক কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। পুত্র তাঁদের এই উপদেশ না শুনলে যদিও স্পষ্ট মুখে বলতে পারেন না যে, পুত্র কুপথগামী হয়েছে, কিন্তু সে পুত্র যে কার্যের বাইর, একথা বলে বন্ধু-বান্ধবগণের কাছে আক্ষেপ করেন। পিতামাতার স্নেহে কখনও স্বার্থ দেখা যায়। পিতাকে গুণবান সন্তানের পক্ষপাতী হতে দেখা যায়। যতদিন পুত্রের অসহায় বালক অবস্থা, ততদিন পিতা-মাতা নিঃস্বার্থ। কিন্তু অনেক পিতামাতাই আশা করেন যে, পুত্র হতে তাঁদের বৃদ্ধকালের বিশেষ কার্য হবে। নির্গুণ সন্তানের প্রতি মাতৃস্নেহ অধিক, কিন্তু গুণবান সন্তানের গুণই কখনও কখনও মাতার স্নেহের ত্রটির কারণ হয়। পিতৃমাতৃ-স্নেহ অতি উচ্চ স্নেহ, কিন্তু একেবারে স্বার্থ স্পর্শ নেই, একথা বলা যায় না। পিতা মাতার স্নেহের আভাস কতক পাওয়া যায়, কিন্তু পরমহংসদেবের স্নেহ—এ নিঃস্বার্থ স্নেহ—কিরূপে অনুভব করব এবং কি কথায় বা বর্ণনা করব। স্বার্থ শূন্য অবস্থা ব্যতীত অর্থাৎ মায়া-মুক্ত অবস্থা ব্যতীত, অমায়িক কার্য বোঝা যায় না। তাঁর ন্যায় যদি মায়াশূন্য অবস্থা প্রাপ্ত হতাম, এবং আমার শিষ্য থাকত, শিষ্যের প্রতি পরমহংসদেবের স্নেহ বুঝবার কতক শক্তি হতো; কিন্তু বর্ণনা করবার শক্তি হত কি না জানি না। অপরাপর শিষ্যের কাছে তাঁর স্নেহের কথা যা শুনেছি, তা আপনার অবস্থা মিলিয়ে কতক বুঝেছি সত্য, কিন্তু অন্যের অন্তরের কথায় বর্ণনা করা যায় না। আমি আপনার অন্তরের কথা, আমি নিজে বুঝি কি না সন্দেহ, অন্যের অন্তরের কথা দুর্বোধ্য। অতএব এ প্রবন্ধে আমার আপনার কথা পরমহংসদেবের স্নেহ, আমার কিরূপ অনুভূত হয়েছে, সেটাই বর্ণনা করব। তদ্ব্যতীত আমি নিরুপায়! আপনার কথা বলব, শ্রোতৃবর্গ অবস্থা বুঝে অনুকম্পায় মার্জনা করবেন।

আর এক কথা— পরমহংসদেবের কাছে যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁরা সকলে শিষ্ট শান্ত ও ধর্মপরায়ণ। নরেন্দ্র প্রভৃতি যাঁরা তাঁর স্বগণের গণ্য, তাঁরা নির্মল বালক বয়সে প্রভুর নিকট যান ও প্রভুর স্নেহে আবদ্ধ হয়ে পিতামাতা ভুলে প্রভুর কার্যে

নিযুক্ত হন। তাঁদের প্রতি প্রভুর স্নেহ বর্ণনায়, তাঁর প্রকৃত স্নেহ হয় তো বুঝানো যাবে না। পবিত্র বালকবৃন্দ সমস্ত পরিত্যাগ করে শরণাপন্ন হয়েছে, এতে স্নেহ জন্মাবার কথা। কিন্তু আমার প্রতি স্নেহ, অহেতুকী দয়াসিন্ধুর পরিচয়। ভগবানের একটি নাম পতিতপাবন, মানব-দেহে সে নামের সার্থকতা আমিই দেখেছি। পতিতপাবন রামকৃষ্ণ আমায় স্নেহ করেছেন, সেই নিমিত্ত আমার প্রতি স্নেহের কথা বলতে প্রবৃত্ত হলাম। পরমহংসদেবের কাছে যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ চঞ্চল প্রকৃতি থাকতে পারেন, কিন্তু আমার তুলনায় সকলেই সাধু। কারো কখনও বা পদস্খলন হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু আমার গঠনই স্বতন্ত্র, সোজা পথে চলতে জানতাম না। পরমহংসদেবের স্নেহের বিকাশ আমাতে যেরূপ পেয়েছে, সেরূপ আর অন্য কোথাও হয় নি। প্রবন্ধ শ্রবণে কতক আভাস পাইবেন।

যে সময় পরমহংসদেব আমায় আশ্রয় প্রদান করেন, তখন আমি হৃদিদ্বন্দ্বে বিকলিত। পূর্বের শিক্ষা-দীক্ষা, বাল্যকাল হতে অভিভাবক শূন্য হয়ে যৌবন সুলভ চপলতা—সমস্তই আমায় ঈশ্বর-পথ হতে দূরে নিয়ে যাচ্ছিল। সেসময়ে জড়বাদী প্রবল, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা এক প্রকার মূর্খতা ও হৃদয় দৌর্বল্যের পরিচয়; সুতরাং সমবয়স্কের নিকট একজন কৃষ্ণ-বিষ্ণু বলে পরিচয় দিতে গিয়ে, ঈশ্বর নেই—এই কথাই প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করা হতো। আস্তিককে উপহাস করতাম, এবং এ পাত ও পাত বিজ্ঞান উল্টিয়ে স্থির করা হলো, যে ধর্ম কেবল সংসার রক্ষার্থ কল্পনা, সাধারণকে ভয় দেখিয়ে কুকার্য হতে বিরত রাখবার উপায়। দুষ্কর্ম—ধরা পড়লেই দুষ্কর্ম। গোপানে করতে পারা বুদ্ধিমানের কার্য, কৌশলে স্বার্থ-সাধন করাই পাণ্ডিত্য, কিন্তু ভগবানের রাজ্যে এ পাণ্ডিত্য বহুদিন চলে না। দুর্দিন—অতি কঠিন শিক্ষক সেই শিক্ষকের তাড়নায় শিখলাম যে, কুকার্য গোপন রাখবার কোনও উপায় নেই—"ধর্মের ঢাক আপনি বাজে।" শিখলাম বটে, কিন্তু কার্যজনিত ফলভোগ আরম্ভ হয়েছে, নিরাশব্যঞ্জক পরিণাম মানসপটে উদয় হয়েছে। শাস্তি আরম্ভ হয়েছে মাত্র, কিন্তু শাস্তি এড়াইবার কোনও উপায় দেখছি না। বন্ধু-বান্ধবহীন, চতুর্দিকে বিপজ্জাল, দৃঢ়পণ শত্রুসর্বনাশের চেষ্টা করছিলেন এবং আমারই কার্য তাদের সম্পূর্ণসুযোগ প্রদান করেছে। উপায়ান্তর না দেখে ভাবলাম—ঈশ্বর কি আছেন? তাঁকে ডাকলে কি উপায় হয়, মনে মনে প্রার্থনা করলাম—"হে ঈশ্বর, যদি থাক এ অকূলে কূল দাও।" গীতায় ভগবান বলেছেন,—" কেহ কেহ আর্ত হয়ে আমাকে ডাকে, তাকেও আমি আশ্রয় দিই।" দেখলাম গীতার কথা সম্পূর্ণ সত্য। সূর্যোদয়ে অন্ধকার যেরূপ দূর হয়, অচিরে আশাসূর্য উদয় হয়ে হৃদয়ান্ধকার দূর করল। বিপদ-সাগরে কূল পেলাম। কিন্তু এতদিন সন্দেহ পোষণ করে আসছি, ঈশ্বর নেই অনেক তর্ক করেছি, তার সংস্কার কোথায় যাবে? কার্য-কারণ সম্বন্ধ-বিচার করতে লাগলাম, দেখলাম এই কাজ হতে এই কারণ উপস্থিত হয়ে আমাকে বিপদ হতে মুক্ত করেছে। সন্দেহ হয়, কিন্তু একেবারে ঈশ্বর নাই—তা আর জোর করে বলতে সাহস হয় না। অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি জন্মিল,

ঘটনাস্রোতে কখনো বিশ্বাস আনে—কখনো সন্দেহ আনে,—এ বিষয়ে যাঁদের সঙ্গে আলোচনা করি, তাঁরা সকলেই এক বাক্যে বলেন, যে, গুরু-উপদেশ ব্যতীত কিছুই হবে না। কিন্তু মানুষকে গুরু বলতে তর্ক-বুদ্ধি সম্মত হল না। বিশষতঃ গুরুকে "গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ" বলে প্রণাম করতে হয়, এ প্রণাম মানুষকে কিভাবে করব, এ তো চাতুরী! কিন্তু সন্দেহের বিষম তাড়না! হৃদয়ে ঘোর দ্বন্দ্ব উপস্থিত। সে অবস্থা বর্ণনাতীত, সহসা চক্ষু বন্ধন করে নিয়ে গিয়ে জনশূন্য অন্ধকার গৃহে আবদ্ধ করে রাখলে যেরূপ অবস্থা হয়, আমার তৎকালিক অবস্থার সঙ্গে সে অবস্থার কতক তুলনা হতে পারে। চিন্তার তাড়নায় কখনো কখনো শ্বাস-রোধ হয়ে যায়। দুষ্কর্মের স্মৃতি মুহুর্মুহু জ্বলে উঠে, ও হৃদয়ান্ধকার আরও গাঢ় করে তোলে! এই সময়ে, পরমহংসদেব আমায় দর্শন দেন। আমি আমাদের পল্লীর চোমাথায় একজন ভদ্রলোকের রকে বসে আছি, এমন সময় পরমহংসদেব তাঁর দুই একটি ভক্ত সমভিব্যাহারে পূর্বদিকের রাস্তা হতে ৺বলরাম বসুর বাড়ী যাবার জন্য আসছেন। ইতিপূর্বে 'স্টার থিয়েটারে' তিনি আমার "চৈতন্যলীলা" অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন। "নারায়ণ" নামে একজন ভক্ত, আমাকে দূর হতে দেখিয়ে দিয়ে যেন কি বলল;—উনি তৎক্ষণাৎ আমাকে নমস্কার করলেন। আমারই সম্মুখ দিয়ে ৺বলরামবাবুর বাটী চললেন।

কিয়দ্দুর এগিছেন, আমার বোধ হতে লাগল কি যেন টানছে, আমি সে টানে স্থির হতে পারছি না। সে যে কি অবস্থা, আমি বলতে পারি না, কোনও আত্মীয়ের কাছে যাবার ইচ্ছা যেমন, তা নয়, এ এক নূতন রকম। এ-টান আমার পূর্বে কখনো হয় নি। আমি যাব কি না যাব, ভাবছি, এমন সময় তাঁর একজন ভক্ত তাঁর কাছ হতে এসে আমাকে বলরামবাবুর বাটী যেতে আহ্বান করলেন। আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ চললাম। বলরামবাবুর বৈঠকখানায় পরমহংসদেব বসলেন, আমিও বসলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, "মহাশয়, গুরু কি?" তিনি বললেন, "তোমার গুরু হয়ে গিয়েছে—গুরু কি জানো?"— যেন ঘটক! মিলিয়ে দেয়, ঈশ্বর-লুব্ধ-চিত্ত ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়।" তাঁর কথা কত দূর বুঝলাম, তা জানি না, কিন্তু পরম শান্তি হল। নানা কথা হতে লাগল, যেন কে আপনার লোক কথা বলছেন; অল্পপূর্বে আলাপ হয়েছে, কিন্তু তাঁর কথায় প্রকাশ হতে লাগল, যেন বহু দিনের আলাপ। তিনি আর একদিন তাঁকে থিয়েটার দেখাতে অনুরোধ করলেন। আমিও স্বীকৃত হলাম। স্থির হল, "প্রহ্লাদ চরিত্র" দেখতে যাবেন।

"প্রহ্লাদ চরিত্র" অভিনয়ের দিন, তিনি থিয়েটারে আসলেন। তাঁকে কিরূপ দেখলাম, তা আমি বলতে পারছি না, সেদিন কথায় কথায় তিনি আমাকে বললেন, যে, তোমার মনে আড় আছে। আমি ভাবলাম আছেই তো। জিজ্ঞাসা করলাম—'এ আড় কিসে যায়?" তিনি উত্তর করলেন,—"বিশ্বাস করো।"

তার পর ৺রাম দত্তের বাড়ীতে তিনি আসবেন একটু চিরকুট পত্রে সংবাদ পাই।

সংবাদ পাইবামাত্র পূর্বে যেরূপ আকর্ষিত হয়েছিলাম বলেছি, সেইরূপ আকর্ষিত হলাম। রামবাবুর বাড়ী গিয়া, পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা করলাম— "আমার কি হবে?" তিনি বললেন—"খুব হবে।" "আমার মনের আড়?" প্রভু বললেন— 'থাকবে না।" আমি প্রণাম করে চলে আসলাম।

এক এক দিন দর্শন লাভে, আমার মনে উদয় হল, এ ব্যক্তি কে? আমার সম্পূর্ণ পরিচয় ইনি কি পাননি! বোধ হয়; —নচেৎ এরূপ আপনি ভেবে কথা কেন কন। কথায় মনে হয়, পরম আত্মীয়। ইনি কে? আমার মধ্যে সাহস জন্মেছে, যে ইনি কাহকেও ঘৃণা করতে জানে না। আমি তাঁকে আত্মপরিচয় দিলে, ইনি আমাকে ঘৃণা করবেন না। বরং আত্মপরিচয় দিলে আমার পরম মঙ্গল হবে। আমি দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে তাঁর চরণে আশ্রয় নেব। ইনি শান্তিদাতা নিশ্চয়।

দক্ষিণেশ্বর গেলাম। প্রভু বসে আছেন, ভবনাথ নামে একজন শিষ্যের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। আমি গিয়ে প্রণাম করা মাত্র, যেন কে পরমাত্মীয় গিয়েছে, তিনি বললেন, —"এই তোমার কথা আমি বলছিলাম, সত্যি, জিজ্ঞাসা করো।" একটি উপদেশের কথা বলতে আরম্ভ করলেন, আমি, যেমন বাপের কাছে আব্দার করে, সেইরূপ আব্দার করে বললাম, আমি উপদেশ শুনব না, আমি অনেক উপদেশ লিখেছি, আপনি আমায় কিছু করে দেন।" এ কথায় বোধ হলো, যেন তিনি পরম সন্তুষ্ট হলেন, ঈষৎ হাস্য করলেন। সে হাসি দেখে আমার মনে হলো, আমার মনে আর ময়লা নেই, আমি নির্মল হয়েছি। আসবার সময় জিজ্ঞাসা করলাম, —"মহাশয়, আপনাকে দর্শন করে গেলাম, আবার কি যে কার্য করছি, তাই করব?" তিনি বললেন, 'করো।' আমার মন তখন আনন্দে পরিপ্লুত! যেন নূতন জীবন পেয়েছি। পূর্বের সে ব্যক্তি আমি নই, হৃদয়ে বাদানুবাদ নেই। ঈশ্বর সত্য, ঈশ্বর আশ্রয়দাতা, এই মহাপুরুষের আশ্রয় লাভ করেছি, এখন ঈশ্বর লাভ আমার অনায়াস সাধ্য— এই ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে দিন-যামিনী যায়। শয়নে-স্বপনেও এই ভাব, —পরম সাহস, পরমাত্মীয় পেয়েছি, আমার সংসারে আর কোন ভয় নেই। মহাভয়—মৃত্যু-ভয়—তাও দূর হয়েছে।

আমি তো এইরূপ ভাবি। এদিকে পরমহংসদেবের কাছ থেকে যে ব্যক্তি আসেন, তাঁরই মুখে শুনি, যে প্রভু আমার কথা কতই বলেছেন। যদি কেউ আমার নিন্দা করে, খুঁজে নিন্দা করতে হয় না, তিনি তৎক্ষণাৎ বলেন,—'না, জান না, ওর খুব বিশ্বাস।'

মাঝে মাঝে থিয়েটারে আসেন। দক্ষিণেশ্বর থেকে, আমাকে খাওয়াবার জন্য খাবার নিয়ে আসেন। প্রসাদ না হলে, আমার খেতে রুচি হবে না, সেই জন্য মুখে ঠেকিয়ে আমাকে খেতে দেন। আমার ঠিক বালকের ভাব হয়, পিতা মুখ থেকে খাবার দিচ্ছেন, আমি আনন্দে তা ভোজন করি।

একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছি, তাঁর ভোজন শেষ হয়েছে, আমায় বললেন,— "পায়েস খাও।" আমি খেতে বসেছি, তিনি বললেন,— "তোমায় খাইয়ে দি।" আমি বালকের ন্যায় বসে খেতে লাগলাম। তিনি কোমল হাতে আমাকে খাইয়ে দিতে

লাগলেন। মা যেমন চেঁচেপুঁছে খাইয়ে দেন, সেইরূপ চেঁচেপুঁছে খাইয়ে দিলেন। আমি যে বুড়ো ধাড়ি, তা আমার মনে রইল না। আমি মায়ের বালক, মা খাইয়ে দিচ্ছেন,—এই মনে হল। যখন মনে হয় যে অনেক অস্পর্শীয় ওষ্ঠে আমার ওষ্ঠ স্পর্শিত হয়েছে, সেই ওষ্ঠে তিনি নির্মল হস্তে পায়েস দিয়েছেন, তখন যেন আত্মহারা হয়ে ভাবি, এ ঘটনা কি সত্য হয়েছিল, না স্বপ্নে দেখেছি! একজন ভক্তের মুখে শুনেছিলাম যে তিনি দেব-দৃষ্টিতে আমাকে উলঙ্গ-বালক দেখেছিলে। সত্যই আমি তাঁর কাছে গিয়ে, যেন নগ্ন-বালকের ন্যায় হতাম। যে সকল দব্য আমার রুচিকর, তিনি কিরূপে জানতেন, তা আমি জানি না, সেই সকল দ্রব্য, আমাকে সম্মুখে বসিয়ে খাওয়াতেন। স্বহস্তে আমাকে জল ঢেলে দিতেন। আমি বর্ণনা করছি মাত্র, কিন্তু আমি তাঁর স্নেহ প্রকাশ করতে পারছি কি না—জানি না। বোধ হয় আমার সম্পূর্ণ অনুভব হচ্ছে না,—সম্পূর্ণ অনুভব হলে, যা বলছি, বলতে পারতাম না, ক্বচিৎ কখনো সে ভাব উদয় হলে, জড় হয়ে যাই।

তাঁকে পরম আত্মীয় জেনেছি, কিন্তু সংস্কার-বন্ধন অতি দুশ্ছেদ্য। এক দিন থিয়েটারে মত্ততা বশতঃ কতই অকথ্য কথনে তাঁকে গালি দিলাম, তাঁর ভক্তেরা রেগে গিয়ে আমাকে শাস্তি দিতে উদ্যত, তিনি নিবারণ করে রেখেছেন। আমারও তত কবিতার মুখ চলছে। আমি তাঁকে জেদ করে ধরেছি "তুমি আমার ছেলে হও।" তিনি বলেন, —"কেন? তোর গুরু হব,—ইষ্ট হব।" আমি বলি,—"না তুমি ছেলে হও।" তিনি বলেন—"আমার বাপ অতি নির্মল ছিলেন,—আমি তোর ছেলে কেন হব?" আমার মুখের তোড় যতদূর চলে—চলল। তিনি দক্ষিণেশ্বরে ফিরে গেলেন। আমার মনে কিছু মাত্র শঙ্কা নেই! আদুরে গোপাল, বখাটে ছেলে—যেরূপ বাপকে গালি দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে, আমিও পরমহংসদেবের আদরে, বখাটে ছেলের মত কাজ করে নির্ভয়ে রইলাম। পরে অনেকে অনেক বলতে লাগল; কাজ ভাল হয় নি—ক্রমে বুঝলাম; কিন্তু তত্রাচ পরমহংসদেবের স্নেহের উপর আমার এত নির্ভর তাঁর স্নেহ এত অসীম যে তিনি আমায় পরিত্যাগ করবেন—এ আশঙ্কা একবারও জন্মাল না। দক্ষিণেশ্বরে অনেকেই তাঁকে বলতে লাগল, যে, ওরূপ অসৎব্যক্তির কাছে আপনি যান!—কেবল একমাত্র ৺রামচন্দ্র দত্তই বলেছিলেন, 'মহাশয়, ও আপনাকে পূজা করেছে।" কালীয়নাগ ভগবানকে বলেছিল, যে 'আপনি আমাকে বিষ দিয়েছেন, আমি কোথা থেকে সুধা আপনাকে দেব'! গিরিশ ঘোষকেও যা দিয়েছেন, সে তাই দিয়ে আপনাকে পূজা করেছে।' পরমহংসদেব বলতে লাগলেন,—"শোনো শোনো—রামের কথা শোনো।" আবার অনেকেই আমার নিন্দা করতে লাগলেন, প্রভু বললেন, "গাড়ী আনো আমি গিরিশ ঘোষের বাড়ী যাব।" স্নেহময় পরমপিতা আমার বাড়ী এসে উপস্থিত হলেন। জন্মদাতা পিতা যে অপরাধে ত্যজ্য পুত্র করে, সে অপরাধ—আমার পরম পিতার নিকট অপরাধ বলে গণ্য হল না। তিনি আমার বাড়ী আসলেন, দর্শন লাভে চরিতার্থ হলাম। কিন্তু দিন দিন অন্তর কুণ্ঠিত হতে

লাগল। তিনি স্নেহময়—সম্পূর্ণ ধারণা রইল; কিন্তু নিজকাজের আলোচনায় নিজেই লজ্জিত হতে লাগলাম। ভক্তেরা কত প্রকারে তাঁর পূজা করে, ভাবতে লাগলাম। আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগলাম। এর কিছুদিন পরে ভক্তচূড়ামণি দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাসায় প্রভু উপস্থিত হলেন। আমিও তথায় উপস্থিত। চিন্তিত হয়ে বসে আছি, তিনি ভাবাবেশে বললেন—"গিরিশ ঘোষ, তুই কিছু ভাবিস্‌নে, তোকে দেখে লোক অবাক্ হয়ে যাবে।" আমি আশ্বস্ত হলাম।

একদিন পদসেবা করতে দিয়েছেন, আমি বেজার। ভাবছি—কি আপদ, কে বসে এখন পায়ে হাত বুলোয়! সে কথা যখন মনে হয়, আমার প্রাণ বিকল হয়ে উঠে, কেবল তাঁর অসীম স্নেহ স্মরণ করে শান্ত হই।

পীড়িত অবস্থা, আমি দেখতে যেতাম না। কেউ যদি বলত, অমুক দেখতে আসে না, তিনি অমনি বলতেন,—"আহা, সে আমার যন্ত্রণা দেখতে পারে না।"

তাঁর শিক্ষাদানের এক আশ্চর্য কৌশল, বাল্যকাল হতে আমার প্রকৃতি এই যে, যে কার্য কেহ নিবারণ করবে, সেই কাজ আগে করব। পরমহংসদেব একদিনের নিমিত্ত আমায় কোনো কাজ করতে নিষেধ করেন নি। সেই নিষেধ না করাই, আমার পক্ষে পরম নিষেধ হয়েছে। অতি ঘৃণিত কার্য মনে উদয় হলে, আমার পুরুষ প্রকৃতিতে প্রলয় আসে। সে স্থলে পরমহংসদেব উদয়। কোথায় কোন ঘৃণিত আলোচনা হলে পরমহংসদেবের কথায় বহুরূপী ভগবানকে মনে পড়ে। তিনি মিথ্যা কইতে সকলকে নিষেধ করতেন। আমি বললাম, মহাশয় আমি ত মিথ্যা কথা কই কিরূপে সত্যবাদী হব?" তিনি বললেন, "তুমি ভেবো না, তুমি আমার মত সত্য-মিথ্যার পার।" মিথ্যা কথা মনে উদয় হলে, পরমহংসদেবের মূর্তি দেখতে পাই, আর মিথ্যা বাহির হতে চায় না। সাংসারিক ব্যবহারে চক্ষু-লজ্জায় দু'একটা এদিক ওদিক কথা কইতে হয়, কিন্তু যে আমি মিথ্যা বলছি, তা জানান দেবার বিশেষ চেষ্টা থাকে। পরমহংসদেব আমার হৃদয়ের সম্পূর্ণ অধিকারী— সে অধিকার তাঁর স্নেহের। এ স্নেহ অতি আশ্চর্য! তাঁর কৃপায় যদি আমার কোনও গুণ বর্তিয়া থাকে, সে গুণগৌরব আমার, তিনি কেবল আমার পাপ গ্রহণ করেছেন, স্পষ্ট কথায় গ্রহণ করেছেন। তাঁর ভক্তের মধ্যে যদি কেউ বলত আমি পাপী, তিনি শাসন করতেন, বলতেন,—"ও কি? পাপ কিসের? আমি কীট আমি কীট বলতে বলতে কীট হয়ে যায়। আমি মুক্ত আমি মুক্ত, এ অভিমান রাখলে মুক্ত হয়ে যায়। সর্বদা মুক্ত অভিমান রাখো, পাপ স্পর্শ করবে না।"

এতক্ষণ আমার অন্তরের কথা বলছিলাম, বলেছি অন্যের অন্তরের কথা কি জানব, কিন্তু দেখেছি, কোনও ভক্তের ছিন্নবস্ত্র দেখলে, তাঁর চক্ষে জল আসত, পায়ে জুতা না থাকলে তিনি ব্যাকুল হতেন, যখন রোগের দারুণ যন্ত্রণা তিনি ভোগ করছেন, যদি কোন ভক্ত সেসময় তাঁর সেবায় নিযুক্ত থাকায় আহারের বিলম্ব হত, তিনি তাকে আহার না করিয়ে নিরস্ত হতেন না। কারও অসুখ হলে তিনি অস্থির। তাঁর ভক্তেরা তাঁকে ঐহিক পারমার্থিক পিতা জানতেন। তিনিও মাতা-ঠাকুরাণীকে বলতেন

যে, লোকে পুত্র কামনা করে, সকল পুত্র সুপুত্র হয় না, কিন্তু তোমায় আমি কতকগুলি পুত্র দিয়ে যাচ্ছি, সকলেই সুসন্তান। তিনি শিষ্যকে পুত্রবৎ দেখতেন। পুত্রবৎ—এ কথায় ঠিক প্রকাশ হইল না, অন্যকথার অভাবে পুত্রবৎ বলছি, সম্পূর্ণ ঐহিক পারত্রিকের দায়িত্ব গ্রহণ যিনি করেন, তিনি কে? তাঁর সঙ্গে কি সম্বন্ধ বিচার করলেই, এ মুক্ত অভিমান আপনিই আসে। মৃত্তিকার দেহে যেন আর আত্মা আবদ্ধ থাকে না। চিত্তের মালিন্য দূর হয়। কাম-ক্রোধাধি দুর্দমনীয় রিপু অন্তর্হিত হয়। কোনও সাধন-ভজনের প্রয়োজন থাকে না। কেবল তাঁর বিমল স্নেহের উপলব্ধিই মুক্তি! উপলব্ধিই মনুষ্যত্ব! উপলব্ধিই মানব জীবনের চরম অবস্থা! এই অকিঞ্চনের সেই স্থায়ী উপলব্ধি হউক, সকলে আর্শীবাদ করুন।

'উদ্বোধন পাক্ষিক পত্র (৭ম বর্ষ, ১লা বৈশাখ, ১৩১২)

।। বাইশ।।

সময় পেলেই গিরিশচন্দ্র ঠাকুর রামকৃষ্ণের সান্নিধ্যের আশায় ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেন কখনো দক্ষিণেশ্বরে কখনো বা অন্য কোন বাড়ীতে-যেখানে ঠাকুর আসতেন-রসালাপ করতেন। অনেক সময় ঠাকুর পরমহংসদেব অত্যন্ত আন্তরিকতায় গিরিশচন্দ্রকে অনেক কাহিনীর কথা শোনাতেন। প্রকৃত ভক্ত কে, কিভাবে তাকে জানা যায় আর ভন্ড কিভাবে কপটতার আশ্রয়ে ভক্ত সেজে সমাজ সংসারে মিথ্যাচার করছে—করে, তার কাহিনী পুরাণ কাহিনীর বিস্তারে গিরিশচন্দ্রকে শোনাতেন ঠাকুর।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্রের আকুলতাকে অনুভব করেই তাঁকে আপন চেতনার আলোকে উদ্বুদ্ধ করতে ইন্ধন দিতেন। নিজে দুটো হাতে গিরিশচন্দ্রকে খাওয়াতেন নানাভাবে নানা বিতর্কের সমাধান করাতেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে সাধনার উপকরণে ও পুষ্টিতে নানাদিক থেকে সাধুরা এসেছিলেন—এসেছিলেন ভৈরবীও। তাঁর কাছ থেকে অধ্যাত্ম-চেতানার কিছু তত্ত্বজ্ঞান ও আচরণের অভ্যাসে আয়ত্বে এনেছিলেন। বহু মানুষের—বহু চরিত্রের আনাগোনা ছিল দক্ষিণেশ্বরে। একজন মহিলা পাগলীও এসেছিল ঠাকুরের কাছে। গিরিশচন্দ্র সব দেখেছেন—মনে মনে ঠাকুরের শান্ত প্রশান্ত আন্তরিক অন্তর জোড়া আনন্দ-অমৃত ব্যবহারে গিরিশচন্দ্র গভীরভাবে পুলকিত হতেন; চোখ দুটো বন্ধ করে ঠাকুরের চিন্ময় সত্তার কল্পলোকে মুনি ঋষিদের জীবন-চরিতের অন্বেষণ করতেন। এমনি ভাবধারায় গিরিশচন্দ্র একটি চরিত্র 'বিল্বমঙ্গল'কে বেছে নিলেন এবং দু'রাত্রি জেগে নাটকটি রচনা করলেন। নাটকটি বারবার তিনি নিজে অভিনয় আংগিকে পাঠ করেছেন। তারপর 'স্টার থিয়েটার'-এ অভিনয় করালেন। প্রেমের আকর্ষণ এবং বৈরাগ্যের সাধনা এ দুয়ের গভীরতায় কাহিনীর সূত্রগুলি গেঁথে গেঁথে নাটকটির রচনা। 'বিল্বমঙ্গল' চরিত্রের

মধ্যে জাগ্রত সংসার ও তা থেকে উত্তরণের আলোর পথ—গিরিশচন্দ্র ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছেই কাহিনীর বিস্তার শুনেছিলেন।

ভক্ত আর ভন্ড—এই দুইয়ের মধ্য থেকে বাস্তব-জীবন ও সংসারের আখ্যানকে কেন্দ্র করে জীবনের পথকে সঠিক করার প্রয়াস। আর এই প্রয়াস নানাভাবে গিরিশচন্দ্র রামকৃষ্ণের নানাকথায় সত্যিকার উপলব্ধির মধ্য দিয়ে লাভ করেছিলেন। ভন্ড-নকল সাধুসন্তদের বিপুল প্রচার সেসময়ে সমাজকে গভীরভাবে প্রতারণা করছিল। সেই দিকটার দিকে ইংগিত দিয়ে গিরিশচন্দ্র 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে আপন মেজাজে লালিত করে যুক্ত করলেন *'পাগলিনী'* একটি চরিত্র। মনস্তাত্বিক দার্শনিকতার বিস্তার করে ছোট ছোট কথায় গিরিশচন্দ্র যে প্রেমের ছবি এঁকেছেন তাতে লম্পট ও বারবণিতার প্রেমের অন্তরালে বৈষ্ণব ধর্মের ও দর্শনের মূল ভাবনাটিকে তুলে ধরার প্রয়াস করেছেন।

বিল্বমঙ্গল

প্রেমের সত্যিকার অধ্যাত্মশক্তির দ্যোতক বৈরাগ্যের পথ ধরেই—গিরিশচন্দ্র 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে সে কথাই বলতে চেয়েছেন। নাটকীয় নানা ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে 'পাগলিনী'র কথাবার্তায় সত্যিকারের মানুষের অন্তর আকুতি ধরা পড়েছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক জীবন যাত্রার প্রেক্ষাপটে—যা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রতিদিনকার জীবনধারায়।

চৈতন্যলীলা—নিমাইসন্ন্যাস—বুদ্ধদেব চরিত—বিল্বমঙ্গল পর পর মানবসংসারের প্রত্যেকটি মানুষের জীবনধারায় আলোর উত্তরণের পথ দর্শকদের আলোকিত করে সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে মুগ্ধ করেছিলেন। 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের অভিনয় প্রক্রিয়ায় প্রত্যেকটি চরিত্র দর্শকদের আপন ঘর-সংসারের ভাবনায় দোলায়িত।

প্রেম ও বৈরাগ্যের গভীরতায় 'বিল্বমঙ্গল' নাটক কলকাতা তথা বাঙলাদেশের মানুষ তাৎপর্যময় জীবনের অমৃতপথের সন্ধান পেয়েছিল। ঘটনাটি বহুজন চর্চিত—কিন্তু নাটকের ঘাত প্রতিঘাতে প্রত্যেকটি চরিত্রের প্রকাশ এবং 'পাগলিনী' চরিত্রের তীর্যক কথাবার্তায় গিরিশচন্দ্র যেন নিজের অভিজ্ঞানকে পেশ করতে চেয়েছেন।

'বিল্বমঙ্গল' নাটকের পর নগর জীবনে—বিশেষ করে কিছু সম্প্রদায়ের অপরিচ্ছন্ন জীবনধারায় ব্যক্তি চরিত্রের অহিতকর বিকারকে কথার মাধ্যমে চাবুক মেরে সমাজের পরিচ্ছন্ন সুস্থ পরিবেশ নিয়ে আসার জন্য *'বেল্লিকবাজার'* এই নামে একটি নাটক রচনা করে 'স্টার থিয়েটারে' অভিনয় করান। সাধারণ মানুষের সহজ জীবনের শান্ত স্নিগ্ধ রূপটি নানাভাবে কলুষিত করার একটা প্রয়াস কোন কোন দিক থেকে দেখা গিয়েছিল প্রকাশ্যে। তাতে সমাজ জীবনের বিশৃংঙ্খল পরিবেশে সু-ভাবনাকে তছ্ নছ্ করে দিচ্ছিল। গিরিশচন্দ্র সচেতন মানসিকতার বেদনায়,

বেল্লিকবাজার

ক্ষোভে এই নাটকটি রচনা ও অভিনয়ের মাধ্যমে তথাকথিত ভদ্রলোকদের সজাগ করতে চেষ্টা করেছেন।

গিরিশচন্দ্রের সামগ্রিক জীবনধারা ঠাকুর রামকৃষ্ণের উপদেশ তথা অধ্যাত্ম পরিমন্ডলের আলোর ছটায় উদ্ভাসিত। পর পর কয়েকটি নাটকের সফলতায় বিশ্বস্ত চেতনায় গিরিশচন্দ্র *'রূপসনাতন'* নাটক রচনা করেন। বৈষ্ণব ধর্মের প্রত্যক্ষ অনুভূতি অনুযায়ী জীবনচর্চায় যাঁরা বৈষ্ণব তত্ত্ব ও দর্শনকে পুষ্ট ও প্রসারিত করেছেন 'রূপসনাতন' তাদের মধ্যে খুবই আদরনীয় ও বরনীয়।

'স্টার থিয়েটারে' প্রথম অভিনয় হবার পরই কলকাতায় সাড়া জেগে যায়। কাহিনী, অভিনয় ও পরিবেশ উপস্থাপনায় গভীরভাবে দর্শকদের প্রভাবিত করেছিল। শুধু কলকাতা নয়-সুদূর গ্রাম ও বিভিন্ন জেলা থেকে দর্শকগণ এই নাটক দেখার জন্য রাত্রিবাস করেও কলকাতায় ছুটে এসেছেন।

নাটকের একটি দৃশ্যে কাশীধামে রূপ অনুপম ও বৈষ্ণবগণ পরিপূর্ণ চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে চৈতন্যদেব কর্তৃক ভক্ত গণের পদধূলি গ্রহণ দৃশ্য...

তাতে বৈষ্ণব ধর্মের গোস্বামীদের মনে আঘাত লাগে এবং চৈতন্যদেব তার ভক্তদের পদধূলি নেবেন—এটা অত্যন্ত আপত্তিজনক বলে গিরিশচন্দ্রকে বিব্রত করেন—ভৎর্সনাও করেন।

গিরিশচন্দ্র এতটুকু বিচলিত হলেন না। তিনি অন্তর সত্যকে যেভাবে দেখে এসেছেন বোধের মধ্য দিয়ে তার প্রকাশ করেছেন নাটকে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবন-সাধনায় নিত্য দিনের ভাবনায় তিনি দেখেছেন ঠাকুর স্বয়ং তাঁর ভক্তদের কাছে ভগবৎ প্রসঙ্গ শোনার পর তাদের কাছে গিয়ে তাদের পদরেণু হাতে নিয়ে মাথায় ও সর্বঅঙ্গে প্রদান করেছেন। সেখানেও ভক্তরা বিব্রত হয়ে ঠাকুরের এ ধরণের কাজের জন্য প্রশ্ন করলে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভাব-সমৃদ্ধ হাসির দ্যুতিতে বললেন,

....কি জানো, বহু ভক্তের সমাগমে এবং ঈশ্বরীয় কথা ও নাম সংকীর্তনে এই স্থান পবিত্র হয়েছে। হরিনাম হলে হরি স্বয়ং তা শুনতে আসেন। ভক্ত-পদস্পর্শে এই স্থানের ধূলি পর্যন্ত পরম পবিত্র হয়েছে...

।। তেইশ।।

গিরিশচন্দ্র ঠাকুর রামকৃষ্ণের করুণায় প্রায়শই তাঁর সঙ্গলাভ করে জীবনের ভাবনার মোড় ঘুরিয়েছিলেন। নেতি মানসিকতায় প্রচন্ড ইচ্ছায় অন্বেষণ ও বিচার-বিশ্লেষণে যুক্তি ও বিশ্বাসের পরিকাঠামোয় ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার যে আলোর ঝর্ণা-প্রবাহ ঠাকুর রামকৃষ্ণের মধ্যে দেখেছেন, অনুভব করেছেন তার প্রকাশ গিরিশচন্দ্র নাটকের

বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য থেকে যতটুকু সুযোগ পেয়েছেন বর্ণনা করে সাধারণ দর্শকের অন্তরলোকে আলো দিয়েছেন। তা ছাড়া বিভিন্ন সময়ে ঠাকুর এবং সিমলার ডানপিঠে যুবক নরেন্দ্রনাথের জিজ্ঞাসার প্রতি ধাপে ঠাকুরের প্রতি যে বিশ্বস্ততা অন্তরে অত্যন্ত গভীর প্রেরণায় অনুভূতিতে দীপ্যমান হয়েছিল, তার বিষয়ে গিরিশচন্দ্র ছিলেন সচেতন। রামকৃষ্ণের আকর্ষণ তাঁর জীবনধারার ধমনীতে নতুন বেগের সঞ্চার করেছিল প্রতিনিয়ত। প্রতিদিনকার আচার-আচরণ তথা অনুভবে ঠাকুরের ভাবানুভূতি গভীরভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। আবার গিরিশচন্দ্র সেই সর্বস্বসমর্পনের ভাবনায় নিজের মনে মনে কোথাও কোথাও কিছু প্রশ্ন করত—ঠাকুর তবে কে? ভগবান না অন্য কেউ?

সেই পুরাতন প্রশ্ন, সেই সংশয়াকুল মনোরাজ্যের কিছু দ্বিধাজড়িত উৎকণ্ঠায় তোলপার। আবার পরক্ষণেই অন্তর সত্ত্বায় ঠাকুরের পরশানুভূতি ও কৃপাসিক্ত নয়ন গিরিশচন্দ্রকে নতুন করে আলোর মুক্ততায় উৎসারিত করত—তখন আকুল হয়ে ছুটে যেতে চাইতেন সেই করুণাঘন কৃপাময় ঠাকুরের চরণে প্রণতি জানাতে।

এমনি করেই গিরিশচন্দ্র চলেছেন—কিন্তু ঠাকুরের মহিমার প্রত্যক্ষতার প্রতি ছিল গিরিশচন্দ্রের তীব্র কৌতুহল।

একদিন গিরিশচন্দ্র রঙ্গমঞ্চের কাজ সমাপন করে রাত্রিতে কোন এক অভিনেত্রীর বাড়ী গেলেন—অভিপ্রায় সেখানে রাত্রিতে থাকা। সেই অভিনেত্রী গিরিশচন্দ্রকে পেয়ে যার পর নাই আহলাদিত হয়ে রসময় হয়ে গিরিশকে আদর-যত্ন করতে যত্নবান হলেন। অভিনেত্রীর সাথে এক শয্যায় রাত কাটাবেন—এই অভিপ্রায় গিরিশচন্দ্র জানাবার পর অভিনেত্রীর সমস্ত দেহ-বিলাসের উদ্দীপ্ত কামনার প্রতিটি স্পন্দন যেন নেচে উঠল—কিভাবে গিরিশচন্দ্রকে তৃপ্ত করবেন, মুগ্ধ করবেন আপন আলয়ে আপন করে সেবা করবেন—সেই চিন্তায় ছট্‌ফট্ করতে লাগলেন। গিরিশচন্দ্র যথাসময়ে অভিনেত্রীর সেবা গ্রহণ করে তার শয্যায় শয়ন করতে উদ্যোগ নিচ্ছেন। ধীরে ধীরে রাত মোহময় হয়ে কামনার শিখা গিরিশের দেহ-মনে-কেমন যেন উত্তেজিত হতে লাগল—

রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহর। গিরিশচন্দ্রের ঘুম নেই—সমস্ত দেহটা যেন কিসের দংশনে যন্ত্রণা হতে লাগল। শয্যা থেকে উঠে গেলেন—এদিক ওদিক তাকালেন—হঠাৎ অভিনেত্রীকে অভিনয়ের ভংগীতে কাছে ডেকে এনে বললেন— যা! একটা জরুরী চাবি ফেলে এসেছি—এই বলে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে আপন আলয়ে চলে এলেন—বাড়ী এসেই দু'চোখ জুড়ে 'হাউ হাউ' করে কেঁদে কেঁদে ঠাকুরকে স্মরণ করলেন।

পরদিন একলা, সব কাজ ফেলে সটান দক্ষিণেশ্বরে চলে গেলেন এবং ঠাকুরকে সব খুলে জানালেন। ঠাকুর গিরিশের সব কথা শুনলেন, কিছুটা উত্তেজিত হয়ে বললেন,

....শালা, তুই কি ভেবেছিস্—তোকে
ঢ্যাম্‌না সাপে ধরেছে, যে পালিয়ে যাবি?

এ জাত সাপে ধরেছে—তিন ডাক
ডেকেই চুপ করতে হবে।

গিরিশ মাথা নত করে ঠাকুরের চরণে চোখ দুটো রেখে আশ্বস্ত হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে মনে বললেন— চৈতন্য, জগাই মাধাইকে উদ্ধার করেছিলেন। নিজে স্থির করলেন—আর আমি নই, আর গিরিশ আমি নই—আমার ইহকাল-পরকাল যা কিছু ভাল যা কিছু মন্দ সব ঠাকুরের চরণে সমর্পন করব—আর বিলম্ব নয়, একদিনের জন্য ও অন্য কোন চিন্তা নয়—ঠাকুরই একমাত্র—তাঁকেই সব বলব—তাঁর হাত ধরব!

....গিরিশ ঠাকুরের নিকট কয়েকবার আসা-যাওয়ার পর একদিন তাঁহাকে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পন করিয়া বলিলেন—'এখন থেকে আমি কি করব?' ঠাকুর—'যা করচ তাই করে যাও। এখন এদিক (ভগবান) ওদিক (সংসার) দুদিক রেখে চল, তারপর যখন একদিক ভাঙবে তখন যা হয় হবে। তবে সকাল-বিকালে তাঁর স্মরণ-মননটা-রেখো—এই বলিয়া গিরিশের দিকে চাহিলেন, যেন তাঁহার উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছেন।

গিরিশ শুনিয়া বিষন্নমনে ভাবিতে লাগিলেন, আমার যে কাজ তাহাতে স্নান -আহার-নিদ্রা প্রভৃতি নিত্যকর্মেরই একটা নিয়মিত সময় রাখিতে পারি না। সকালে -বিকালে স্মরণ-মনন করিতে নিশ্চয়ই ভুলিয়া যাইব। তাহা হইলে তো মুশকিল—শ্রীগুরুর আজ্ঞা লঙঘনে মহাদোষ ও অনিষ্ট হইবে। অতএব এ কথা কি করিয়ে স্বীকার করি? সংসারে অন্য কাহারও কাছে কথা দিয়েই সে কথা না রাখিতে পারিলে দোষ হয়, তা যাঁহাকে পরলোকের নেতা বলিয়া গ্রহণ করিতেছি তাঁহার কাছে! গিরিশ মনের কথাগুলি বলিতেও কুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। আবার ভাবিলেন, 'কিন্তু ঠাকুর আমাকে তো আর কোন একটা বিশেষ কঠিন কাজ করিতে বলেন নাই। অপরকে এ কথা বলিলে এখনি আনন্দের সহিত স্বীকার পাইত। কিন্তু তিনি কি করিবেন, আপনার একান্ত বহির্মুখ অবস্থা ঠিক ঠিক দেখিতে পাইয়াই বুঝিতেছিলেন যে, ধর্মকর্মের অতটুকু প্রতিদিন করা যেন তাঁহার সামর্থের অতীত। আবার নিজের স্বভাবের দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইলেন— কোনরূপ ব্রত বা নিয়মে 'চিরকালের নিমিত্ত আবদ্ধ হইলাম'—এ কথা মনে করিতে গেলেও যেন হাঁপাইয়া উঠেন এবং যতক্ষণ না ঐ নিয়ম ভঙ্গ হয় ততক্ষণ যেন প্রাণে অশান্তি।

.... কাজেই নিজের অপারক ও অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করিতে করিতে কাতর হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন,—'করিব' বা 'করিব না' কোন কথাই বলিতে পারিলেন না।....

ঠাকুর গিরিশকে ঐরূপ নীরব দেখিয়া, তাঁহার দিকে চাহিলেন এবং তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, তা যদি না পারতো খাবার শোবার আগে তাঁহার একবার স্মরণ করে নিও'।

গিরিশ নীরব। ভাবিলেন উহাই কি করিতে পারিবেন। দেখিলেন— কোন দিন খান বেলা দশটায় আর কোন দিন বেলা পাঁচটায়; রাত্রির খাওয়া সম্বন্ধও ঐ নিয়ম।

> .... হায় হায়, ঠাকুর এত সোজা কাজ করিতে বলিতেছেন, আর তিনি 'করিব' বলিতে পারিতেছেন না। গিরিশ বিষম ফাঁপরে পড়িয়া স্থির, নীরব রহিলেন, আর তাঁহার প্রাণের ভিতরে যেন একটা চিন্তা, ভয় ও নৈরাশ্যের ঝড় বহিতে লাগিল। ঠাকুর গিরিশের দিকে আবার চাহিয়া হাসিতে হাসিতে এইবার বলিলেন,—"তুই বলবি, 'তাও যদি না পারি'—**আচ্ছা, তবে আমায় বকলমা দে**"। ঠাকুরের তখন অর্ধবাহ্যদশা।
>
> কথাটা মনের মতো হইল। গিরিশের প্রাণ ঠাণ্ডা হইল। শুধু ঠাণ্ডা হইল না, ঠাকুরের অপার দয়ার কথা ভাবিয়া তাঁহার উপর ভালবাসা ও বিশ্বাস একেবারে অনন্তধারে উচ্ছলিয়া উঠিল। গিরিশ ভাবিলেন, 'যাক্, নিয়ম বন্ধনগুলিকে বাঘ মনে হয়, তাহার ভিতর আর পড়িতে হইল না। এখন যাহাই করি না কেন, এইটি মনে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিলেই হইল যে, ঠাকুর তাঁহার অসীম দিব্যশক্তি বলে কোনো-না-কোনো উপায় তাহাকে উদ্ধার করিবেন।" শ্রীযুত গিরিশ তখন **বকল্মা বা ঠাকুরের উপর সমস্তভার দেওয়ার এইটুকু অর্থই বুঝিলেন**—বুঝিলেন তাঁহাকে নিজে চেষ্টা বা সাধন-ভজন করিয়া কোনো বিষয় ছাড়িতে হইবে না; ঠাকুরই তাঁহার মন হইতে সকল বিষয় নিজ শক্তি বলে ছাড়াইয়া লইবেন। কিন্তু (তিনি)নিয়মের বন্ধন গলায় পরা অসহ্য বোধ করিয়া তাহার পরিবর্তে যে তদপেক্ষা শতগুণে অধিক ভালবাসার বন্ধন স্বেচ্ছায় গলায় তুলিয়া লইলেন তাহা তখন বুঝিতে পারিলেন না।... অন্য সকল চিন্তা মন হইতে সরিয়া যাইয়া কেবল দেখিতে লাগিলেন—শ্রীরামকৃষ্ণের অপার করুণা। আর বাড়িয়া উঠিল—শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরিয়া শতগুণে অহঙ্কার। মনে হইল—"সংসারে যে যা বলে বলুক, যতই ঘৃণা করুক, ইনি তো সকল অবস্থায় আমার—তবে আর কি? কাহাকে ডরাই?" ...শ্রীযুত গিরিশ এখন নিশ্চিন্ত এবং খাইতে-শুইতে-বসিতে ঐ এক চিন্তা "*শ্রীরামকৃষ্ণ আমার সম্পূর্ণ ভার লইয়াছেন*"—সর্বদা মনে উদিত থাকিয়া তাঁহাকে যে, ঠাকুরের ধ্যান করাইয়া লইতেছে এবং তাঁহার সকল কর্ম এ মনোভাবের উপর একটা ছাপ দিয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়া আমূল পরিবর্তন আনিয়া দিতেছে, তাহা বুঝিতে না পারিলেও সুখী—কারণ তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) যে, তাঁহাকে ভালবাসেন এবং আপনার হইতেও আপনার!

ঠাকুর চিরকাল শিক্ষা দিয়াছেন, "কখন কাহারও ভাব নষ্ট করিতে নাই" এবং প্রত্যেক ভক্তের সহিত ঐরূপ ব্যবহারও নিত্য করিতেন। শ্রীযুত গিরিশকে পূর্বোক্ত ভাব দিয়া ধরিয়া এখন হইতে ঐ ভাবের উপযোগী শিক্ষাসকলও তাঁহাকে দিতে লাগিলেন। একদিন শ্রীযুত গিরিশ ঠাকুরের সম্মুখে কোনো একটি সামান্য বিষয়ে " আমি পারব" বলায় ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "ও কি গো? অমন করে 'আমি করব বলো কেন? যদি না করতে পারো? বলবে—ঈশ্বরের ইচ্ছা হয় তো করব।" গিরিশও বুঝিলেন, "ঠিক কথা; আমি যখন ভগবানের উপর সম্পূর্ণ ভার দিয়াছি এবং তিনিও সেই ভার লইয়াছেন, তখন তিনি যদি ঐ কার্য আমার পক্ষে করা উচিত বা মঙ্গলকর বলিয়া করিতে দেন তবেই তো করিতে পারিব?"—বুঝিয়া তদবধি, আমি করিব, যাইব, ইত্যাদি বলা ও ভাবগুলো ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। ক্রমে ঠাকুরের অদর্শন হইল; স্ত্রী পুত্রাদির বিয়োগরূপ নানা দুঃখ-কষ্ট আসিয়া উপস্থিত হইল; তাঁহার মন কিন্তু পূর্বের ন্যায় প্রতি ব্যাপারে বলিয়া উঠিতে লাগিল—তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) ঐরূপ হওয়া তোর পক্ষে মঙ্গলকর বলিয়াই ঐ সকল হইতে দিয়াছেন। তুই তাঁহার্ পর ভার দিয়াছিস্, তিনিও লইয়াছেন; কিন্তু কোন্ পথ দিয়া তিনি তোকে লইয়া যাইবেন, তাহা তো আর তোকে লেখাপড়া করিয়া বলেন নাই? তিনি এই পথই তোর পক্ষে সহজ বুঝিয়া লইয়া যাইতেছেন, তাহাতে তোর 'না' বলিবার বা বিরক্ত হইবার তো কথা নাই। তবে কি তাঁহার উপর *বকল্মা* বা ভার দেওয়াটা একটু মুখের কথামাত্র বলিয়াছিলি? ... এইরূপে যতদিন যাইতে লাগিল ততই গিরিশের বকলমা দেওয়ার গূঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইতে লাগিল। এখনই কি উহার সম্পূর্ণ অর্থ বুঝিতে পারা গিয়াছে? ...গিরিশকে জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, 'এখনও ঢের বাকি আছে! বকল্মা দেওয়ার ভিতর যে এতটা আছে তখন কি তা বুঝেছি। এখন দেখি যে সাধন-ভজন-জপ-তপ-রূপ কাজের একটা সময়ে অন্ত আছে, কিন্তু যে বকলমা দিয়াছে তার কাজের আর অন্ত নেই—তাকে প্রতি পদে, প্রতি নিঃশ্বাসে দেখিতে হয় তাঁর (ভগবানের) উপর ভার রেখে তাঁর জোরে পা-টি, নিঃশ্বাসটি ফেলালে, না এই হতচ্ছাড়া 'আমি'টার জোরে সেটি করলে!"

সারদানন্দ এর
(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ ১)
গুরুভাব পূর্বাধ।

।। চব্বিশ ।।

গিরিশচন্দ্র সব ভার দিয়ে দিয়েছেন তাঁর অন্তর-দেবতা ঠাকুর রামকৃষ্ণের উপর—তাই তার কোন ভাবনা নেই—নেই সংসারের কোন চিন্তা-রোগ-শোক-জড়িত কোন ঘটনার। তৎপর হয়ে কিছু করার শক্তিও বুঝি গিরিশ ঠাকুরের চরণে নিবেদন করে রয়েছেন। ঠাকুরও নানাভাবে তাঁর প্রিয় গিরিশের খোঁজ করেন—ভক্তদের কাছে জিজ্ঞাসা করেন।

গিরিশচন্দ্রও রামকৃষ্ণগত প্রাণে দিন-রাত্রি তার নিত্য কাজ করছেন। পিতৃস্নেহের স্মৃতি মাঝে মাঝে জেগে উঠত, ঠাকুরকে স্মরণ করে—

> .... বাল্যকালে পিতার কাছে যেরূপ আদর পাইয়াছিলাম পরমহংসদেবের কাছে ঠিক সেইরূপ আদর পাইয়াছি। আমার সকল আবদারই তিনি পূর্ণ করতেন। অন্য সকলে তাঁহার কত গুণের কথা বলেন, আমি কেবল তাঁহার অপার অলৌকিক স্নেহের কথাই ভাবি।...
>
> পরমহংসদেবের নিকট যাঁহারা গিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে শিষ্ট, শান্ত ও ধর্মপরায়ণ। নরেন্দ্র প্রভৃতি যাঁহারা তাঁহার স্বগণের মধ্যে গণ্য, তাঁহারা নির্মল বালক বয়সে প্রভুর নিকট যান ও প্রভুর স্নেহে আবদ্ধ হইয়া পিতামাতা ভুলিয়া প্রভুর কার্যে নিযুক্ত হন। তাঁহাদের প্রতি প্রভুর স্নেহবর্ণনায় তাঁহার প্রকৃত স্নেহ হয়তো বুঝান যাইবে না। পবিত্র বালকবৃন্দ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শরণাপন্ন হইয়াছে, ইহাতে স্নেহ জমিবার কথা। কিন্তু আমার প্রতি স্নেহ, অহেতুকী দয়াসিন্ধুর পরিচয়। ভগবানের একটি নাম পতিত পাবন, মানবদেহে সে নামের সার্থকতা আমি দেখিয়াছি। পতিত পাবন রামকৃষ্ণ আমায় স্নেহ করিয়াছেন, সেই নিমিত্ত আমার প্রতি স্নেহের কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পরমহংসদেবের কাছে যাঁহারা গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা চঞ্চল প্রকৃতির থাকিতে পারেন, কিন্তু আমার তুলনায় সকলেই সাধু। কাহার কখনও বা পদস্খলন হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু আমার গঠনই স্বতন্ত্র, সোজা পথে চলিতে জানিতাম না। পরমহংসদেবের স্নেহের বিকাশ আমাতে যেরূপ পাইয়াছি সেরূপ আর অন্য কোথাও পাই নাই। যে সময়ে পরমহংসদেব আমায় আশ্রয় প্রদান করেন তখন আমি হৃদি দ্বন্দ্বে বিকলিত। পূর্বের শিক্ষা-দীক্ষা, বাল্যকাল হইতে অভিভাবকশূণ্য হইয়া যৌবন সুলভ চপলতা—সমস্তই আমার ঈশ্বর পথ হইতে দূরে লইয়া যাইতেছিল। সে সময় জড়বাদী প্রবল, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা একপ্রকার মূর্খতা ও হৃদয়দৌর্বল্যের পরিচয়; সুতরাং সমবয়স্কের নিকট একজন কৃষ্ণ-বিষ্ণু বলিয়া পরিচয় দিতে গিয়া 'ঈশ্বর নাই'—এই কথাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইত।

আস্তিককে উপহাস করিতাম, এবং এ-পাতা ও-পাতা বিজ্ঞান উল্টাইয়া স্থির করা হইল যে ধর্ম কেবল সংসার রক্ষার্থ কল্পনা, সাধারণকে ভয় দেখাইয়া কুকার্য হইতে বিরত রাখিবার উপায়। দুষ্কর্ম ধরা পড়িলেই দুষ্কর্ম। গোপনে করিতে পারা বুদ্ধিমানের কার্য, কৌশলে স্বার্থ-সাধন করাই পাণ্ডিত্য, কিন্তু ভগবানের রাজ্যে এ পাণ্ডিত্য বহুদিন চলে না। দুর্দিন অতি কঠিন শিক্ষক। সেই কঠিন শিক্ষকের তাড়নায় শিখিলাম যে, কুকার্য গোপন রাখিবার কোনও উপায় নাই— "ধর্মের ঢাক আপনি বাজে।" শিখিলাম বটে— কিন্তু কার্যজনিত ফলভোগ আরম্ভ হইয়াছে, নিরাশ-ব্যঞ্জক' পরিণাম মানসপটে উদয় হইতেছে। শাস্তি আরম্ভ হইয়াছে মাত্র, কিন্তু শাস্তি এড়াইবার কোন উপায় দেখিতেছি না। বন্ধু-বান্ধবহীন, চতুর্দিকে বিপজ্জাল...।" ইত্যাদি।

তাহার পর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশ্রয় লাভ করিয়া গিরিশচন্দ্র লিখিতেছেন ঃ—

'মন তখন আনন্দে পরিপ্লুত! যেন নূতন জীবন পাইয়াছি। পূর্বের সেই ব্যক্তি আমি নাই, হৃদয়ে বাদানুবাদ নাই। ঈশ্বর সত্য, ঈশ্বর আশ্রয়দাতা, এই মহাপুরুষের আশ্রয় লাভ করিয়াছি, এখন ঈশ্বরলাভ আমার অনায়াসসাধ্য— এইভাবে আচ্ছন্ন হইয়া দিনযামিনী যায়। শয়নে-স্বপনেও এই ভাব,—পরম সহসা, পরমাত্মীয় পাইয়াছি, আমার সংসারে আর কোনও ভয় নাই। মহাভয়—মৃত্যুভয়—তাহাও দূর হইয়াছে।

"আমি তো এইরূপ ভাবি। এদিকে পরমহংসদেবের নিকট হইতে যে ব্যক্তি আসেন, তাঁহারই মুখে শুনি, যে প্রভু আমার কথা কতই বলিয়াছেন। যদি কেহ আমার নিন্দা করে, খুঁজিয়া নিন্দা বাহির করিতে হয় না, তিনি তৎক্ষণাৎ বলেন,—'না, জান না, ওর খুব বিশ্বাস।'

"মাঝে মাঝে থিয়েটারে আসেন। দক্ষিণেশ্বর হইতে, আমাকে খাওয়াইবার জন্য খাবার লইয়া আসেন। প্রসাদ না হইলে, আমার খাইতে রুচি হইবে না, সেইজন্য মুখে ঠেকাইয়া আমাকে খাইতে দেন। আমার ঠিক বালকের ভাব হয়, পিতা মুখ হইতে খাবার দিতেছেন, আমি আনন্দে তাহা ভোজন করি।

"একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছি, তাঁহার ভোজন শেষ হইয়াছে। আমায় বলিলেন,—'পায়েস খাও।' আমি খাইতে বসিয়াছি, তিনি বলিলেন,— 'তোমায় খাওয়াইয়া দি।' আমি বালকের ন্যায় বসিয়া খাইতে লাগিলাম। তিনি কোমল হস্তে আমাকে খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। মা যেমন চেঁচে-পুছে খাওয়াইয়া দেন, সেইরূপ চেঁচে-পুঁছে খাওয়াইয়া দিলেন। আমি যে বুড়ো ধাড়ি, তাহা আমার মনে রহিল না। আমি মায়ের বালক, মা খাওয়াইয়া দিতেছেন,—এই মনে হইল। যখন মনে হয় যে অনেক অস্পর্শীয় ওষ্ঠে আমার ওষ্ঠ স্পর্শিত হইয়াছে, সেই ওষ্ঠে তিনি নির্মল হস্তে পায়েস দিয়াছেন, তখন

যেন আত্মহারা হইয়া ভাবি—এ ঘটনা কি সত্য হইয়াছিল না স্বপ্নে দেখিয়াছি। একজন ভক্তের মুখে শুনিয়াছিলাম যে তিনি দেব দৃষ্টিতে আমাকে উলঙ্গ বালক দেখিয়াছিলেন। সত্যই আমি তাঁহার নিকট গিয়া, যেন নগ্ন বালকের ন্যায় হইতাম। যে সকল দ্রব্য আমার রুচিকর, তিনি কিরূপে জানিতেন, তাহা আমি জানি না, সেই সকল দ্রব্য, আমার সম্মুখে বসাইয়া খাওয়াইতেন। স্বহস্তে আমাকে জল ঢালিয়া দিতেন।

....“একদিন পদসেবা করিতে দিয়াছেন, আমি বেজার! ভাবিতেছি, কি আপদ, কে বসে এখন পায়ে হাত বুলোয়! সে কথা যখন মনে হয়, আমার প্রাণ বিকল হয়ে উঠে, —কেবল তাঁহার অসীম, স্নেহ স্মরণ করিয়া শান্ত হই। পীড়িত অবস্থায়, আমি দেখিতে যাইতাম না। কেহ যদি বলিত, অমুক দেখিতে আসে না তিনি অমনি বলিতেন, —আহা সে আমার যন্ত্রণা দেখিতে পারে না।”

।। পঁচিশ।।

গিরিশচন্দ্র মনের মোচড়ে সময় করে ঠাকুরের সাথে দেখা করতে যেতেন। এমনি একদিন কাশীপুর উদ্যান বাটীতে গিরিশচন্দ্র ঠাকুরকে দেখতে গিয়েছেন। কাশীপুর বাগানের ঘরে ঠাকুর শয্যায় বসিয়া আছেন। পালা করে ভক্তরা রাত্রি জাগরণ করে ঠাকুরের সেবা করেন। ঠাকুরের ঘুম তেমন হয় না। সেদিন ঠাকুরের অসুস্থতা একটু কম—ভক্তরা ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে পরপর ঠাকুরের শয্যার পাশে মেজেতে বসছেন। ঠাকুর গিরিশকে দেখলেন, জিজ্ঞাসা করলেন,

.... ভাল আছ? (লাটুর প্রতি) একে তামাক খাওয়া। আর পান এনে দে। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বসিলেন, ‘কিছু ভালখাবার এনে দে’।

....ঠাকুর বসিয়া আছেন। একটি ভক্ত কয়গাছি ফুলের মালা আনিয়া দিলেন। ঠাকুর নিজের গলায় একে একে সেগুলি ধারণ করিলেন। ঠাকুরের হৃদয়মধ্যে হরি আছেন, তাঁকেই বুঝি পূজা করিলেন। ভক্তেরা অবাক হইয়া দেখিতেছেন। দুইগাছি মালা গলা হইতে লইয়া গিরিশকে দিলেন।

গিরিশের জন্য জলখাবার আসিয়াছে। ফাগুর দোকানের গরম কচুরি লুচি ও মিষ্টান্ন। বরাহনগরে ফাগুর দোকান। ঠাকুর নিজে সেই সমস্ত খাবার সম্মুখে রাখাইয়া প্রসাদ করিয়া দিলেন। তারপর নিজে হাতে করিয়া খাবার গিরিশের হাতে দিলেন। বলিলেন, বেশ কচুরি।

গিরিশ সম্মুখে বসিয়া খাইতেছেন। গিরিশকে খাইবার জল দিতে হইবে। ঠাকুরের শয্যার দক্ষিণ-পূর্বে কোণে কুঁজায় করিয়া জল আছে। গ্রীষ্মকাল, বৈশাখ মাস। ঠাকুর বলিলেন, "এখানে বেশ জল আছে।"

ঠাকুর অতি অসুস্থ। দাঁড়াইবার শক্তি নাই।

ভক্তেরা অবাক হইয়া কি দেখিতেছেন? দেখিতেছেন—ঠাকুরের কোমড়ে কাপড় নাই। দিগম্বর! বালকের ন্যায় শয্যা হইতে এগিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। নিজে জল গড়াইয়া দিবেন। ভক্তদের নিশ্বাসবায়ু স্থির হইয়া গিয়াছে। *ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জল গড়াইলেন*। গেলাস হইতে একটু জল হাতে লইয়া দেখিতেছেন, ঠাণ্ডা কিনা। দেখিতেছেন জল তত ঠাণ্ডা নয়। অবশেষে অন্য জল পাওয়া যাইবে না বুঝিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বে ঐ জল দিলেন। গিরিশ খাবার খাইতেছেন। গিরিশ খাইতে খাইতে আবার কথা তুলিলেন।

গিরিশ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—আচ্ছা মহাশয়, মনটা এত উঁচু আছে, আবার নিচু হয় কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—সংসারে থাকতে গেলেই ও রকম হয়। কখনও উঁচু, কখনও নিচু। কখনও বেশ ভক্তি হচ্ছে, আবার কমে যায়। কামিনীকাঞ্চন নিয়ে থাকতে হয় কিনা, তাই হয়। সংসারে ভক্ত কখন ঈশ্বর চিন্তা, হরিনাম করে; কখন বা কামিনীকাঞ্চনে মন দিয়ে ফেলে। যেমন সাধারণ মাছি—কখন সন্দেশে বসছে, কখন বা পচা ঘা বা বিষ্ঠাতেও বসে।

"ত্যাগীদের আলাদা কথা। তারা কামিনীকাঞ্চন থেকে মন সরিয়ে এনে কেবল ঈশ্বরকে দিতে পারে; কেবল হরিরস পান করতে পারে। ঠিক ঠিক ত্যাগী হ'লে ঈশ্বর বই তাদের আর কিছু ভাল লাগে না। বিষয় কথা হ'লে উঠে যায়; ঈশ্বরীয় কথা হলে শুনে। ঠিক ঠিক ত্যাগী হ'লে নিজেরা ঈশ্বরকথা বই আর অন্য বাক্য মুখে আনে না।

"মৌমাছি কেবল ফুলে বসে—মধু খাবে ব'লে। অন্য কোন জিনিস মৌমাছির ভাল লাগে না।"

গিরিশ দক্ষিণের ছোট ছাদটির উপর হাত ধুইতে গেলেন।

গিরিশ পুনর্বার ঘরে আসিয়া ঠাকুরের সম্মুখে বসিয়াছেন ও পান খাইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি)—রাখাল-টাখাল এখন বুঝেছে কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ; কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা। ওরা যে সংসারে গিয়ে থাকে, সে জেনেশুনে। পরিবার আছে, ছেলেও হয়েছে—কিন্তু বুঝেছে সব মিথ্যা।

অনিত্য। রাখাল-টাখাল এরা সংসারে লিপ্ত হবে না।

"যেমন পাঁকাল মাছ। পাঁকের ভিতর বাস, কিন্তু গায়ে পাঁকের দাগটি পর্যন্ত নাই!"

গিরিশ—মহাশয়, ও-সব আমি বুঝি না। মনে করলে সব্বাইকে নির্লিপ্ত আর শুদ্ধ ক'রে দিতে পারেন। কি সংসারী কি ত্যাগী সব্বাইকে ভাল ক'রে দিতে পারেন। মলয়ের হাওয়া বইলে, আমি বলি, সব কাঠ চন্দন হয়—

শ্রীরামকৃষ্ণ—সার না থাকলে চন্দন হয় না। শিমূল আরও কয়টি গাছ, এরা চন্দন হয় না।

গিরিশ—তা শুনি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আইনে এরূপ আছে।

গিরিশ—আপনার সব বে-আইনী।

....হাঁ, তা হতে পারে; ভক্তি নদী ওথালালে ডাঙ্গায় এক বাঁশ জল। যখন ভক্তি উন্মাদ হয়, তখন বেদবিধি মানে না।

....ভক্তি হলে আর কিছুই চাই না।"

শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত
দ্বিতীয় ভাগ : ষড়বিংশ অধ্যায়।

।। ছাব্বিশ ।।

গিরিশচন্দ্রের মানসিক পরিবর্তনের বিচিত্র প্রবাহে একটি ভাব খুবই প্রকট হয়েছিল—ঠাকুরের ভক্তদের মত ঠাকুরের সেবা কিভাবে করা যায়। দক্ষিণেশ্বরে-কলকাতায় ঠাকুরকে ঘিরে তাঁর ভক্তগণ খুবই আদর-নিষ্ঠায় সকল সময় নিয়োজিত থাকত ঠাকুরের সেবা করার জন্য। গিরিশচন্দ্র তাই মনে মনে ভাবলেন,

"গুরুসেবা কেমন করিয়া করিতে হয়, আমি জানি না—আমি কিছুই করিতে পারিলাম না! ঠাকুর যদি আমার সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা হইলে বোধহয়, মমতাবশতঃ সাধ মিটাইয়া সেবা করিতে পারি।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র দোকান হতে গরম গরম লুচি ভাজাইয়া আনিয়া পরমহংসদেবের আহারের ব্যবস্থা করিলেন, কারণ দক্ষিণেশ্বরে গিয়া আহার করিতে তাঁহার অধিক রাত্রি হইয়া যায়। পরমহংসদেব অভিনয় দর্শনান্তে আহার করিয়া যে সময়ে বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছেন, গিরিশচন্দ্র মদ্যপান করিয়া আসিয়া ঠাকুরকে ধরিয়া বসিলেন, "তুমি আমার ছেলে হও।" পরমহংসদেব বলিলেন, "তা কেন,

আমি তোর ইষ্ট হ'য়ে থাকবো।" গিরিশচন্দ্র যত বলেন, পরমহংসদেবের ঐ এক কথা, "তোর ইষ্ট হ'য়ে থাকবো।" আমার বাপ অতি নির্মল ছিলেন, আমি তোর ছেলে কেন হবো?" মত্ততাপ্রযুক্ত গিরিশচন্দ্র অকথ্য ভাষায় ঠাকুরকে গালি দিতে আরম্ভ করিলেন। ভক্তগণ কুপিত হইয়া গিরিশচন্দ্রকে শাস্তি দিতে উদ্যত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়া হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, "এটা কোন্ থাকের ভক্ত রে? এটা বলে কি? গিরিশচন্দ্রের মুখের তোড় ততই চলিতে লাগিল।

ঠাকুর ভক্তগণকে লইয়া যে সময় গাড়ীতে উঠিলেন, গিরিশচন্দ্র সঙ্গে-সঙ্গে আসিয়া, গাড়ীর সম্মুখে কর্দমাক্ত রাস্তার উপর লম্ববান হইয়া শুইয়া পড়িয়া সাষ্ঠাঙ্গে প্রণাম করিলেন। পরমহংসদেব দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া গেলেন।

গিরিশচন্দ্রের মনে কিছুমাত্র শঙ্কা নেই। আদুরে গোপাল—বখাটে ছেলে যেরূপ বাপকে গালি দিয়া নিশ্চিন্তে থাকে, তিনিও পরমহংসদেবের আদুরে বখাটে ছেলের মত কার্য করিয়া নির্ভয়ে রহিলেন। ঠাকুরের স্নেহের উপর তাঁহার স্নেহ এত অসীম— যে ঠাকুর তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেন—এ আশঙ্কা একবারও তাঁহার জন্মিল না।

পরমহংসদেবের ভক্তগণ সকলেই ব্যথিত এবং বিরক্ত। পরদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়া ঠাকুরের সম্মুখে অনেকেই বলিতে লাগিলেন, "এটা পাষণ্ড আমরা জানি, ওর কাছেও আপনি যান?" কেহ বলিলেন, "আর ওর সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে কাজ নাই।" এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে এমন সময়ে ঠাকুরের পরমভক্ত রামচন্দ্র দত্ত আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "শুনেছ গা, রাম! দেড়খানা লুচি খাইয়ে গিরিশ ঘোষ আমার পিতৃচ্ছন্ন-মাতৃচ্ছন্ন করেছে।" ভক্তচূড়ামণি রামবাবু বলিলেন, "কি করবেন? সে তো ভালই করেছে।" শ্রীরামকৃষ্ণদেব উপস্থিত ভক্তগণকে বলিলেন, "শোন-শোন রাম কি বলে, —এর পর আমায় যদি মারে?" অম্লানবদনে রামচন্দ্র উত্তর করিলেন, "মার খেতে হবে।" ঠাকুর কহিলেন, "মার খেতে হবে!" তখন রামবাবু বলিলেন, "গিরিশের অপরাধ কি?" কালীয় সর্পের বিষে রাখাল-বালকগণের মৃত্যু হ'লে শ্রীকৃষ্ণ কালীয় নাগের যথাবিহিত শাস্তি বিধান ক'রে বলেছিলেন, 'তুমি কি জন্য বিষ উদ্গীরণ কর?' নাগ তাহাতে উত্তর দিয়াছিল, 'প্রভু, যাকে অমৃত দিয়েছ, সে তাই দিতে পারে, কিন্তু আমায় খালি বিষ দিয়েছ, আমি অমৃত কোথায় পাব?' গিরিশ ঘোষকে যাহা দিয়াছেন, সে তাই দিয়ে আপনার পূজা করেছে। আমাদের বলিলে, হয়তো, এতক্ষণ তাঁর নামে রাজদ্বারে অভিযোগ করা হ'ত, আপনি পতিতপাবন—নিজে অঞ্জলি পেতে ল'য়ে এসেছেন!"

"রামবাবুর কথায় ঠাকুরের মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল, তাঁহার অক্ষিদ্বয়ে জল আসিল। ভক্তবৎসল করুণাময় তখনই উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, 'রাম, তবে গাড়ী আন, আমি গিরিশ ঘোষের বাড়ী যাব।' কোন কোন ভক্ত সেই দুই প্রহরের সুর্যোত্তাপে তাঁহার ক্লেশ হইবে বলিয়া আপত্তি করিলেন, কিন্তু তিনি তাহা না শুনিয়া সেই দণ্ডে শকটারোহণে গিরিশের বাটীতে চলিলেন।"

এদিকে গিরিশচন্দ্র নিশ্চিন্ত মনে আছেন, তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, যে তাঁহার মহা অপরাধ হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "অপরাধ ক'টা সামলাইব, তিনি যদি আমার অপরাধ ধরেন, তাহ'লে আমি রেণুর রেণু হ'য়ে যাই!" তবে ঠাকুরের ভক্তগণের হৃদয়ে ব্যথা দিয়াছেন বলিয়া গিরিশচন্দ্র অতিশয় অনুতপ্ত—ভক্তসমাজে কেমন করিয়া আর মুখ দেখাইবেন!

এমন সময় ভক্তগণসঙ্গে সহসা শ্রীরামকৃষ্ণদেব আসিয়া বলিলেন, "ঈশ্বর ইচ্ছায় এলুম।"

ঐ দিন পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ গিরিশচন্দ্রেব পদধূলি লইয়া বলিয়াছিলেন, "ধন্য তোমার বিশ্বাস ভক্তি!"

গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন, "জন্মদাতা পিতা যে অপরাধে ত্যজ্যপুত্র করে, সে অপরাধ—আমার পরম পিতার নিকট অপরাধ বলিয়া গণ্য হইল না। তিনি আমার বাড়ী আসিলেন, দর্শনলাভে চরিতার্থ হইলাম। কিন্তু দিন দিন অন্তর কুণ্ঠিত হইতে লাগিল। তিনি স্নেহময়—সম্পূর্ণ ধারণা রহিল; কিন্তু নিজ কার্যের গিরিশচন্দ্রের মানসিক পরিবর্তনের বিচিত্র প্রবাহে একটি ভাব খুবই প্রকট হয়েছিল—ঠাকুরের ভক্তদের মত ঠাকুরকে ঘিরে তাঁর ভক্তগণ খুবই আদর-নিষ্ঠায় সকল সময় নিয়োজিত থাকত ঠাকুরের সেবা করার জন্য। গিরিশচন্দ্র তাই মনে মনে ভাবলেন, আলোচনায় আপনি লজ্জিত লাগিলাম। ভক্তেবা কত প্রকারে তাঁহার পূজা করে ভাবিতে লাগিলাম। আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলাম।"

ঘটনাটি ঘটার বেশ কিছুদিন পর রামকৃষ্ণগত প্রাণ ভক্তপ্রবর দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাড়াতে ঠাকুর এসেছেন। গিরিশচন্দ্র তা জানতে পেরে শূণ্যভাবনায় সেখানে গেলেন। ঠাকুর গিরিশকে দেখেই বললেন,

.গিবিশ, তুই কিছু ভাবিসনে, তোকে দেখে লোক অবাক হয়ে যাবে।

.তুমি গালাগাল খারাপ কথা অনেক বল। তা হউক, ও সব বেরিয়ে যাওয়া ভাল। বদরক্ত রোগ কারু-কারুর কাছে। যত বেরিয়ে যায় ততই ভাল।

উপাধিনাশের সময়েই শব্দ হয়। কাঠ পোড়াবার সময় চড় চড় শব্দ করে। সব পুড়ে গেলে আর শব্দ থাকে না। তুমি দিন দিন শব্দ হবে। তোমার দিন দিন খুব উন্নতি হবে। লোকে দেখে অবাক হবে—আমি বেশী আসতে পারব না। তা হউক, তোমার এমনিই হবে।...

।। সাতাশ।।

নাটক রচনার বা নাট্য পরিচালনার প্রতি গিরিশচন্দ্রের কিছুটা ভাঁটা এসেছে—মানসিক দিক থেকে। প্রতি নিয়ত তার মনে-চিন্তায় ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভাবনা—তবে তিনি কে? মানুষ কি এমনি করে ভগবান হতে পারেন। সাধারন মানুষের মত চলা - বলা - আহার - নিদ্রা এমন কি রাগ-অনুরাগ তবে তিনি ভগবান! ভগবানের স্বরূপ কি? এই সকল নানাবিধ চিন্তায় গিরিশ বাড়ীতে একান্তমনে বারান্দায় বসে চিন্তা করেন—পন্ডিত বন্ধুদের কাছে, সন্ন্যাসীদের কাছে, পাড়ার বয়স্কদের কাছে প্রশ্ন করেন। আবার কখনও বা ছুটে যান রামচন্দ্র দত্তের কাছে, দক্ষিণেশ্বর, বলরাম বসুর বাড়ীতে বন্ধু দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের কাছে।

১৮৮৫ সাল। দুর্গাপূজার পর কালীপূজা। এই কালীপূজার মাধ্যমেও ঠাকুর রামকৃষ্ণের অধ্যাত্মসত্তার প্রকাশ ভক্তদের নয়নগোচর হয়। গিরিশচন্দ্র তা জেনেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের ইচ্ছা হল, কালীমূর্ত্তি তৈরী করে এবার শ্যামপুকুরের বাড়ীতে ঠাকুরের উপস্থিতিতে পূজোর ব্যবস্থা হবে। কিন্তু ঠাকুরের অসুস্থতার কারণে মূর্তিপূজায় আনন্দ-উত্তেজনায় ঠাকুরের শরীরে অসুবিধা হতে পারে অনুভব করে মূর্তিপূজার সংকল্প ত্যাগ করা হয়। কিন্তু ঠাকুর একসময় নিজেই কয়েকজন ভক্তকে পূজার উপকরণসহ সব ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন। কিন্তু পূজা কি পদ্ধতিতে— ষোড়শোপচারে না পঞ্চোপচারে—অন্নভোগে না ফলফলাদিতে— এ বিষয়ে ঠাকুর কোন নির্দেশ দিলেন না।

এদিকে দিন গত হল—রাত্রির কোলে ধরাধাম—কিন্তু ঠাকুর কোন উদ্যোগ নেবার কথা বলছেন না। ঠাকুর নিজে স্থিরভাবে শয্যায় বসে আছেন। ভক্তগণ পরপর পূজোর উপকরণ সংগ্রহ করে অত্যন্ত পবিত্র ও শুদ্ধভাবে ঠাকুরের শয্যা-পাশে সাজিয়ে রাখলেন।

....ঠাকুর তখন ও স্থির হইয়া বসিয়া আছেন দেখিয়া ভক্তগণ এখন তাঁহার নিকটে উপবেশন করিল এবং কেহ বা তাঁহার আদেশ প্রতীক্ষা করিয়া একমনে তাঁহাকে দেখিতে এবং কেহ বা জগজ্জননীর চিন্তা করিতে লাগিল। ঐরূপে গৃহ একেবারে নীরব এবং ত্রিশ বা ততোধিক ব্যক্তি উহার অন্তরে অবস্থান করিলেও জনশূণ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল।.....

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ।

কিন্তু ঠাকুর স্থির—অচঞ্চল হয়ে শয্যায় নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছেন—ভক্তদের মধ্যে আছেন মহেন্দ্রনাথ-রামচন্দ্র-দেবেন্দ্রনাথ-গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি প্রবীণগণ। গিরিশচন্দ্র ঠাকুরের খুবই বিশ্বস্ত চলমান মূর্তবিগ্রহ—*'পাঁচসিকে পাঁচ আনা'*।

উপস্থিত সকলে ঠাকুরের নীরবতায়—পূজা সম্পর্কে অনীহা নির্লিপ্ততার অবস্থা দেখে বিস্মিত। কিন্তু

> ....ঠাকুরের প্রতি অসীম বিশ্বাসবান গিরিশচন্দ্রের প্রাণে কিন্তু উহাতে অন্যভাবের উদয় হইল। তাঁহার মনে হইল, আপনার জন্য ঠাকুরের কালীপূজা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যদি বল, অহেতুকী ভক্তির প্রেরণায় তাঁহার পূজা করিবার ইচ্ছা হইয়াছে—তাহা হইলে উহা না করিয়া এরূপে স্থির হইয়া বসিয়া আছেন কেন? ....তবে কি তাঁহার শরীররূপ জীবন্ত প্রতিমায় জগদম্বার পূজা করিয়া ভক্তগণ ধন্য হইবে বলিয়া এই পূজায়োজন?—নিশ্চযই তাহাই। এইরূপ ভাবিয়া তিনি উল্লাসে অধীর হইলেন। এবং সম্মুখস্থ পুষ্পচন্দন সহসা গ্রহণপূর্বক 'জয় মা' বলিয়া ঠাকুরের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিলেন। ঠাকুরের সমস্ত শরীর উহাতে শিহরিয়া উঠিল এবং তিনি গভীর সমাধিমগ্ন হইলেন। তাঁহার মুখমন্ডল জ্যোর্তিময় এবং দিব্য হাস্যে বিকশিত হইয়া উঠিল এবং হস্তদ্বয় বরাভয় মুদ্রায় ধারণপূর্বক তাঁহাতে জগদম্বার আবেশেব পবিচয় প্রদান করিতে লাগিল।
>
> শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ (২) দ্বাদশ/দ্বিতীয় পাদ

এই ঘটনায় উপস্থিত ভক্তগণ 'জয় জয়' বলে আনন্দে হর্ষধ্বনি করতে করতে উল্লসিত হয়ে পুষ্পপত্র চন্দনসহ ঠাকুরের চরণে সমর্পন করতে লাগল। সাক্ষাৎ করুণাময়ী দেবী প্রতিমার বিভূতি-আলোয় উদ্ভাসিত ঠাকুরের দেহে যেন পবিত্র গন্ধে আর্বিভূতা হলেন। নিকটেই রাখা সংগৃহীত ফলমূল মিষ্টান্নটি হাতে নিয়ে ভক্তরা ঠাকুরকে খাবার জন্য দিলে ঠাকুর কিছু কিছু গ্রহণ করে সকলকে আশীর্বাদ করলেন।

গিরিশচন্দ্র এ দৃশ্যে এমনই ভাবায়িত হয়ে সর্বমনপ্রাণ ঠাকুরের চরণে নয়নদুটি স্থির রেখে আনন্দ আস্বাদনের অশ্রু প্লাবিত করেন। গভীর রাত পর্যন্ত গিরিশ ঠাকুরের দেহ থেকে জ্যোতিলোকে উদ্ভাসিত অন্য একটি সত্তার-উপলব্ধিতে ধ্যানস্থ ছিলেন।

গিরিশচন্দ্র তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সব কথা ঠাকুরকে অনায়াসে বিনাসংকোচে বলতেন—নির্দেশ চাইতেন ভাল জীবনের পথের জন্য। শৈশব থেকেই গিরিশচন্দ্র একগুঁয়ে প্রকৃতির। যা করতে নিষেধ করা হোত, সে কাজই গভীর উৎসাহে করার জন্য ব্যাকুল হতেন। কেউ তাতে বাধা দিত না। ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছেও কোন নিষেধ-উপদেশ গিরিশচন্দ্র শোনেন নি। ব্যক্তিগত দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কামনার উদীপ্ত প্রেরণায় যখন মত্ত হতেন তখন ঠাকুরকে স্মরণ করে গিরিশচন্দ্র শান্ত হতেন। ঠাকুর গিরিশচন্দ্রকে

মিথ্যা কথা বলতে বারণ করতেন— কিন্তু গিরিশ অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই উত্তরে বলতেন।

....আমি তো মিথ্যা কথা কই, কিরূপে সত্যবাদী হব...

উত্তরে স্নেহাসক্ত কণ্ঠে ঠাকুর বলতেন,

....গিরিশ ভাবিস না, তুই আমার মত সত্য মিথ্যার পার....

কি ভয়ানক কথা! গিরিশ যখনই কখনও মিথ্যা বলতেন সাথে সাথে পরমহংসদেবের মুর্তিটি তিনি দেখতে পেতেন।—তখন আর কোন মিথ্যা কথা মুখ দিয়ে আসত না।

গিরিশচন্দ্রের উপর ঠাকুরের অধিকার— স্নেহের অধিকার। সেই স্নেহ সকল পাপ মথিত হয়ে অমৃতের পথে গিরিশচন্দ্রকে চালিত করেছে অনবরত। সাংসারিক কিছু কাজে অনিবার্যভাবে নানা জটিল পরিস্থিতিতে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়—ঠিক। কিন্তু সচেতন ভাবেই তা নাশ হয় ঠাকুরের কথা স্মরণ করতে করতে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ গিরিশদের বার বার বলতেন,

....পাপ-পাপী কেউ নয়—পাপ কিসের? আমি কীট আমি কীট বলতে বলতে কীটই হয়ে যায়। আমি মুক্ত, আমি মুক্ত—বার বার এই কথাতেই মুক্ত হবার পথ খুলে যায়—সর্বদা মুক্ত অভিমান অন্তরে রাখ—তবেই কোনভাবেই পাপ স্পর্শ করবে না।

গিরিশ ঠাকুরের এই উদার্য স্নেহ-উদার আকুতিতে বিশ্বস্ত ছিলেন—বার বার সংকট সময়ে তাঁকে স্মরণ করে, শরণ নিয়ে মুক্ত হতেন।

।। আঠাশ ।।

১৮৮৫ মার্চ মাস ১১ই, দক্ষিণেশ্বর থেকে ঠাকুর রামকৃষ্ণ কলকাতার বাগবাজারের বলরাম বসু বাড়ীতে এলেন। বলরামবসুর গৃহ দেবতা শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ পেয়ে ঠাকুর বিশ্রাম করছেন। খবরটি গিরিশচন্দ্রের জানা ছিল যে ঠাকুর আসবেন। সেইমত গিরিশচন্দ্র সকাল সকাল অন্যান্য কাজ সেরে বলরাম বসুর বাড়ী এলেন—এলেন নরেন্দ্রনাথ—মাস্টার আরো অনেকে।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ 'মা - মা' বলে কাঁদেন আর বলেন,

"দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটীতে ব'সে ব'সে কাঁদেন; নিজের অন্তরঙ্গ দেখিবেন ব'লে ব্যাকুল! রাত্রে ঘুম নাই। মাকে বলেন, 'মা, ওর বড় ভক্তি, ওকে টেনে নাও; মা ওকে এখানে এনে দাও, যদি সে না আসতে পারে, তাহ'লে মা আমায় সেখানে লয়ে যাও, আমি দেখে আসি।' তাই বলরামের বাড়ি ছুটে ছুটে আসেন। লোকের কাছে কেবল বলেন, 'বলরামের ৺জগন্নাথের সেবা

আছে, খুব শুদ্ধ অন্ন।' যখন আসেন অমনি নিমন্ত্রণ করিতে বলরামকে পাঠান। বলেন, 'যাও—নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখালকে নিমন্ত্রণ করে এসো। এদের খাওয়ালে নারায়ণকে খাওয়ান হয়। এরা সামান্য নয়, এরা ঈশ্বরাংশে জন্মেছে, এদের খাওয়ালে তোমার খুব ভাল হবে।

বলরামের আলয়েই শ্রীযুক্ত গিবিশ ঘোষের সঙ্গে প্রথম ব'সে আলাপ।

...শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি)-–তুমি একবার নরেন্দ্রের সঙ্গে বিচার ক'রে দেখো, সে কি বলে।

গিরিশ (সহাস্যে)—নবেন্দ্র বলে, ঈশ্বর অনন্ত। যা কিছু আমরা দেখি, শুনি,—জিনিষটি, কি ব্যক্তিটি—সব তাঁর অংশ, এ পর্যন্ত আমাদের বলবার যো নাই। Infinity (অনন্ত আকাশ)—তার আবার অংশ কি? অংশ হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈশ্বব অনন্ত হউন আর যত বড় হউন, —তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর ভিতরের সাব বস্তু মানুষের ভিতর দিয়ে আসতে পারে ও আসে। তিনি অবতার হ'য়ে থাকেন, এটি উপমা দিয়ে বুঝান যায় না। অনুভব হওয়া চাই। প্রত্যক্ষ হওযা চাই। উপমাব দ্বারা কতকটা আভাস পাওয়া যায়। গরুর মধ্যে শিংটা যদি ছোঁয়, গরুকেই ছোঁয়া হ'ল; পা'টা বা লেজটা ছুঁলেও গরুটাকে ছোঁযা হ'লো। কিন্তু আমাদের পক্ষে গরুর ভিতবেব সাব পদার্থ হচ্ছে দুধ। সেই দুধ বাঁট দিযে আসে।

"সেইরূপ প্রেম ভক্তি শিখাবার জন্য ঈশ্বর মানুষ দেহ ধারণ ক'রে সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হন।"

গিরিশ—নবেন্দ্র বলে, তাঁব কি সব ধারণা করা যায। তিনি অনন্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি)-–ঈশ্বরের সব ধারণা কে ক'রতে পারে? তা তাঁর বড় ভাবটাও পারে না, আবার ছোট ভাবটাও পারে না। আর সব ধারণা করা কি দরকার? তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারলেই হ'ল। তাঁর অবতারকে দেখলেই তাঁকে দেখা হ'ল। যদি কেউ গঙ্গার কাছে গিয়ে গঙ্গা জল স্পর্শ কবে, সে বলে—গঙ্গা দর্শন স্পর্শন ক'রে এলুম। সব গঙ্গাটা হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত, হাত দিয়ে ছুঁতে হয় না। (সকলেব হাস্য)।

"তোমার পা'টা যদি ছুঁই, তোমায় ছোঁয়াই হ'ল। (হাস্য)।

"যদি সাগরেব কাছে গিয়ে একটু জল স্পর্শ কবো, তাহ'লে সাগর স্পর্শ করাই হ'ল। অগ্নিতত্ত্ব সব জায়গায় আছে, তবে কাঠে বেশী।"

গিরিশ (হাসিতে হাসিতে)-- যেখানে আগুন পাবো, সেইখানেই আমার দরকার।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)—অগ্নিতত্ত্ব কাঠে বেশী। ঈশ্বরতত্ত্ব যদি খোঁজ, মানুষে খুঁজবে। মানুষে তিনি বেশী প্রকাশ হন। যে মানুষে দেখবে উর্জিতাভক্তি— প্রেমভক্তি উথলে পড়ছে—ঈশ্বরের জন্য পাগল—তাঁর প্রেমে মাতোয়ারা— সেই মানুষে নিশ্চিত জেনো, তিনি অবতীর্ণ হ'য়েছেন।

(মাস্টার দৃষ্টে)—"তিনি তো আছেনই, তবে তাঁর শক্তি কোথাও বেশী প্রকাশ, কোথাও বা কম প্রকাশ। অবতারের ভিতর তাঁর শক্তি বেশী প্রকাশ; সেই শক্তি কখন কখন পূর্ণভাবে থাকে। শক্তিরই অবতার।"

গিরিশ—নরেন্দ্র বলে, তিনি অবাঙ্মনসোগোচরম্।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না; এ মনের গোচর নয় বটে— শুদ্ধ মনের গোচর। এ বুদ্ধির গোচর নয়—কিন্তু শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর। কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি গেলেই, শুদ্ধ-মন আর শুদ্ধ বুদ্ধি হয়। তখন শুদ্ধ মন শুদ্ধবুদ্ধি এক। শুদ্ধমনের গোচর। ঋষি-মুনিরা কি তাঁকে দেখেন নাই? তাঁবা চৈতন্যের দ্বারা চৈতন্যের সাক্ষাৎকার করেছিলেন।

গিরিশ (সহাস্যে)— নরেন্দ্র আমার কাছে তর্কে হেরেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না; আমায় ব'লেছে, 'গিরিশ ঘোষের মানুষকে অবতার ব'লে অত বিশ্বাস; এখন আমি আর কি বলবো! অমন বিশ্বাসের উপর কিছু ব'লতে নাই।'

গিরিশ (সহাস্যে)—মহাশয়! আমরা সব হল হল ক'রে কথা কচ্ছি কিন্তু মাষ্টার ঠোঁট চেপে বসে আছে। কি ভাবে? মহাশয়! কি বলুন!

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)—"মুখহলসা, ভেতরবুঁদে, কানতুলসে, দীঘল ঘোমটা নারী, পানা পুকুরের শীতল জল বড় মন্দকারী। (সকলের হাস্য)। (সহাস্যে)—কিন্তু ইনি তা নন—ইনি 'গম্ভীরাত্মা'। (সকলের হাস্য)।

গিরিশ—মহাশয়, শ্লোকটি কি বললেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—এই কটি লোকের কাছে সাবধান হবে; প্রথম মুখহলসা—হল হল করে কথা কয়; তারপর ভেতর বুঁদে—মনের ভিতর ডুবুরি নামালেও অন্ত পাবে না;তারপর কানতুলসে—কানে তুলসী দেয়, ভক্তি জানাবার জন্য; দীঘল ঘোমটা, লোকে মনে করে ভারী সতী, তা নয়; আর পানাপুকুরের জল—নাইলে সান্নিপাতিক হয়। (হাস্য)

ঠাকুর গান শুনিবেন ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বলরামের বৈঠকখানায় এক ঘর লোক। সকলেই তাঁহার পানে চাহিয়া আছেন—কি বলেন শুনিবেন, কি করেন দেখিবেন।

শ্রীযুক্ত তারাপদ গাহিতেছেন,—

কেশব কুরু করুণা দীনে, কুঞ্জকাননচারী।
মাধব মনোমোহন, মোহনমুরলীধারী।।
(হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, মন আমার)।
ব্রজকিশোর, কালীয়হর, কাতর-ভয়-ভঞ্জন,
নয়ন বাঁকা, বাঁকা-শিখিপাখা রাধিকা-হৃদিরঞ্জন—
গোবর্ধনধারণ, বনকুসুমভূষণ, দামোদর কংসদর্পহারী।
শ্যামরাসরসবিহারী। (হরিবোল, ইত্যাদি)।।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি)—আহা, বেশ গানটি! তুমিই কি সব গান বেঁধেছ?

একজন ভক্ত—হাঁ, উনিই চৈতন্যলীলার সব গান বেঁধেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি)—এ গানটি খুব উতরেছে।

(গায়কের প্রতি)—"নিতাই-এর গান গাইতে পারো?"

আবার গান হইল, নিতাই গেয়েছিলেন—

কিশোরীর প্রেম নিবি আয়, প্রেমের জুয়ার বয়ে যায়।
বইছে রে প্রেম শতধারে, যে যত চায় তত পায়।।
প্রেমের কিশোরী, প্রেম বিলায় সাধ করি, রাধার প্রেমে বলরে হরি;
প্রেমে প্রাণ মত্ত করে, প্রেম তরঙ্গে প্রাণ নাচায়।
রাধার প্রেমে হরি বলি, আয় আয় আয় আয়।।

শ্রীগৌরাঙ্গের গান হইল—

কার ভাবে গৌর বেশে জুড়ালে হে প্রাণ।
প্রেম সাগরে উঠলো তুফান, থাকবে না আর কুল মান।।
(মন মজালে গৌর হে)
ব্রজ মাঝে, রাখাল সাজে, চরালে গোধন;
ধ'রলে করে মোহন বাঁশি, মজলো গোপীর মন;
ধ'রে গোবর্ধন, রাখলে বৃন্দাবন,
মানের দায়ে. ধ'রে গোপীর পায়, ভেসে গেল চাঁদ বয়ান।।
(মন মজালে গৌর হে)

....গিরিশ (ঠাকুরের প্রতি)—আচ্ছা, মহাশয়! আমি ছেলেবেলায় কিছু লেখাপড়া করি নাই, তবু লোকে বলে বিদ্বান!

শ্রীরামকৃষ্ণ—মহিম চক্রবর্তী অনেক শাস্ত্র-টাস্ত্র দেখেছে শুনেছে—খুব আধাব! (মাস্টারের প্রতি)— কেমন গা?

মাস্টার- আজ্ঞে হাঁ।

গিরিশ কি? বিদ্যা! ও অনেক দেখেছি! ওতে আর ভুলি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)—এখানকার ভাব কি জান? বই শাস্ত্র এ-সব কেবল ঈশ্বরের কাছে পৌঁছিবার পথ ব'লে দেয়। পথ, উপায়, জেনে লবার পর, আর বই শাস্ত্রে কি দরকার? তখন নিজে কাজ ক'রতে হয়।

"একজন একখানা চিঠি পেয়েছিল, কুটুম বাড়ি তত্ত্ব ক'রতে হবে, কি কি জিনিস লেখা ছিল। জিনিস কিনতে দেবার সময় চিঠিখানি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কর্তাটি তখন খুব ব্যস্ত হ'য়ে চিঠির খোঁজ আরম্ভ করলেন। অনেকক্ষণ ধ'রে অনেকজন মিলে খুঁজলে। শেষে চিঠিখানা পাওয়া গেল। তখন আর আনন্দের সীমা নাই। কর্তা ব্যস্ত হ'য়ে অতি যত্নে চিঠিখানা হাতে নিলেন আর দেখতে লাগলেন, কি লেখা আছে। লেখা এই, পাঁচ সের সন্দেশ পাঠাইবে, একখানা কাপড় পাঠাইবে; আরও কত কি। তখন আর চিঠির দরকার নাই, চিঠি ফেলে দিয়ে সন্দেশ ও কাপড়ের আর অন্যান্য জিনিসের চেষ্টায় বেরুলেন। চিঠির দরকার কতক্ষণ? যতক্ষণ সন্দেশ, কাপড় ইত্যাদির বিষয় না জানা যায়। তারপরই পাবার চেষ্টা।

"শাস্ত্রে তাঁকে পাবার উপায়ের কথা পাবে। কিন্তু খবর সব জেনে কর্ম আরম্ভ ক'রতে হয়। তবে তা বস্তুলাভ!

"শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে? অনেক শ্লোক, অনেক শাস্ত্র, পণ্ডিতের জানা থাকতে পারে; কিন্তু যার সংসারে আসক্তি আছে, যার কামিনী-কাঞ্চনে মনে মনে ভালবাসা আছে, তার শাস্ত্র ধারণা হয় না—মিছে পড়া। পাঁজিতে লিখেছে, বিশ আড়া জল, কিন্তু পাঁজি টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না। এক ফোঁটাই পড়—কিন্তু এক ফোঁটাও পড়ে না।" (সকলের হাস্য)।

গিরিশ (সহাস্যে)—মহাশয়। পাঁজি টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না? (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণে (সহাস্যে)—পণ্ডিত খুব লম্বা লম্বা কথা বলে, কিন্তু নজর কোথায়? কামিনী আর কাঞ্চনে, দেহের সুখ আর টাকায়।

"শকুনি খুব উঁচুতে উড়ে, কিন্তু নজর ভাগাড়ে (হাস্য)। কেবল খুঁজছে, কোথায় মড়া জানোয়ার, কোথায় ভাগাড়, কোথায় মড়া।

(গিরিশের প্রতি)—"নরেন্দ্র খুব ভাল; গাইতে বাজাতে, পড়ায় শুনায় বিদ্যায়; এদিকে জিতেন্দ্রিয়, বিবেক বৈরাগ্য আছে, সত্যবাদী। অনেক গুণ।

(মাস্টারের প্রতি)—আজ্ঞে হাঁ, খুব ভাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (জনান্তিকে, মাস্টারের প্রতি)—দেখ, ওর (গিরিশের) খুব অনুরাগ আর বিশ্বাস।

মাস্টার অবাক হইয়া গিরিশকে একদৃষ্টে দেখিতেছেন। গিরিশ ঠাকুরের কাছে কয়েকদিন আসিতেছেন মাত্র। মাস্টার কিন্তু দেখিলেন যেন পূর্বপরিচিত—

শুদ্ধবুদ্ধি শুদ্ধআত্মা দ্বারা শুদ্ধআত্মাকে সাক্ষাৎকার ক'রেছিলেন।

গিরিশ (নরেন্দ্রের প্রতি)—মানুষের অবতার না হ'লে কে বুঝিয়ে দেবে? মানুষকে জ্ঞান ভক্তি দিবার জন্য তিনি দেহ ধারণ ক'রে আসেন। না হ'লে কে শিক্ষা দেবে?

নরেন্দ্র—কেন? তিনি অন্তরে থেকে বুঝিয়ে দেবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে) হাঁ, হাঁ, অন্তর্যামীরূপে তিনি বুঝাবেন।

তারপর ঘোরতর তর্ক। ইনফিনিটি—তার কি অংশ হয়? আবার হ্যামিলটন কি বলেন? হার্বার্ট স্পেন্সার কি বলেন? টিণ্ডেল, হাক্সলে বা কি ব'লে গেছেন, এই কথা হ'তে লাগল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি)— দেখ, ইগুণো[৭৭] আমার ভাল লাগছে না। আমি সব তাই দেখছি। বিচার আর কি করবো? দেখছি—তিনিই সব। তিনিই সব হয়েছেন। তাও বটে, আবার তাও বটে; এক অবস্থায় অখণ্ডে মনবুদ্ধি হারা হয়ে যায়—নরেন্দ্রকে দেখে আমার মন অখণ্ডে লীন হয়! গিরিশের প্রতি—তাঁর কি করলে বল দেখি।

গিরিশ—ঐটে ছাড়া প্রায় সব বুঝেছি কিনা।

অনেক আলোচনা বলছে। বাত ও অনেক হল। গিরিশচন্দ্র আলোচনার মধ্যেস্থ বললেন

....আপনাকে ছেড়ে আবার থিয়েটারে যেতে হবে।

.... গিরিশ—থিয়েটারগুলো ছোঁড়াদেরই ছেড়ে দেই মনে করছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না, না, ও বেশ আছে;অনেকের উপকার হচ্ছে।

(শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত)

।। উনত্রিশ ।।

ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার—এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিরিশচন্দ্র বারবার রামকৃষ্ণের কাছে যেতেন—আলোচনা করতেন—অনুভব করতে সচেষ্ট হতেন। নরেন্দ্রনাথও সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছেন ঠাকুর রামকৃষ্ণের সাথে নানা প্রশ্নও আলোচনা। পাশ্চাত্যশিক্ষা ও প্রসারিত ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দের আচার-বিচারে নরেন্দ্রনাথও সাকার-নিরাকার তত্ত্বের পর্যালোচনায় মনকে গভীরভাবে নিযুক্ত করে চলেছেন—এ বিষয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণ যতটুকু আভাসে ইঙ্গিতে বলতেন তাতে গিরিশচন্দ্র ও নরেন্দ্রনাথের বেশ বুদ্ধি ও চিন্তার রাজ্যে ঝড় বইতে থাকতো। সেটাই ঠাকুর রামকৃষ্ণের অন্তরপ্রবাহের দৈত্যক্রিয়া গভীরভাবে প্রকাশ লাভ করেছিল। এবং তাতে তিনি বেশ মজার আনন্দে বিভোর হতেন।

সাকার নিরাকার তর্কে গিরিশচন্দ্র ও নরেন্দ্রনাথ গভীর আলোচনায় যখন মগ্ন থাকতেন তখন ঠাকুর নিজে থেকেই সেখানে উপস্থিত— নিজে তর্কের ইন্ধন জুগিয়ে মজা লুটতেন।

> ....ঐরূপ তর্কে স্বামীজীর মুখের সামনে বড় একটা কেহ দাঁড়াইতে পারিতেন না এবং স্বামীজীর তীক্ষ্ম যুক্তির সম্মুখে নিরুত্তর হইয়া কেহ কেহ মনে মনে ক্ষুন্নও হইতেন। ঠাকুরও সে কথা অপরের নিকট অনেক সময় আনন্দের সহিত বলিতেন, অমুকের কথাগুলো নরেন্দ্র সেদিন কঁ্যাচ কঁ্যাচ করে কেটে দিলে! কি বুদ্ধি!... সাকারবাদী গিরিশের সহিত তর্কে কিন্তু স্বামীজীকে একদিন নিরুত্তর হইতে হইয়াছিল। সেদিন ঠাকুর শ্রীযুক্ত গিরিশের বিশ্বাস আর দৃঢ় ও পুষ্ট করিবার জন্যই যেন তাঁহার পথে ছিলেন বলিয়া আমাদের বোধ হইয়াছিল
>
> শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ লীলামৃত : গুরুভাব
> পূর্বাধ্য ২য় অধ্যায়।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ঠাকুর রামকৃষ্ণকে চিকিৎসা করতেন, তাই মাঝে মাঝে তার কাছে আসতেন। সেসময় গিরিশচন্দ্রও ঠাকুরকে দেখতে যেতেন—উপস্থিত হয়ে ঠাকুরকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতেন—মাথা অবনত করে তৃপ্তি পেতেন।

ডাক্তার সরকার এইসব দৃশ্য পছন্দ করতেন না। তাই একদিন গিরিশচন্দ্রকে বললেন, ...আর সব কর—but do not worship him as God. এমন ভাল লোকটার মাথা খাচ্ছ?

গিরিশচন্দ্র—কি করি মহাশয়? যিনি এ সংসার-সমুদ্র ও সন্দেহসাগর থেকে পার করলেন, তাঁকে আর কি করবো বলুন। তাঁর গু কি গু বোধ হয়?

ডাক্তার—গু'র জন্য হচ্ছে না। আমারও ঘৃণা নাই! একটা দোকানীর ছেলে এসেছিল, তা বাহ্যে করে ফেললে! সকলে নাকে কাপড় দিলে! আমি তার কাছে আধ ঘণ্টা বসে! নাকে কাপড় দিই নাই। আর মেথর যতক্ষণ না মাথায় করে নিয়ে যায়, ততক্ষণ আমার নাকে কাপড় দেবার যো নাই। আমি জানি সেও যা, আমিও তা, কেন তাকে ঘৃণা করব? আমি কি এঁর পায়ের ধূলা নিতে পারি না?—এই দেখ নিচ্ছি। (শ্রীরামকৃষ্ণের পদধূলি গ্রহণ)।

গিরিশ— Angels (দেবগণ) এই মুহূর্তকে ধন্য ধন্য করছেন।

ডাক্তার—তা পায়ের ধূলা লওয়া কি আশ্চর্য! আমি যে সকলেরই নিতে পারি। —এই দাও। এই দাও! (সকলের পায়ের ধূলা গ্রহণ)।

নরেন্দ্র (ডাক্তারের প্রতি)—এঁকে আমরা ঈশ্বরের মত মনে করি। কি রকম জানেন? যেমন ভেজিটেবল্ ক্রিয়েসন্ (উদ্ভিদ) ও অ্যানিম্যাল ক্রিয়েসন (জীবজন্তুগণ) এদের মাঝামাঝি এমন একটি পয়েন্ট (স্থান) আছে, যেখানে এটা উদ্ভিদ কি প্রাণী,

স্থির করা ভারী কঠিন। সেইরূপ Man-world (নরলোক) ও God-world (দেবলোক) এই দুয়ের মধ্যে একটি স্থান আছে, যেখানে বলা কঠিন, এ ব্যক্তি মানুষ, না, ঈশ্বর।

ডাক্তার—ওহে, ঈশ্বরের কথায় উপমা চলে না।

নরেন্দ্র—আমি God (ঈশ্বর) বলছি না, God like man (ঈশ্বর তুল্য ব্যক্তি) বলছি।

ডাক্তার—ও সব নিজের নিজের ভাব চাপতে হয়। প্রকাশ করা ভাল নয়। আমার ভাব কেউ বুঝলে না। My best friends (যারা আমার পরম বন্ধু) আমায় কঠোর নির্দয় মনে করে। এই তোমরা হয়তো আমায় জুতো মেরে তাড়াবে!

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)—সেকি!—এরা তোমায় কত ভালবাসে! তুমি আসবে বলে বাসক-সজ্জা করে জেগে থাকে।

গিরিশ—Every one has the greatest respect for you. (সকলেই আপনাকে যৎপরোনাস্তি শ্রদ্ধা করে)।

ডাক্তার—আমার ছেলে—আমার স্ত্রী পর্যন্ত—আমায় মনে করে hard-hearted (স্নেহমমতা শূন্য),— কেন না, আমার দোষ এই যে, আমি ভাব কারু কাছে প্রকাশ করি না।

গিরিশ—তবে মহাশয়! আপনার মনের কবাট খোলা তো ভাল— at least out of pity for your friends (বন্ধুদের প্রতি অন্তত কৃপা করে)—এই মনে করে যে, তারা আপনাকে বুঝতে পারছে না।

ডাক্তার—বলবো কি হে! তোমাদের চেয়েও আমার feelings worked-up হয় (অর্থাৎ আমার ভাব হয়)। (নরেন্দ্রর প্রতি)। Shed tears in solitude—(আমি একলা একলা বসে কাঁদি)।

ডাক্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—ভাল, তুমি ভাব হ'লে লোকের গায় পা দাও, সেটা ভাল নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি কি জানতে পারি গা, কারু গায়ে পা দিচ্ছি কি না!

ডাক্তার—ওটা ভাল নয়, একটু তো বোধ হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার ভাবাবস্থায় আমার কি হয় তা তোমায় কি ব'লবো? সে অবস্থার পর এমন ভাবি, বুঝি রোগ হচ্চে ঐ জন্য! ঈশ্বরের ভাবে আমার উন্মাদ হয় উন্মাদে এরূপ হয়, কি ক'রবো?

ডাক্তার—ইনি মেনেছেন। He expresses regret for what he does; কাজটা sinful (অন্যায়) এটি বোধ আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)—তুই তো খুব শঠ (বুদ্ধিমান), তুই বল না; একে বুঝিয়ে দে না।

গিরিশ (ডাক্তারের প্রতি)—মহাশয়! আপনি ভুল বুঝছেন। উনি সে জন্য দুঃখিত হন নি। এঁর দেহ শুদ্ধ— অপাপবিদ্ধ। ইনি জীবের মঙ্গলের জন্য তাদের স্পর্শ করেন।

তাদের পাপ গ্রহণ ক'রে এঁর রোগ হবার খুব সম্ভাবনা, তাই কখনও কখনও ভাবেন। আপনার যখন কলিক (শূলবেদনা) হ'য়েছিল তখন আপনার কি রিগ্রেট (দুঃখ) হয় নাই, কেন রাত জেগে এত প'ড়তুম? তা বলে রাত জেগে পড়াটা কি অন্যায় কাজ? রোগের জন্য রিগ্রেট (দুঃখ-কষ্ট) হ'তে পারে। তা বলে জীবের মঙ্গল সাধনের জন্য স্পর্শ করাকে অন্যায় কাজ মনে করেন না।

ডাক্তার (অপ্রতিভ হইয়া, গিরিশের প্রতি)—তোমার কাছে হেরে গেলুম, দাও পায়ের ধুলা দাও। (গিরিশের পদধূলি গ্রহণ)। (নরেন্দ্রের প্রতি)—আর কিছু নয় হে, his intellectual power (গিরিশের বুদ্ধিমত্তা) মানতে হবে।

নরেন্দ্র (ডাক্তারের প্রতি)—আর এক কথা দেখুন। একটা Scientific discovery (জড় বিজ্ঞানের সত্য বাহির) করবার জন্য আপনি life devote (জীবন উৎসর্গ) করতে পারেন—শরীর অসুখ ইত্যাদি কিছুই মানেন না। আর ঈশ্বরকে জানা grandest of all sciences (শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান)-এর জন্য ইনি health risk (শরীর নষ্ট হয় হউক, এরূপ মনের ভাব) করবেন না?

ডাক্তার—যত religious reformer (ধর্মাচার্য) হয়েছেন, Jesus, চৈতন্য, বুদ্ধ, মহম্মদ শেষে সব অহঙ্কার আছে, এ দোষ ধরাতে ঠিক সেই দোষ আপনারও হচ্ছে।

ডাক্তার নীরব হইলেন।

নরেন্দ্র (ডাক্তারের প্রতি)—We offer to him Worship bordering on Divine Worship (এঁকে আমরা পূজা করি— সে পূজা ঈশ্বরের পূজার পায় কাছাকাছি)—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দে বালকের ন্যায় হাসিতেছেন।

....পৌষমাসের অর্ধেক অতীত হইয়া ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি উপস্থিত হইল। ঠাকুর ঐ দিন বিশেষ সুস্থ বোধ করায় কিছুক্ষণ উদ্যানে বেড়াইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। অবকাশের দিন বলিয়া সেদিন গৃহস্থ ভক্তগণ মধ্যাহ্ন অতীত হইবার কিছু পরেই একে একে অথবা দলবদ্ধ হইয়া উদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। ঐরূপে অপরাহ্ন ৩টার সময় ঠাকুর যখন উদ্যানে বেড়াইবার জন্য উপর হইতে নিচে নামিলেন তখন ত্রিশজনেরও অধিক ব্যক্তি গৃহমধ্যে অথবা উদ্যানস্থ বৃক্ষসকলের তলে বসিয়া পরস্পরের সহিত বাক্যালাপে নিযুক্ত ছিল। তাঁহাকে দেখিয়াই সকলে সসম্ভ্রমে উত্থিত হইয়া প্রণাম করিল এবং তিনি নিম্নের হলঘরের পশ্চিমের দ্বার দিয়া উদ্যানপথে নামিয়া দক্ষিণমুখে ফটকের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলে পশ্চাতে কিঞ্চিৎ দূরে থাকিয়া তাঁহাকে অনুসরণ করিতে লাগিল। ঐরূপে বসতবাটী ও ফটকের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া ঠাকুর গিরিশ, রাম, অতুল প্রভৃতি কয়েকজনকে পশ্চিমের বৃক্ষতলে দেখিতে পাইলেন। তাহারাও তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তথা হইতে প্রণাম করিয়া সানন্দে তাঁহার নিকটে

উপস্থিত হইল। কেহ কোন কথা কহিবার পূর্বেই ঠাকুর সহসা গিরিশচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "গিরিশ, তুমি যে সকলকে এত কথা (আমার অবতারত্ব সম্বন্ধে) বলিয়া বেড়াও, তুমি (আমার সম্বন্ধে) কি দেখিয়াছ ও বুঝিয়াছ?" গিরিশ উহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে ভূমিতে জানু সংলগ্ন করিয়া উপবিষ্ট হইয়া ঊর্ধ্বমুখে করজোড়ে গদ্গদ স্বরে বলিয়া উঠিল, "ব্যাস-বাল্মীকি যাঁহার ইয়ত্তা করিতে পারেন নাই, আমি তাঁহার সম্বন্ধে অধিক কি আর বলিতে পারি।" গিরিশের অন্তরের সরল বিশ্বাস প্রতি কথায় ব্যক্ত হওয়ায় ঠাকুর মুগ্ধ হইলেন এবং তাহাকে উপলক্ষ করিয়া সমবেত ভক্তগণকে বলিলেন, "তোমাদের কি আর বলিব, আশীর্বাদ করি, তোমাদের চৈতন্য হউক।" ভক্তগণের প্রতি প্রেম ও করুণায় আত্মহারা হইয়া তিনি ঐ কথাগুলি মাত্র বলিয়াই ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। স্বার্থগন্ধহীন তাঁহার সেই গভীর আশীর্বাণী প্রত্যেকের অন্তরে প্রবল আঘাত প্রদানপূর্বক আনন্দস্পন্দনে উদ্বেল করিয়া তুলিল। তাহারা দেশ কাল ভুলিল, ঠাকুরের ব্যাধি ভুলিল, ব্যাধি আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাকে স্পর্শ না করিবার তাহাদের ইতিপূর্বের প্রতিজ্ঞা ভুলিল এবং সাক্ষাৎ অনুভব করিতে লাগিল যেন তাহাদের দুঃখে ব্যথিত হইয়া কোন এক অপূর্ব দেবতা হৃদয়ে অনন্ত যাতনা ও করুণা পোষণপূর্বক বিন্দুমাত্র নিজ প্রয়োজন না থাকিলেও মাতার ন্যায় তাহাদিগের স্নেহাঞ্চলে আশ্রয় প্রদান করিতে ত্রিদিব হইতে সম্মুখে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে সস্নেহে আহ্বান করিতেছেন। তাঁহাকেই প্রণাম ও তাঁহার পদধুলি গ্রহণের জন্য তাহারা তখন ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং জয়রবে দিক মুখরিত করিয়া একে একে আসিয়া প্রণাম করিতে আরম্ভ করিল। ঐরূপ প্রণাম করিবার কালে ঠাকুরের করুণাব্ধি আজি বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া অদৃষ্টপূর্ব ব্যাপার উপস্থিত করিল। কোন কোন ভক্তের প্রতি করুণায় ও প্রসন্নতায় আত্মহারা হইয়া দিব্য শক্তিপূত স্পর্শে তাহাকে কৃতার্থ করিতে আমরা ইতেপূর্বে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে প্রায় নিত্যই দেখিয়াছিলাম, অদ্য অধাবাহ্যদশায় তিনি সমবেত প্রত্যেক ভক্তকে ঐভাবে স্পর্শ করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার ঐরূপ আচরণে ভক্তগণের আনন্দের অবধি রহিল না। তাহারা বুঝিল আজি হইতে তিনি নিজ দেবত্বের কথা শুদ্ধ তাহাদিগের নিকট নহে, কিন্তু সংসারে কাহারও নিকটে আর লুক্কায়িত রাখিবেন না এবং পাপী তাপী সকলে এখন হইতে সমভাবে তাঁহার অভয়পদে আশ্রয় লাভ করিবে—নিজ নিজ ত্রুটি, অভাব ও অসামর্থ্য-বোধ হইতে তদ্বিষয়েও তাহাদিগের বিন্দুমাত্র সংশয় রহিল না। সুতরাং ঐ অপূর্ব ঘটনায় কেহবা বাঙনিস্পত্তি করিতে অক্ষম হইয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহাকে কেবলমাত্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, কেহবা গৃহমধ্যস্থ সকলকে ঠাকুরের কৃপালাভে

ধন্য হইবার জন চিৎকার করিয়া আহ্বান করিতে লাগিল, আবার কেহবা পুষ্পচয়নপূর্বক মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে ঠাকুরের অঙ্গে উহা নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ ঐরূপ হইবার পরে ঠাকুরের ভাব শান্ত হইতে দেখিয়া ভক্তগণও পূর্বের ন্যায় প্রকৃতিস্থ হইল এবং অদ্যকার উদ্যান-ভ্রমণ ঐরূপে পরিসমাপ্ত করিয়া তিনি বাটীর মধ্যে নিজ কক্ষে যাইয়া উপবিষ্ট হইলেন।

রামচন্দ্র প্রমুখ কোন কোন ভক্ত অদ্যকার এই ঘটনাটিকে ঠাকুরের 'কল্পতরু' হওয়া বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের বোধ হয়, উহাকে ঠাকুরের অভয়-প্রকাশ অথবা আত্মপ্রকাশপূর্বক সকলকে অভয়-প্রদান বলিয়া অভিহিত করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। প্রসিদ্ধি আছে, ভাল বা মন্দ যে যাহা প্রার্থনা করে কল্পতরু তাহাকে তাহাই প্রদান করে। কিন্তু ঠাকুর তো ঐরূপ করেন নাই, নিজ দেব-মানবত্বের এবং জনসাধারণকে নির্বিচারে অভয়াশ্রয়প্রদানের পরিচয়ই ঐ ঘটনায় সুব্যক্ত করিয়াছিলেন।....

....অদ্যকার ঘটনাস্থলে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদিগের আট—দশজনের নামই মাত্র আমাদিগের স্মরণ হইতেছে, যথা—গিরিশ, অতুল, রাম, নবগোপাল, হরমোহন, বৈকুণ্ঠ, কিশোরী (রায়), হারাণ, রামলাল, অক্ষয়। 'কথামৃত'—লেখক মহেন্দ্রনাথও বোধ হয় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ঠাকুরের সন্ন্যাসী ভক্তগণের একজনও ঐদিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল না। নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ তাহাদিগের অনেকে ঠাকুরের সেবাদি ভিন্ন পূর্বরাত্রে অধিকক্ষণ সাধন-ভজনে নিযুক্ত থাকায় ক্লান্ত হইয়া গৃহমধ্যে নিদ্রা যাইতেছিলেন। লাটু ও শরৎ জাগ্রত থাকিলেও এবং ঠাকুরের কক্ষের দক্ষিণে অবস্থিত দ্বিতলের ছাদ হইতে ঐ ঘটনা দেখিতে পাইলেও স্বেচ্ছায় ঘটনাস্থলে গমন করে নাই। কারণ, ঠাকুর উদ্যানে পাদচারণ করিতে নিচে নামিবামাত্র তাহারা ঐ অবকাশে তাঁহার শয্যাদি রৌদ্রে দিয়া ঘরখানির সংস্কারে নিযুক্ত হইয়াছিল এবং কর্তব্য কার্য অর্ধনিষ্পন্ন করিয়া ফেলিয়া যাইলে ঠাকুরের অসুবিধা হইতে পারে ভাবিয়া তাহাদিগের ঘটনাস্থলে যাইতে প্রবৃত্তি হয় নাই।....

(শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ সারদানন্দ।)

।। ত্রিশ ।।

গিরিশচন্দ্রের নাটক ও নাটকের পরিচালনায় বাঙলা নাট্যমঞ্চে ও জগতে 'স্টার থিয়েটারের' নাম সর্বত্র অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সঙ্গে দিন দিন বিদিত হতে

লাগল। সংস্কৃতির অঙ্গনে গিরিশচন্দ্রের নাটকের অভিনেতা ও অভিনেত্রীবৃন্দের মর্যাদা তখনও পর্যন্ত তেমনভাবে বরণীয় না হলেও একেবারে ফেলে দেবার নয়। তা'ছাড়া নট-নটীতে অন্তর-প্রীতি ও প্রসন্নতার আনন্দ তাদের একটি বিশেষ লোকের অনুভূতি সমৃদ্ধ সচেতন মাধুর্যে রূপান্তরিত করে তুলত প্রতিদিন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এই স্টার থিয়েটারে নিজে এসে কয়েকটি নাটক দেখেছেন এবং নট-নটীদের আশীর্বাদ করেছেন। গিরিশচন্দ্র তার কেন্দ্র সঞ্চার-কর্তা। বেশ পর পর গিরিশচন্দ্রের নাটকের অভিনয় চলছিল—ঠিক এমনি সময়ে হঠাৎ কিছু কালো অশুভ মেঘ গিরিশচন্দ্র-স্টার থিয়েটার-নট-নটীদের বেশ ভাবিয়ে তুলল।

কলুটোলায় বিখ্যাত পয়সাওয়ালা মতিলাল শীলের পৌত্র গোপাললাল শীল উত্তরাধিকারীসূত্রে বিশাল অর্থের ও সম্পদের মালিক হলেন। অর্থের দম্ভে তাঁর ইচ্ছা হোল অন্যান্য ব্যবসার সাথে 'থিয়েটারের' ব্যবসাও করবেন— যেই ইচ্ছা অমনি তিনি বিপুল অর্থের বিনিময়ে 'স্টার থিয়েটারের' স্বত্তাধিকারীদের কাছ থেকেও অবস্থিত জমি ক্রয় করলেন এবং স্টারের স্বত্তাধিকারী অমৃতলাল বসু-অমৃতলাল মিত্র-হরিপ্রসাদ বসু ও দাশুচরণ নিয়োগীদের তাড়িয়ে দিলেন। গিরিশচন্দ্র স্বত্তাধিকারীদের সাথে আলোচনা করেন এবং সর্বসম্মতভাবে গোপাললাল শীলকে 'স্টার থিয়েটারের' জমি বিক্রয় করার সিদ্ধান্ত নেন—কিন্তু 'স্টার থিয়েটার' এই নামটি হাতে রাখলেন। গোপাললালবাবু তাতে রাজি হলেন এবং থিয়েটারের জমি গিরিশবাবুসহ স্বত্তাধিকারীদের ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা দিলেন। শেষ হস্তান্তর দিনে 'স্টার থিয়েটার'এ একই সঙ্গে 'বুদ্ধদেবচরিত' ও 'বেল্লিক বাজার' অভিনয় হল। ঐদিন লোকারণ্য— বেদনায় দুঃখে দর্শক ও নটনটীদের কান্নার মধ্য দিয়ে গিরিশচন্দ্র 'স্টার থিয়েটারে' ভবন থেকে চলে গেলেন।

গোপাললাল শীলের কাছ থেতে প্রাপ্ত ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকায় কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের উপর হাতিবাগানের একটি জায়গা কিনলেন 'স্টার থিয়েটারের স্বত্তাধিকারীগণ। সেই ক্রয় করা জমিতে গিরিশচন্দ্র নূতন নাট্য-ভবনের ভিত্তি স্থাপন করলেন। পুরো 'স্টার থিয়েটার' নূতন বাড়ীটি রঙ্গালয় নির্মাণের ভার দিলেন যোগেন্দ্রনাথ মিত্র ও ধর্মদাস সুর মহাশয়ের উপর।

> এদিকে গোপাললাল বাবু বহু অর্থব্যয় করে ক্রয় করা সেই জমিতে নতুন করে *'এমারেল্ড থিয়েটার'* এই নামে থিয়েটার করলেন। নানা দিক থেকে চমক দিয়ে থিয়েটারের অভিনয়—বৈদ্যুতিক আলোতে সজ্জিত হয়ে ১৮৮৭ স্যালের ৮ই অক্টোবর অভিনয় শুরু করা হল। প্রথম দিনের নাটক *'পাণ্ডব নির্বাসন'*। নতুন থিয়েটার—আলো ও অন্যান্য জিনিষের আকর্ষণে দর্শক

হয়েছিল অনেক— কিন্তু নাটক তেমনভাবে দর্শকগণ গ্রহণ করলেন না— জমলো না।

চিন্তান্বিত গোপালবাবু। অনেকেই পরামর্শ দিলেন তাঁর থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রকে যুক্ত করার জন্য। চারিদিকে গিরিশচন্দ্রের নাটক প্রযোজনা ও নটনটীদের যথাযথ শিক্ষাদান সম্পর্কে সুকথা শুনে তিনি গিরিশচন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বহু অর্থ ব্যয়ে নতুন থিয়েটার করা হলেও উপযুক্ত নাটক প্রযোজনা ও নাটক না হওয়ায় দর্শকদের উৎসাহ চমককারিত্বের উজ্জ্বল বেশিদিন স্থায়ী হল না। দর্শকদের ভাঁটা গোপালবাবুকে ভাবিয়ে তুলল। অনেক শুভানুধ্যায়ী তাঁকে পরামর্শ দিলেন অনতিবিলম্বে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে যেকোন ভাবেই তাঁকে এই নতুন থিয়েটারে যুক্ত করার জন্য। সেইমত গোপাললাল শীল মশাই গিরিশচন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করেন এবং তাকে 'এমারেল্ড' থিয়েটারের ম্যানেজারের কাজ গ্রহণ করতে অনুরোধ জানান।

ইতিমধ্যে হাতি বাগানের নূতন জমিতে *'স্টার থিয়েটার'* নবরূপে নির্মান কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। গোপালবাবুর কাছ থেকে এককালীন ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা শেষ হয়ে গেছে—তা ছাড়াও স্বত্তাধিকারীগণের নিজস্ব সূত্রে সংগৃহীত টাকা নতুন বাড়ী নির্মাণে লাগানো হল—কিন্তু তাতেও 'স্টার থিয়েটার' নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হচ্ছে না। গিরিশচন্দ্র খুবই চিন্তান্বিত হলেন— কোথায় টাকা, কোথায় টাকা—এই ভাবতে ভাবতে ঠাকুরের কথা স্মরণ করলেন। গোপাললাল শীলের 'এমারেল্ড' থিয়েটারের ম্যানেজার পদে যুক্ত হবার আহ্বান গিরিশচন্দ্রকে ভাবতে হল। কিন্তু অন্তর নিংরানো 'স্টার থিয়েটার' ত্যাগ করে গোপালবাবুর প্রস্তাবে রাজি হতে দ্বিধাগ্রস্থ হলেন গিরিশচন্দ্র। কয়েকটা দিন ভাবলেন—বিমর্ষ ও বিষন্নতার প্রভাব তার দেহ-মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করল। তবুও নট-নটীদের সঙ্গে দেখা করে তাদের প্রেরণা ও উৎসাহ দিতে ভুললেন না—'একটা ব্যবস্থা হবেই'—এই বলে আবার তার নিজস্ব সত্তার আহ্বানে অপেক্ষা করছেন। 'স্টার থিয়েটার' ত্যাগ করে গোপাললাল শীলের প্রস্তাব মেনে নেওয়া—এ যে ভীষণ যন্ত্রণা এবং বিশ্বাসহীনতা। এদিকে গোপাললালবাবুও নাছোড়বান্দা—কিছুতেই দমে যাবার নয়। প্রায় প্রতিদিন গিরিশচন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করছেন—ম্যানেজার পদ গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছেন। তিনি গিরিশচন্দ্রকে প্রস্তাব দিলেন নগদ ২০,০০০.০০ (কুড়ি হাজার) টাকা বোনাস এবং মাসে মাসে ৩৫০.০০ টাকা বেতন দেবেন যদি গিরিশবাবু তাঁর নূতন 'এমারেল্ড থিয়েটারে' ম্যানেজার পদে যোগদান করেন। উভয় সংকটে গিরিশচন্দ্র—কি করবেন? এদিকে টাকার অভাবে 'স্টার থিয়েটারে' নির্মাণ কাজ থমকে আছে—নট-নটীদের কাজ নেই—বাংলা নাটকের জমি বন্ধ্যা হয়ে যাবে—ইত্যাদি ভাবতে ভাবতে আবার সেই ঠাকুরের কথা চিন্তা করে

অসম্পূর্ণ থিয়েটারের নির্মাণের কাজ পুরোপুরি করার সংকল্পে গোপালবাবুর প্রস্তাবিত ২০ হাজার টাকার বোনাস এবং মাসিক ৩৫০.০০ টাকা বেতনে ৫ বৎসরের জন্য 'এমারেল্ড থিয়েটারের' ম্যানেজার পদে যোগদানের এগ্রিমেন্ট করলেন গিরিশচন্দ্র।

গিরিশচন্দ্র উক্ত বোনাসের ২০ হাজার টাকা থেকে ১৬ হাজার টাকা 'স্টার থিয়েটারের' নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য নিঃশর্ত দান করলেন—এবং নব রূপায়ণে 'স্টার থিয়েটারের' স্বত্তাধিকারীদের বললেন,

> "তোমরা ভদ্রসন্তান, নানা প্রোপ্রাইটার কর্তৃক অপমানিত হইয়া এক্ষণে ঈশ্বরের কৃপায় স্বাধীন হলে—আমার অনুরোধ যেসকল ভদ্রসন্তান, তোমাদের আশ্রয় গ্রহণ করবে তারা যেন কখনও কোনরূপ লাঞ্ছিত না হন।"

এদিকে গিরিশচন্দ্র 'এমারেল্ড থিয়েটারে' যোগদান করলেন এবং 'পূর্ণচন্দ্র' ও 'বিষাদ' নামে দুটি নাটক রচনা করে অভিনয় করান। বহু প্রতিক্ষার পর এমারেল্ড থিয়েটারের মালিক গোপাললাল শীল গিরিশচন্দ্রের প্রতিভাকে কাজে লাগাতে পেরে খুব আহ্লাদিত হলেন। বিপুল উৎসাহ ও উদ্যামে গোপালবাবু 'পূর্ণচন্দ্র' নাটকটির অভিনয় প্রাক্কালে একটি কবিতা দর্শক সমাবেশে পাঠ করার ব্যবস্থা করেন। কবিতাটি গিরিশচন্দ্রের রচনা।

গিরিশচন্দ্র শৈশবকাল থেকেই পরের সেবা, আর্তজনের সেবায় নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক কারণে অনিবার্য পরিস্থিতিতে গিরিশচন্দ্রকে যৌবনে বিশৃংখ্বল তথা অসামাজিক জীবনের ধারায় থাকতে হয়েছিল—কিন্তু তিনি যখন ঠাকুর রামকৃষ্ণের কৃপা লাভ করলেন—জীবনের অমৃত আস্বাদনে বিশ্বস্ত হলেন, তখনই অত্যন্ত স্বাভাবিক আয়াসে আপন আত্ম-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গেলেন—অন্ধকার জীবনে আলোর সন্ধান পেলেন। এ ধরনের ভাবনায় পুষ্ট গিরিশচন্দ্রের নাটকের কাহিনী ও চরিত্র। দর্শক সমাজও কাহিনী ও চরিত্র চিত্রণে নট-নটীদের অভিনয়ে গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

গিরিশচন্দ্র তাঁর জীবন দিয়ে অনুভব করেছিলেন ঈশ্বর করুণাময়, শিক্ষা দেবার জন্য মাঝে মধ্যে পরম কল্যাণময় ভগবান মানুষকে দুঃখ দেন, কিন্তু ভগবান সকল সময় সহায় থাকেন।

'পূর্ণচন্দ্র নাটকে শিক্ষাই তাই।

এমারেল্ড থিয়েটারের দ্বিতীয় নাটক *'বিষাদ'*। গিরিশচন্দ্র এই নাটকে 'সরস্বতী' চরিত্রটি নাট্যকারের অন্তর চেতনার প্রত্যক্ষ আকুতিতে সমৃদ্ধ। সরস্বতী সতী—স্বামী

বিষাদ তার বেশ্যাসক্ত। সারারাত আপন গৃহ ছেড়ে বেশ্যার কাছে রাত কাটায়। সরস্বতী সব জানে—বিন্দুমাত্র বিরক্ত না হয়ে স্বামীকে ঘরে ফেরাবার জন্য 'বিষাদ' বালকের ছদ্মবেশে বেশ্যার ঘরেই বেশ্যার চাকর হয়।

অবস্থাপন্ন যুবকরা কিভাবে কুসঙ্গদোষে বেশ্যাদের সাথে নরক জীবন যাপনের দুর্বার আকাঙ্খা—অপর দিকে পতিব্রতা স্ত্রীর আত্মত্যাগের অন্তর শক্তির প্রভাব—এ দুয়ের নাটকীয় সংঘাতকে পরিচালনার প্রতিভায় সার্থক করে তোলা— সেকালের এক বিস্ময়।

স্বামীর জন্য আপনাকে বির্সজন দিয়ে বেশ্যার ঘরে দাসীর মত স্বামীর সেবা করার মধ্য দিয়ে জীবনকে 'ধন্য ধন্য' করে তোলা—সামাজিক জীবনের এই ধরনের উদাহরণ দিয়ে গিরিশচন্দ্র দর্শদের চেতনাকে পরিশুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। দর্শকের হৃদয় জয় করলেন গিরিশচন্দ্র। গোপাললালবাবুর বহু অর্থের আগমন হল—তিনি গিরিশচন্দ্রের প্রতি প্রসন্ন হলেন।

।। একত্রিশ ।।

গোপাললাল শীলের 'এমারেল্ড থিয়েটারে' গিরিশচন্দ্রের পরিশ্রম ও নাট্য প্রতিভায় নাটকের মধ্য দিয়ে দর্শক সমাজের ভাবনাকে সমাজমুখী সচেতন শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে। গিরিশচন্দ্র তাঁর সামগ্রিক ভাবনায় ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রভাব ও আদর্শের প্রতি প্রত্যক্ষভাবে সমাজের ভেতর সঞ্চারিত করার প্রয়াসে গভীরভাবে মনোনিবেশ করছিলেন।

এদিকে গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সুরতকুমারীর গর্ভজাত দুটি কন্যার মৃত্যু এবং পরবর্তী সময়ে একটি পুত্র সন্তানের জন্মের পরপরই সুরতকুমারী সুতিকা রোগে আক্রান্ত হন। তাঁকে বহু চিকিৎসক নানাভাবে নিরাময় করার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু রোগের কোন উপশম না হওয়ায় চিকিৎসকগণ রোগীর জীবনের আশা ত্যাগ করেন। গিরিশচন্দ্র ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। এই সুরতকুমারীর সময়েই গিরিশচন্দ্রের নট-প্রতিভা—অর্থাগম—তথা পরমহংস ঠাকুরের কৃপালাভ। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিরিশচন্দ্র খুবই বিব্রত হলেন। আত্মীয় পরিজনদের পরামর্শে অবশেষে গিরিশচন্দ্র অসুস্থা সুরতকুমারীকে গঙ্গাতীরস্থ কোন একটি বাড়ীতে কিছুদিন রাখার ভাবনা করলেন—তাতে হয়ত গঙ্গার বায়ুতে সুস্থ হতে পারেন। সেইমত গঙ্গার উপর রাজা রাধাকান্ত দেব মহাশয়ের নির্মিত মুমূর্ষ-নিকেতনে গিরিশচন্দ্র স্ত্রী সুরতকুমারীকে নিয়ে যান। কিন্তু রোগ উপশমের লক্ষণ তেমন দেখা না যাওয়ায় পরিবারের সকলেই একান্তভাবে হতাশ ও বিমর্ষ হয়ে গেলেন। তা'ছাড়া অসুস্থার জীবন-ধারণের নিদারুণ কষ্ট ও দেহের বিভিন্ন উপসর্গের যন্ত্রণা আরো গভীরভাবে বেড়ে যাওয়ায় সকলকে অসহায় করে তুলেছিল। গিরিশচন্দ্র প্রতিনিয়ত শিশুপুত্রকে বুকে জড়িয়ে স্ত্রীর কাছে বসে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন—খাওয়া নেই, বিশ্রাম নেই, নেই কোন মানসিক

উদ্যোগ। নীরব নিস্তবদ্ধতার সীমাহীন অপলক চাউনিতে গিরিশচন্দ্র যেন অতি সাধারন বালকের মত হয়ে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝে ঠাকুরকে স্মরণ করছেন— বেদনায়, দুঃখে অসহায় হয়ে চোখ দুটো ভেসে যেতে চাইছে—কিন্তু গিরিশচন্দ্র নবজাতকের কথা স্মরণ করে সুদৃঢ় হস্তে তাকে বুকে জড়িয়ে পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে থাকেন। মাঝে মাঝে 'মা, মা'—'ঠাকুর ঠাকুর' বলে অকপটস্বরে কি যেন বলতে বলতে আবার নীরব-স্থির হয়ে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকেন।

এমনিভাবে বেশ ক'দিন অতিক্রান্ত হবার পরও রোগ উপশমের এতটুকু আশা না দেখে পরিজনদের মধ্যে আরো গভীর যন্ত্রণা ছড়িয়ে গেল। কষ্ট—রোগ যন্ত্রণায় কাতর রোগীর বিবর্ণতা আরো বেশী করে আচ্ছন্ন করল সবাইকে। অসহায়ের মত সবাই আসে আর যায়— কোন কিছু করার নেই। তবুও গিরিশ আশায় আশায় বার বার কাছে এসে ফিরে ফিরে তাকায়—আবার বুকজোড়া বেদনায় হতাশ হয়ে শুধু 'মা - মা' 'ঠাকুর - ঠাকুর' বলে ঘর থেকে বাইরে এসে আকাশ পানে চেয়ে থাকে।

গিরিশচন্দ্রের ছোটভাই অতুলকৃষ্ণ ঘোষ পরিবারের শুভানুধ্যায়ী পরম আত্মীয় দেবেন্দ্রনাথ বসুকে বললেন,

....দেখ, মেজদা মন থেকে মেজো বউকে বিদায় দিচ্ছে না বলে ওঁর এই ভোগ। দেবেন, তুমি বই আর কেউ পারবে না যদি মেজদার দুটো পায়ের ধূলো এনে দিতে পার তা'হলে মেজবউ এর রোগ যন্ত্রণামুক্ত হয়।

দেবেনবাবু গিরিশচন্দ্রের কাছে গেলেন। গিরিশচন্দ্র দেবেনবাবুকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—

....এখন সুরত কেমন আছে!

....অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন—মৃত্যু কাছে কাছে ঘুরছে—কিন্তু মৃত্যু তাকে স্পর্শ করতে পারছে না—তাই যন্ত্রণা তীব্র, অসহায়ের মত আর্তনাদ করছে—মুক্ত হবার জন্য। আমরা এ দৃশ্য চোখে দেখতে পারছি না। আপনি কিছু করুন—ওঁকে ছেড়ে দিন, ওঁকে ছেড়ে দিন—দেবেনবাবু কাতরস্বরে মাথা নত করে বললেন,

....দেবেন, দেবেন! ওঁকে ছেড়ে দেবো—ওঁ আমার সুরত, আমাকে ছেড়ে চিরকালের জন্য চলে যাবে! গিরিশচন্দ্র প্রবল ধাক্কায় আর্তনাদ করে উঠলেন।

অতঃপর শান্ত হয়ে অত্যন্ত আন্তরিকতায় চোখের ঝরা অশ্রু মুছতে মুছতে বললেন, দেবেন, এক টুকরো কাগজ আনো—শেষ কাজটুকু করে দেখি। দেবেনবাবু নিকটে একটি টেবিলের উপর থেকে কাগজ এনে গিরিশের পায়ের কাছে রাখলেন।

গিরিশ অত্যন্ত সন্তর্পনে দুটো পা কাগজের উপর রাখলেন। দেবেনবাবু সেই পদ-

রজঃমথিত কাগজখানি দ্রুত নিয়ে গেলেন সেই মুমূর্ষ নিকেতনে উপস্থিত পরিবারের লোকজনদের সামনেই উহা মেজোবউয়ের মাথায় বুলিয়ে দিলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ধীরে ধীরে মৃত্যু অত্যন্ত সন্তর্পনে রোগযন্ত্রণার দড়ি গুটিয়ে নিয়ে কোলে তুলে নিলেন গিরিশচন্দ্রের অন্তরশক্তির মূলাধার সুরতকুমারীকে। পত্নী সুরত শেষবারের মত দুটো চোখে অস্পষ্টস্বরে কি যেন বলতে বলতে মৃত্যুর কোলে লীন হয়ে গেলেন।

পরিবারস্থ সকলে কান্নায় ওঁর শান্ত হিম দেহটার উপর দাপিয়ে জড়িয়ে ধরল। একটু দূরে গিরিশ গঙ্গার দিকে মুখ রেখে কোথায় যেন কাকে খুঁজছে—মুখে কথা নেই—হাত দুটি অবশ হয়ে গেছে—ধীরে ধীরে আপন গৃহে এসে ঘুমে আচ্ছন্ন শিশুপুত্রটিকে বুকের মধ্যে সজোরে চেপে হঠাৎ বললেন, *ঠাকুর, ঠাকুর—আর কত পরীক্ষা করবে?* এই বলে দ্রুত সেই মুমূর্ষ নিকেতনে, যেখানে তাঁর হৃৎপিন্ড প্রিয়া সুরত গভীর নিদ্রার সুখে অচৈতন্য, সেখানে এসে গিরিশ প্রায় উন্মাদের মত বিকট শব্দে '....সুরত, সুরত ওঠো—তোমার ছেলেকে এনেছি—চেয়ে দ্যাখ, চেয়ে দ্যাখ একবারটি সুরত....' সঙ্গে সঙ্গে শিশুপুত্রকে চুম্বন করতে করতে নিকেতন থেকে বাইরে চলে এলেন।

চোখে এতটুকু জল আর নেই। শোকের তপ্ততায় তা ও শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে—ভেতরে ভেতরে জ্বলে উঠছে সমস্ত হৃৎপিন্ডটা।

পরিজনেরা মৃতাকে মহারানী ত্রয়তীর সাজে সাজিয়ে দিচ্ছে। বাইরে দেবেনবাবু সহ পাড়ার ভদ্রজনেরা, রঙ্গমঞ্চের নট-নটীরা সবাই কাছে এসে গিরিশকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে কাঁদাতে চেষ্টা করছে।

গিরিশ তাদের বললেন—আমার তো কাঁদবার সময় নয়—**আমি যে আমার সবটাই বকলমা করে দিয়েছি ঠাকুরের কাছে। আমি কাঁদবো কেন? তাঁর ইচ্ছায় আমার দড়ির টান। এখানে আমার নিজস্ব কিছু নেই।**

।। বত্রিশ।।

গিরিশচন্দ্র শোকাহত, বিষন্ন-কিন্তু যেখানে নিজের সব সত্তার প্রাণ-শক্তি ঠাকুর রামকৃষ্ণকে বকলমা দিয়েছেন, সেখানে ব্যক্তি গিরিশচন্দ্রের কোন শোক-বিষন্নতার আজ স্বকীয়তা নেই। তাই শিশুপুত্রকে পরম যত্নে লালন পালন করতে মনোনিবেশ করলেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। ঠাকুরের চিন্তা ও ভাবনাকে অন্তরে সিঞ্চন করে এক গভীর আলোর স্পন্দনে প্রতিদিন উত্তরণের মধুস্বাদ অনুভব করে প্রতিদিনের ঘটনা অতিক্রম করে চলেছেন। সেসময় 'স্টার থিয়েটারের' স্বত্বাধিকারীগণ গিরিশচন্দ্রকে

হরিভক্তিযুক্ত একটি নাটক লিখবার জন্য অনুরোধ করেন। গিরিশচন্দ্র অতঃপর

নসীরাম

পরমহংসদেবের ভাবাদর্শের প্রচারে 'নসীরাম' নাটক রচনা করেন ভগবৎ ভক্তির বিস্তারে। নাটকটির অন্তর্নিহিত ভাবানন্দ অত্যন্ত গভীর—কিন্তু দর্শকমহলে তেমন করে খুব একটা রেখাপাত করতে পারে নি। তখনও পর্যন্ত ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভাবাদর্শ ও জীবনচর্চার কাহিনীর বিস্তার হয়নি। তাই 'নসীরাম' নাটকের ঘটনা ও কাহিনীর সমন্বিত চেতনার স্পর্শ দর্শককূলকে মথিত করতে অসমর্থ হয়। তবে নাটকগুলির গানগুলি প্রচারিত হয়।

'*নসীরাম*' নাটকটি ১৮৮৮ সালে হাতিবাগানের নবনির্মিত 'স্টার থিয়েটারে' ফুল দোলের দিনে উদবোধন দিবসে অভিনীত হল। গিরিশচন্দ্র তখন ও 'এমারেল্ড থিয়েটারে' নিযুক্ত। তাই তাঁর রচিত নাটক তাঁর নামে অন্য কোন থিয়েটারে অভিনয় করা অসুবিধা থাকায় গিরিশচন্দ্র ছদ্মনামে 'সেবকপ্রণীত' ব্যবহার করেছিলেন।

'স্টারে' অভিনয় প্রাক্কালে গিরিশচন্দ্র একটি ছোট যে কবিতায় প্রস্তাবনা করে লিখেছিলেন—তা নট অমৃতলাল বসু পাঠ করেন—

হে সজ্জন, পদে নিবেদন—
নির্বাসিত মনোদুঃখে,   বঞ্চিলাম অধোমুখে
বঞ্চিত বাঞ্ছিত তব চরণ বন্দন।
যুগ সম বর্ষের ভ্রমণ
আজি পুনঃ পূর্ণ আকিঞ্চন
স্বাগত সুজন!
করে দাস— করুণা প্রয়াস,
রস-বসে গুণাকর   ভুল, দোষ-গুণ ধর
তব পূজা অশৈশব উচ্চ অভিলাষ।
পারি হারি না বুঝি আভাষ,
হর্ষ সনে দ্বন্দ্ব করে ত্রাস
পূরিবে কি আশ?
অভিনয় ইতিহাস কয়—
দেশ ভেদে নানা মত, যে জাতি যে রসে রত,
আদি, হাস্য, বীভৎস, শোণিত কোথা রয়,
হিন্দু প্রাণ কোমলতা নয়,
ধর্ম প্রাণ শ্রেষ্ঠ পরিচয়,
ধর্ম রঙ্গালয়।

ব্যক্তি গিরিশচন্দ্র ও নাট্যকার—নট গিরিশচন্দ্র এবং *রঙ্গালয়* এই তিনের সমন্বিত আকাঙ্খার উত্তরণ-আনন্দ-বেদনা-অনুতাপ, নিবেদিত স্বীকৃত সত্যকে গিরিশচন্দ্র নব নির্মিত 'স্টার থিয়েটারে' প্রথম অভিনীত তাঁরই রচিত নাটকের ভূমিকায় জানিয়ে দিলেন অপ্রকাশ্যে ছদ্মনামের মোড়কে।

নট অমৃতলাল বসু 'নসীরাম' সম্পর্কে বলেছেন,

> ....চিন্তাশীল দর্শকেবা 'নসীরাম' খুব লইয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণ দর্শক সেরূপ ভাবগ্রহণ করিতে পাবে নাই। কারণ ভগবান শ্রীবামকৃষ্ণদেবের ভাবকে মূর্তিমন্ত্র করিয়া 'নসীরাম' চরিত্র গঠিত। সেসময়ে পরমহংসদেবের বাণী সাধারণ মধ্যে ততটা প্রচারিত হয় নাই, বোধ হয় এই ভাব গ্রহণে অক্ষমতাই ইহার প্রধান কাবণ। ক্রমে পরমহংসদেবের সম্বন্ধে নানারূপ গ্রন্থ প্রচারিত হইতে লাগিল। কয়েক বৎসর পরে 'স্টার থিয়েটারে' পুনরায় যখন 'নসীরাম' অভিনয় করিয়াছিলাম সেসময় 'নসীরাম' খুব জমিয়াছিল।

'নসীরাম' নাটকের অভাবনীয় সাফল্যের পর পরই 'স্টার থিয়েটারে' অমৃতলাল বসুর 'তাজ্জব ব্যাপার' এই নাটকটিও দর্শকদের আকর্ষণ করেছে।

'স্টার থিয়েটারে'র স্বত্ত্বাধিকারীগণের অনুরোধে সেসময় গিরিশচন্দ্র 'স্টার থিয়েটারে' ম্যানেজার পদে যোগদান করেন।

গিরিশচন্দ্র তার ব্যক্তিগত জীবন-ধারার ঘটনাকেন্দ্রকে অত্যন্ত পরিশীলিত ভাবনায় নাটকের মূল স্রোতকে বেগ দান করেছেন। কামাসক্ত বিশৃংখ্খল জীবনের পাপকে বহন করতে করতে হঠাৎ কিভাবে অন্ধকারের ভেতর থেকে 'আলো'র রেখা মুহূর্তের মধ্যে ছিন্নভিন্ন ক্লেদ-গন্ধ-যুক্ত জীবনটাকে নাড়া দিল—পথ পেল মুক্ত হবার—তার কাহিনীই 'নসীরাম' নাটকে ঘটনায় প্রকাশ পেয়েছে।

স্বাভাবিকভাবে নানা ঘটনার অনিবার্য প্রভাবে গিরিশচন্দ্রের জীবনধারায় বেশ একটা তোলপাড়ের আবহাওয়া গভীর হয়ে উঠেছিল। প্রিয়তমা স্ত্রী সুরতের মৃত্যু সেই ঘূর্ণি আবহাওয়াকে মদত দিয়েছে অত্যন্ত গভীরে। তাই 'বিষন্ন ক্লান্ত' গিরিশচন্দ্র প্রতিদিনের জীবন ধারা থেকে অন্য একটি মননে নিজেকে যুক্ত করে নিস্তার পেতে চান।

।। তেত্রিশ।।

গিরিশচন্দ্র স্ত্রী সুরতের শোক তখনও ভুলতে পারেননি। অন্তরে অন্তরে তার তাপ বার বার বিষন্নতার নিঃসঙ্গতাকে আশ্রয় করে জীবনকে পরিচালিত করছে। প্রতিদিনকার নিয়মানুসারী কাজ কর্মে তেমন উৎসাহ নেই, নেই কোন আনন্দের প্রবাহ। অন্তরস্থল যেন ধীরে ধীরে বিরহতাপে শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে। কিছুই ভাল লাগে না,

প্রফুল্ল

কোথাও যেন মন লাগাতে পারছেন না। এমনি পরিস্থিতির শিকার হয়ে গিরিশচন্দ্র *'প্রফুল্ল'* একটি সামাজিক নাটক রচনা করলেন।

নাটকটি নবনির্মিত 'স্টার থিয়েটারে (১৮৮৯) ১২৯৬ সালের ১৬ বৈশাখ অভিনীত হয়। 'স্টার থিয়েটারে' ঠিক এর আগে অমৃতলাল বসু কর্তৃক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে 'সরলা' এই নামে একটি নাটক অভিনীত হয় এবং 'সামাজিক জীবনের বাস্তব কাহিনীর আবেদন দর্শক সমাজে বিপুল সাড়া জাগায়। সর্বস্তরের দর্শকের হৃদয়ে 'সরলা' নাটকের প্রভাব অত্যন্ত গভীরে প্রতিদিনের চর্চার বিষয় হয়েছিল। এমনি পরিবেশে গিরিশচন্দ্রের এই সামাজিক *'প্রফুল্ল'* নাটকটি *'স্টার থিয়েটার'*এ অভিনীত হল। নাটকের রচনাশৈলি—এবং অন্তর স্পর্শ করা নট-নটীদের অভিনয় 'অভাবনীয় সফলতায় ধন্য ধন্য সাড়া জাগালো।

বাঙলার বরণ্য সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রফুল্ল' নাটকের আলোচনায় বলেছেন,

> ....বাঙালীর গার্হস্থ্য জীবনে দুঃখের যে বিরাট কাল মেঘ সর্বদাই বিভীষিকা উৎপাদন করে, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া অপূর্ব লিপি চাতুরীর বলে এই শোকপূর্ণ বিয়োগান্ত নাটক রচিত হইয়াছে। আমাদের মনে হয় যে, এমন মর্মভেদী বিয়োগান্ত নাটক বাঙলা ভাষায় বুঝি আর নাই। ....যোগেশের 'সাজান বাগান শুকাইয়া গেল' আর হইল না। পরন্তু পুণ্যের প্রতিষ্ঠা তো হইল; পাপের দমন তো হইল। সমাজের পক্ষে ইহাই লাভ। যে কবি এই সৎশিক্ষার প্রচার করিয়াছেন, তিনি সমাজের পূজ্য। কবি গিরিশচন্দ্র নির্দয়ভাবে শোকের এবং পাপের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারও নির্দয়তা কুলীনের নির্দয়তার তুল্য। কুম্ভকার পাকা হাঁড়ি গড়িবার জন্য মাটির হাঁড়িতে ঘন ঘন আঘাত করিয়া থাকে, তখন সে আঘাত দেখিয়া মনে হয়, এ কার্য্য বড়ই নির্দয়তার কার্য্য। কিন্তু যখন সেই হাঁড়িতে দেবতার প্রসাদ প্রস্তুত হয়, তখন মাটির সংসারে মাটির হাঁড়ি ও ধন্য হইয়া যায়। গিরিশবাবুও তেমনই মানুষের সংসারে মানুষের সমাজকে দেবতার উপভোগ্য করিবার জন্য নির্দয়ভাবে 'প্রফুল্লের' ন্যায় ভীষণ বিয়োগান্ত নাটককে লোক-লোচনের গোচর করিয়াছেন—তিনি ধন্য।

রঙ্গালয়, ১৩০৮/মাঘ

পারিবারিক জীবনের একান্তবর্তী পরিবারে 'সুরাশক্তির' প্রভাবে কিভাবে ব্যক্তিজীবন-পারিবারিক জীবন ধূলায় মিশে যায় তার প্রত্যক্ষ প্রকাশ। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র তাঁর নিজের জীবনের অনুভূতির প্রতিটি পলে সুরার মোহিনী প্রভাবকে রূপদান করেছেন।

নাটকের মুখ্য আর্কষণীয় চরিত্র যোগেশের ভূমিকায় অমৃতলাল মিত্র আর রমেশের ভূমিকায় ছিলেন অমৃতলাল বসু। প্রফুল্ল রূপদান করেছিলেন বিখ্যাত নটী ভূষণকুমারী।

গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটক 'স্টার থিয়েটার'এ সাফল্য সহকারে অভিনীত হবার পর পরই তিনি পরবর্তী সামাজিক নাটক *'হারানিধি'* রচনা করেন এবং 'স্টার থিয়েটার'এ অভিনীত হয়। বাঙলা নাট্যসাহিত্যে সামাজিক নাটকের আকর্ষণ তথা পর পর (সরলা-প্রফুল্ল-হারানিধি) খুবই প্রশংসনীয় সফলতা লাভ করেছিল। 'হারানিধি' সাধারণ বাঙালীর সাদা-মাটা গার্হস্থ্ জীবনের মিলনাত্মক কাহিনী নিয়ে গিরিশচন্দ্র নানা ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে দর্শকদের অবশেষে আনন্দ দান করার ব্যবস্থা করেছেন। গিরিশচন্দ্র সমসাময়িক ধনীদের নিত্য দিনের জীবনে অর্থ ও সুরা এই দুই অতলান্তক অনিবার্য উপাচার সংসার জীবনকে-ব্যক্তি জীবনকে কোথায় লাগামহীন করে নিয়ে যায় তার পরিণতির ছবি আমাদের দিয়েছেন।

হারানিধি

'হারানিধি' নাটকে গিরিশচন্দ্র তাঁর অন্তরসত্ত্বার অনুভবে একটি বিশেষ চরিত্র *'অঘোর'* সৃষ্টি করে তাঁর বক্তব্যকে প্রসারিত করেছেন। আর সেই অঘোর চরিত্রটি রূপদান করেছিলেন বেলাবাবু (অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়)

সামাজিক নাটকের বিষয়বস্তুর বাস্তবতার মধ্য দিয়ে সংসার ও সমাজ জীবনের ইতিকর্তব্য নির্দেশে তৎকালে দর্শকের মনকে বশীভূত করতে পেরেছিলেন গিরিশচন্দ্র।

তার পরবর্তী নাটক *'চন্ড'*। গিরিশচন্দ্রের প্রথম ঐতিহাসিক কাহিনীর নাটক। টডের 'রাজস্থান' পুস্তকে বর্ণিত কাহিনী থেকে 'চন্ড' নাটক রচিত হয়। সেই 'স্টার থিয়েটারে'ই 'চন্ড' প্রথম অভিনীত হয়। রাজ্য জয়ের লাগামহীন নেশার সাথে কামের দুর্নিবার প্রভাবে আত্মজের সর্বনাশ করার আগ্রহ কি ভাবে অনিবার্য হয়ে উঠে, গিরিশচন্দ্র অত্যন্ত বাস্তবায়িত ঘটনার মধ্য দিয়ে অঙ্কন করেছেন।

চন্ড

একই বৎসরে গিরিশচন্দ্রের 'মলিনা বিকাশ' 'স্টার থিয়েটারে' অভিনীত হয়। নাটকটি গীতিনাট্য। নাটকটিতে আনন্দ দান করাই উদ্দেশ্য। গিরিশচন্দ্র নাটকটি সম্পর্কে বলেছেন,

মলিনা বিশ্বাস

> ....স্টার থিয়েটার হাতিবাগানে উঠিয়া আসিবার পর *মলিনা বিকাশ* গীতিনাট্য অভিনীত হয়। সঙ্গীতাচার্য রামতারণ গীতগুলির সুর সংযোজন করেন এবং নৃত্যশিক্ষা প্রদানের ভার জনপরিচিত দর্শকপ্রিয় কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উপর অর্পিত হয়।....

একই বৎসরে একটি রূপক নাটক *'মহাপূজা'* গিরিশচন্দ্র রচনা করেন এবং 'স্টার থিয়েটারে' অভিনীত হয়। কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনকে সামনে রেখে নাটকটির রচনা। অল্প পরিসরে দেশপ্রেমের ইংগিতে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস। নাটকটিতে যে গানটি দর্শকদের গভীরভাবে

মহাপূজা

দেশজননীর দিকে মুখ ফেরানো হয়েছিল তা হল—

নয়ন জলে গেঁথে মালা পরাব দুখিনী মায়।
ভক্তি-কমল-কলি দিব মায়ের রাঙ্গা পায়,
শিখ হৃদী উচ্চ শিক্ষা, মাতৃমন্ত্রে লহ দীক্ষা
ত্যজ স্বার্থ মাগি ভিক্ষা, রহ জননী-সেবায়
যে নামে দূরিত হরে, রাখ যত্নে হৃদে ধরে
অবনী তারে আদরে, জননী প্রসন্না যায়।।

।। চৌত্রিশ ।।

গিরিশচন্দ্র দ্বিতীয়বার বিবাহ করার পর থেকেই তাঁর ভাগ্য গভীরভাবে তাঁর ভাবনাপোযোগী পথকে সামনে এনে দিয়েছে—পত্নী সুরতকুমারীর আন্তরিক সেবা যত্নের সাথে মানসিক উন্নয়নের প্রতিটি ধাপ স্বামী গিরিশচন্দ্রের প্রতিভাকে শক্তি দান করেছিল—। নট গিরিশচন্দ্র, নাট্যকার গিরিশচন্দ্র এবং আধ্যাত্মিক জীবনের আলোর পথের মূলাধারে ঠাকুর রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ, তাঁর কৃপা ও জীবনের অন্ধকার গুহায় আলোকমালার অমৃত আস্বাদনে তৃপ্ত চেতনার বিভিন্ন অনুভবের প্রকাশ।

কিন্তু বিধাতা গিরিশচন্দ্রকে বেশীদূর অগ্রসর হতে দিলেন না। অকস্মাৎ দুইকন্যা ও একপুত্র—এই তিনজনের জন্ম দেবার পর ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না সুরতকুমারী ইহলোকে চলে গেলেন—উদাসী গিরিশচন্দ্রের সব দড়ি দড়া ছিন্ন করে। পর পর দুটি কন্যার অকাল মৃত্যু, তারপর স্ত্রীর প্রয়াণ গিরিশচন্দ্রকে যেন পথের মাঝখানে একান্ত অসহায় করে ছিন্নভিন্ন হয় সজোরে নিক্ষেপ করলেন ভাগ্য দেবতা। প্রতিবাদ করেন নি গিরিশচন্দ্র, বেদনা পেয়েছেন, কেঁদেছেন কিন্তু অবসিতহন নি। কারণ তিনি যে তার আপন অস্তিত্ত্যের মধ্যে নেই—সবটাই গিরিশচন্দ্র—গিরিশচন্দ্রকে বকলমা দিয়ে দিয়েছিলেন সেই পরম আলোময় শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণকে।

'এমারেল্ড থিয়েটারের' কাজ ছেড়ে তাঁর প্রাণ-বায়ুসম হাতিবাগানের নব-নির্মিত 'স্টার থিয়েটারে' যোগদান করার পর থেকেই পারিবারিক জীবনের অশান্তি ও অস্থিরতা ধীরে ধীরে গিরিশচন্দ্রের চেতনাকে গ্রাস করতেছিল। কন্যাদ্বয়ের ও স্ত্রীর মৃত্যুর পর একমাত্র শিশু সন্তানকে বুকে জড়িয়ে সারাক্ষণ তার লালন-পালনে গভীরভাবে নিজেকে যুক্ত করলেন গিরিশচন্দ্র। ক্ষণিকের জন্যও শিশুপুত্র ও পিতা গিরিশচন্দ্রের কোল থেকে পরিজনদের অন্য কারু কাছে থাকলেই কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে পড়তো—তাতে গিরিশচন্দ্রের মানসিক বেদনার অস্থিরতা বেড়ে যেতো। পিতার কোল এবং আদরে শিশুপুত্র আনন্দ আহ্লাদে হেসে উঠতো—আবার সাধুসন্তদের দেখলে ছোট কোমল

হাত দুটো বাড়িয়ে তাদের কোলের আদর পাবার জন্য লাফ দিত। দেব-দেবীর গান, তাদের ছবি শিশুপুত্রের সুখ-আনন্দের উজ্জীবন হোত ক্ষণিকের মধ্যে। নানা দিক থেকে স্বাভাবিকভাবে খেলার জিনিষপত্র শিশু পুত্রের মনকে কোন ভাবেই আকর্ষিত করতে পারতো না।

শোনা যায়, একদিন শিশুপুত্র পিতা গিরিশচন্দ্রের কোলে বসে কাঁদতে কাঁদতে হাত দেখিয়ে দেখিয়ে দেয়ালে টানানো ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ফটোকে নির্দিষ্ট করে তা পাবার জন্য ইংগিত দিয়েছিল। গিরিশচন্দ্র এতটুকু বিলম্ব না করে টাঙ্গানো ফটোটি তুলে এনে পুত্রের কাছে দিতেই দেখতে পেলেন—ফটোটিতে পিপঁড়েতে ভরে রয়েছে। গিরিশচন্দ্র শিশুপুত্রকে কোল থেকে নামিয়ে একটি স্বচ্ছ সাদা কাপড়ের দ্বারা ফটোটি থেকে পিপঁড়ে তাড়িয়ে দিয়ে আবার দেয়ালে টাঙ্গিয়ে দিতে পুত্র আনন্দিত হয়ে হাসতে হাসতে পিতার বুকে মাথা রেখে একটা পরম শান্তির পরিছন্নতায় বিভোর হোল। কান্নাও থেমে গেল। গিরিশচন্দ্রও কি একটা ভাবে আবিষ্ট হয়ে গেলেন—চোখ দুটো জলে ভেসে গেল—আকাশের দিকে উদাস হয়ে তাকিয়ে মনে মনে ভাবছেন, একদিন ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে বলেছিলেম,

তুমি আমার ছেলে হয়ে জন্মাবে....

আজ তাই তুমি পুত্র-ছলনায় তিনি আমার ঘরে, আমার বক্ষ জুড়ে।

সেই শিশুপুত্র কিছুদিনের মধ্যে অসুস্থ হোল—দুর্বল হয়ে রোগাটে হয়ে গেল—প্রায় সকলসময় অসুস্থতায় মলিন দেহ—অব্যবস্থায় কান্নাকাটি করতো—আবার কেউ কাছে এসে 'হরি হরি বলতেই সেই কান্না থেমে যেতো, আর ফ্যাল ফ্যাল করে তৃপ্তির হাসিতে তাকিয়ে থাকতো। কিন্তু অসুস্থতা ক্রমে ক্রমে বেড়েই চলেছে। গিরিশচন্দ্রের স্থির বিশ্বাস হলো—শিশুপুত্র দেবশিশু। তাই তার যত্ন, তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে গভীরভাবে সক্রিয় থেকেছেন। ঠাকুরকে যেমনভাবে ভক্তরা সেবা করতেন—গিরিশচন্দ্র তেমনভাবে শিশুপুত্রকে সেবা করছেন।

এমনিভাবে দিন-রাত, রাত দিন কোথা দিয়ে চলে যেত, গিরিশ তা জানতেও পারতেন না। তাই থিয়েটারে উপস্থিত থাকাটা হয়ে উঠছে না—দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতি স্বাভাবিকভাবে থিয়েটারের লোকজনের কাছে তেমন প্রশ্রয় পাওয়া যায়নি—বরং বিরক্তি ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে গিরিশচন্দ্রের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে।

শিশুপুত্রের আরোগ্যের জন্য গিরিশচন্দ্র গভীরভাবে মনোযোগী—বন্ধু পরিজনদের পরামর্শে বায়ু পরিবর্তনের জন্য শিশুপুত্রকে নিয়ে গিরিশচন্দ্র কিছুদিন পশ্চিমে মধুপুরে গেলেন। কিন্তু তাতেও কোন আরোগ্যের ইংগিত না পেয়ে আবার কলকাতায় ফিরে এলেন। মধুপুরে থাকাকালীন গিরিশচন্দ্র জানতে পারলেন যে, স্টার থিয়েটার ছেড়ে নীলমাধববাবুরা ৩ জন নতুন থিয়েটার 'সিটি থিয়েটার' নামে একটি থিয়েটারে

গিরিশচন্দ্রের লেখা নাটক অভিনয় করছেন—যেখানে গিরিশচন্দ্রের কোন অনুমোদন গ্রহণ করা হয়নি। তাতে গিরিশচন্দ্র খুবই বিব্রত হলেন এবং অসুস্থ পুত্রকে সঙ্গে করে কলকাতায় চলে এলেন। কলকাতায় গিরিশচন্দ্র খুবই বিব্রত, খুবই অসহায় হয়ে উঠলেন। স্টার থিয়েটারে নিয়মিত যাওয়া, ভক্ত গুরুভাইদের সাথে মেলামেশা প্রায় বন্ধ। গিরিশ গুরুভাই নরেনকে বললেন,

> নরেন, আমি আমার পুত্রকে কিছুতেই আরোগ্য লাভ করাতে পারিতেছি না। যদি আমি আমার স্বত্ব ত্যাগ করিলে এই শিশুর প্রাণ রক্ষা পায়! তুমি ওঁকে সন্ন্যাস মন্ত্র দাও, তোমাদের দলে যুক্ত কর....

নরেন গিরিশচন্দ্রের মনের অবস্থা বুঝলেন—তিনিও শিশু ও গিরিশের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। অবশেষে ভাই গিরিশের ঐকান্তিক কাতর অনুরোধে এগিয়ে গিয়ে শিশুকে কোলে তুলে কানে কানে সন্ন্যাস মন্ত্র দান করলেন। কিন্তু তাতেও শিশুটির রোগ আরোগ্য হোল না—অবশেষে শিশুপুত্র গিরিশকে ত্যাগ করে প্রয়াত হোল।

গিরিশচন্দ্রের সব আশা, সব সাধ পূরণ হোল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর গিরিশচন্দ্র এই শিশুপুত্রের দিকে তাকিয়ে স্ত্রীর শোক হজম করেছিলেন—কিন্তু আজ! আজ কিসের জন্য, কোন ভরসায় ঘরে থাকা, সবার সঙ্গে বেঁচে থাকা! তবুও গিরিশ কাঁদেননি, ভেঙ্গে পড়েননি—আর্তনাদ করেছেন, ভগবানকে স্মরণ করে শরণ নিয়েছেন—'বকলমা' দেবার সে কি অসহ্য যন্ত্রণা—তবুও তা সহ্য করছেন গিরিশচন্দ্র। মাঝে মাঝে ঠাকুর, ঠাকুর—আর কতদূরে আমাকে যেতে হবে ঠাকুর! মনে মনে অভিমান সিক্ত বেদনায় গিরিশচন্দ্র ঠাকুরের দর্শন আকাঙ্ক্ষায় আঁকুপাকু করছেন।

নানা প্রতিকুলতার মধ্যে থেকেও গিরিশচন্দ্র ক্ষণিকের জন্যও ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রতি বিশ্বাস হারান নি। একটি স্থির-অন্তরভেদি নিবেদিত পূজায় গিরিশচন্দ্র সাময়িকভাবে পারিপার্শিকতার অনিবার্যতায় নড়ে উঠেছেন—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার অচঞ্চল আকুতিতে ঠাকুরের ধ্যান, ঠাকুরের ভাবনায় মথিত হয়ে শান্ত হয়েছেন।

নানা জটিল অপরিছন্ন পারিবারিক পরিবেশে গিরিশচন্দ্রও অসুস্থ হলেন। এদিকে নানা কারণে 'স্টার থিয়েটারে' হাজিরা দেওয়া হয়নি। এই সুযোগে স্টার থিয়েটারের কিছু কর্তাব্যক্তির অসন্তোষ তীব্র হল এবং নানা অজুহাতের দায়ে গিরিশচন্দ্রকে স্টার থিয়েটার থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল।

একদিন এই গিরিশচন্দ্রকে কেন্দ্র করেই হাতিবাগানের 'স্টার থিয়েটারের' কর্মী নট-নটীগণ অভাবনীয় উদ্যোগ ও নিষ্ঠায় এগিয়ে এসে বঙ্গ রঙ্গালয়ের শোভনশ্রী বর্ধিত হয়েছিল। চারিদিকে গিরিশচন্দ্রের নাটক, প্রযোজনা, অভিনয় দর্শক সমাজের কাছে দিন-দিন আদরণীয় ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বিতাড়িত গিরিশচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে সেই সকল নট-নটী-কর্মীদের মধ্যে হতাশার কালোছায়া গভীরভাবে

আচ্ছন্ন করল। নেই সেই উদ্যম, নেই আনন্দিত কর্মপ্রেরণা! দেখতে দেখতে 'স্টার থিয়েটারে' অসন্তোষজনিত বিশৃঙ্খলায় সবাই ক্ষুব্ধ—বেদনায় হতাশ।

নেতৃস্থানীয় অনেকেই স্টার থিয়েটার ছেড়ে দিলেন। অভিনেতা নীলমাধব চক্রবর্তী, অঘোরনাথ পাঠক, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, দানিবাবু, প্রমদাসুন্দরী, মানদাসুন্দরী সহ প্রায় জনা পনের স্টার থিয়েটার থেকে চলে গেলেন।

নীলমাধববাবু মেছুয়াবাজারের কবি রাজকৃষ্ণ রায় প্রতিষ্ঠিত 'বীনা থিয়েটার' ভাড়া নিয়ে *'সিটি থিয়েটার'* এই নামে অভিনয় করার ব্যবস্থা করলেন এবং নীলমাধব চক্রবর্তী, অঘোরনাথ পাঠক ও প্রবোধচন্দ্র ঘোষ এই তিন জন নূতন সিটি থিয়েটারের মূল কর্তা (প্রোপ্রাইটার) হলেন। সেই 'সিটি থিয়েটারে'র গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলি (বিল্বমঙ্গল - বুদ্ধদেবচরিত - মলিনা বিকাশ) বিনা অনুমতিতে মঞ্চস্থ করলেন। গিরিশচন্দ্র তাতে আপত্তি জানালেন। কিন্তু নীলমাধববাবু গিরিশচন্দ্রের আপত্তি গ্রাহ্য করলেন না। অবশেষে আদালতের রায়ে একটি স্বত্ব হয় যে, স্টার থিয়েটারের যারা স্বত্ত্বাধিকারী ছিলেন তারা গিরিশচন্দ্রের নাটক করতে পারবেন—তারজন্য গিরিশচন্দ্রকে মাসে ১০০্ (একশত) টাকা করে ভাতা দেবেন। অসহায় বিধ্বস্থ গিরিশচন্দ্র একান্ত বাধ্য হয়ে তাতে সায় দিলেন এই ভেবে যে ঠাকুরের তাই ইচ্ছা।

।। পঁয়ত্রিশ।।

স্ত্রীর মৃত্যু, শিশুপুত্রের মৃত্যু এবং স্টার থিয়েটার থেকে প্রায় নির্বাসন সব মিলিয়ে গিরিশচন্দ্রের মানসিক অবস্থা খুবই ম্রিয়মান। বন্ধু ও গুরুভাইরা মাঝে মধ্যে তাঁর কাছে আসেন—ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারও আসেন এবং বিজ্ঞান বিষয়ে নানা আলোচনায় গিরিশচন্দ্রের মন ও চেতনাকে সাংসারিক বেদনা থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করেন। গিরিশচন্দ্রও বিজ্ঞান - অঙ্ক অনুশীলনে মনকে মুক্ত করার স্বাভাবিক প্রয়াসে বেশ দিন কাটাচ্ছেন। নাটক—রঙ্গমঞ্চ—নট—নটী কিছুই আজ আর তাঁকে ভাবায় না—মাঝে মাঝে গুরুভাইদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ঠাকুরের জীবনের স্মৃতিচারণে দিনরাত অতিক্রম করে বেশ চলৎশক্তির জীবন যাপন করার সুখ-আনন্দ অনুভব করছেন। যেন অন্য গিরিশচন্দ্র! ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবন-আদর্শের অনুরণনে প্রতিদিনকার ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করে চলেছেন—সেখানে দিনের ক্ষুধা-তৃষ্ণাও ভুলে যাচ্ছেন। গভীর প্রত্যয়ে গিরিশচন্দ্র অনুভব করছেন তার জীবনে যে দুঃখ-বেদনা-শোক এসেছে তার সবটাই মঙ্গলময় ঠাকুরের দান।

এমনি ভাবনায় গিরিশচন্দ্রের প্রতিদিনের জীবনধারায় ঠাকুরের কথা স্পন্দিত হোত। একদিন গুরুভাই স্বামী নিরঞ্জানন্দ গিরিশচন্দ্রকে বললেন,

....গিরিশ, ঠাকুর তো তোমাকে সন্ন্যাসী করে তুলেছে। তবে চল, আর বাড়ী নয়—দু'জনে কোথাও চলে যাই।....

গিরিশচন্দ্র নিরঞ্জনানন্দের দিকে তাকালেন। তারপর স্মিতহাস্যে আনন্দ রসসিক্ত হয়ে বললেন, তোমরা যা বলছ, আমি তা ঠাকুরের কথা বলে এখুনি করতে প্রস্তুত; কিন্তু আমার ইচ্ছায় সন্ন্যাসী হবার শক্তি আমার নেই। কারণ আমি যে ঠাকুরকে 'বকলমা' দিয়েছি! স্বামী নিরঞ্জনানন্দ বললেন, তবে এসো, সব ছেড়ে চলে এসো।

গিরিশচন্দ্র যেন আপনার অজানতে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন—এবং নিরঞ্জনানন্দের নির্দেশিত পথে সাথে সাথে চললেন। সন্ন্যাসী গুরুভাইদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র—তার অবস্থা দেখে সন্ন্যাসীরা বেশ চিন্তান্বিত হলেন।

সেদিনের গিরিশ ভোগী - সুরাসক্ত - নারীআসক্ত—আজ তবে গিরিশের এ কি রূপ! চোখ দুটো যেন অনন্ত আকাশে নিবদ্ধ করে কাকে খুঁজছে! শরীরের প্রতিটি স্পন্দনে যেন হারিয়ে যাওয়া কোন মধু পাবার আনন্দ রস ঝরে পরছে!

স্বামী নিরঞ্জনানন্দ গিরিশচন্দ্রকে সাথে করে ঠাকুর রামকৃষ্ণের জন্মস্থান কামারপুকুরে ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত স্থানে গিয়ে তারপর জয়রামবাটীতে নিয়ে গিয়ে শ্রীশ্রী মাতা ঠাকুরাণীর পাদপদ্ম দর্শন করার ব্যবস্থা করলেন।

> ....শ্রীমাকে ভক্তদেব অনেকেই প্রথমে জগদম্বারূপে গ্রহণ কবেন নাই। তাঁহারা তাঁহাকে গুরুপত্নীরূপে জানিতেন; অতএব তাঁহার প্রতি তাঁহাদেব ভক্তিশ্রদ্ধা এবং কর্তব্য-বুদ্ধি ঐটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রমাণস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, এক যুবক কোন সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষের (কালীদানার) বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া যখন দেখিলেন, সেখানে ঠাকুরের ও অন্যান্য দেবদেবীর ছবি থাকিলেও শ্রীমায়ের ছবি নাই, তখন তিনি কালীবাবুকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কালীবাবু করজোড়ে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "ইনিই আমাদের মা, ইনিই আমাদের বাবা।" জিজ্ঞাসু ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষকে জানাইলেন। সমস্ত শুনিয়া ভক্তবর বলিলেন, "আমরাই কি আগে মাকে মানতুম? পরে নিরঞ্জন আমাদের চোখ খুলে দিলে।" পূজ্যপাদ স্বামী নিরঞ্জনানন্দ তখন শুধু যে মাকে মানিতেন তাহাই নহে, ভক্ত-মহলে অকুণ্ঠহৃদয়ে তাঁহার মহিমা খ্যাপন করিয়া বেড়াইতেন। ত্যাগী সন্তানেরা প্রথমাবধিই শ্রীমাকে জগদম্বাজ্ঞানে ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহাকে স্বহৃদয়ে স্থাপনপূর্বক ভক্তি-অর্ঘ্য প্রদান করিতেন। কিন্তু নিরঞ্জনানন্দজীর মতো তাঁহারা ডাকিয়া হাঁকিয়া প্রচার করিতেন না। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন, তাহা অকুতোভয়ে সর্বসমক্ষে প্রচার করিতেন। ইহারই ফলে গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি অনেকে শ্রীমায়ের স্বরূপের কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছিলেন।
>
> শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন বলিয়াছিলেন যে, গিরিশচন্দ্রের বিশ্বাস পাঁচ সিকে পাঁচ আনা। শ্রীমাকে গুরুপত্নী হিসাবে তিনি শ্রদ্ধা তো করিতেনই, অধিকন্তু যেদিন তিনি তাঁহাকে

জগদম্বারূপে গ্রহণ করিলেন, সেদিন সে শ্রদ্ধা ঐরূপ প্রকৃষ্ট ভক্তির আসনেই উন্নীত হইল। পরবর্তী ঘটনা হইতে আমরা আংশিক পরিচয় পাই। তখনও গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী জীবিত আছেন। গিরিশ একদিন তাঁহার সহিত নিজগৃহে ছাদে বেড়াইতেছিলেন। এদিকে শ্রীমাও অদূরবর্তী বলরাম-ভবনের ছাদে উঠিয়াছেন। উহা যে গিরিশের ছাদ হইতে দেখা যায়, তাঁহার জানা ছিল না। গিরিশচন্দ্রের পত্নী শ্রীমাকে দেখিয়াই পতিকে বলিলেন, "ঐ দেখ, মা ও বাড়ির ছাদে বেড়াচ্ছেন।" গিরিশচন্দ্র অমনি পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "না, না, আমার পাপনেত্র; এমন করে লুকিয়ে মাকে দেখব না।" এবং সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিয়া গেলেন। শ্রীমা পরে ইহা গিরিশ-জায়ার নিকট শুনিয়াছিলেন।

অনেকের ধারণা, এই সুলক্ষণা পত্নী হইতেই গিরিশের গুরুলাভ অর্থলাভ, যশোলাভ প্রভৃতি সর্বপ্রকার সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছিল। ইহার গর্ভে দুইটি কন্যা ও একটি পুত্র জন্মিয়াছিল। পুত্রের জন্মের পর প্রসূতি যখন কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া চিরবিদায় লইলেন (১২ই পৌষ, ১২৯৫; ২৬ শে ডিসেম্বর, ১৮৮৮), তখন গিরিশচন্দ্র চারিদিক শূন্য দেখিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে 'বকলমা' দিবার পর তাঁহার শোক করিবার পর্যন্ত অধিকার ছিল না; সুতরাং অন্তর্দাহে জ্বলিতে থাকিলেও তিনি অধুনা গণিতশাস্ত্রের চর্চা ও পুত্রের লালনপালনে আপনাকে সর্বদা নিরত রাখিয়া এই গভীর শোক ভুলিতে চেষ্টা করিতে থাকিলেন।

এই পুত্রের প্রতি আকর্ষণের অন্য কারণও ছিল। ভক্ত চূড়ামণি গিরিশচন্দ্র একদা শ্রীশ্রী ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ঠাকুর যেন তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। ঠাকুর অবশ্য তাহাতে সম্মত হন নাই; তথাপি তাঁহার লীলাসংবরণের পর যখন এই পুত্র জন্মিল, তখন গিবিশের স্থির বিশ্বাস হইল যে, ঠাকুর তাঁহার আকুল প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য ঐ রূপে গৃহ আলোকিত করিয়াছেন। এই পুত্রকে তাই তিনি দেবতাজ্ঞানে পালন করিতেন। ছেলেটির স্বভাব অতি মধুর ছিল; গিরিশগৃহে আগত সকলে সহজেই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেন এবং একবার অন্ততঃ তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিতেন। শ্রীমা কখনও গিরিশ-ভবনে পদার্পণ করিলে শিশু তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া আনন্দ প্রকাশ করিত।

১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে শেষভাগে (আশ্বিন-কার্তিক মাসে) শ্রীমা যখন বরাহনগরে সৌরীন্দ্র ঠাকুরের বাড়িতে বাস করিতেছিলেন, তখন সম্ভবতঃ স্বামী নিরঞ্জনানন্দেরই আগ্রহে মহাকবি এই পুত্রের সহিত শ্রীমাকে দর্শন করিতে যান। শ্রীমায়ের জীবনে এই ঘটনার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে; কারণ শ্রীযুক্ত মাস্টার মহাশয় প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত পূর্ব হইতেই তাঁহাকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া থাকিলেও ভক্তগোষ্ঠীর দ্বারা তিনি গিরিশের আগমনের পর হইতেই প্রকাশ্যভাবে জগদম্বারূপে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। তৎপূর্বে লজ্জাশীলা মা অসূর্যম্পশ্যা ছিলেন; ভক্তগণ তাঁহার দর্শন পাইতেন না, নীচে প্রণাম জানাইয়া বিদায় লইতেন। গিরিশাদির আগমনের পর হইতে শ্রীমাও ভক্তজননীরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকিলেন।

গিরিশের পুত্রের বয়স তখন তিন বৎসর। তখনও কিন্তু সে কথা বলিত না—হাবভাবে সব জানাইত। সেদিন সৌরীন্দ্র ঠাকুরের বাড়িতে উপস্থিত হইয়া সে শ্রীমাকে দেখিবার জন্য বিশেষ ব্যাকুল হইল। সে তাঁহাকে পূর্বেও দেখিয়াছে; কিন্তু গিরিশ দেখেন নাই। কথা না বলিতে পারিলেও সে অস্থির হইয়া শ্রীমা উপরে যেখানে ছিলেন, সেইদিকে দেখাইয়া উঃ উঃ করিতে লাগিল। প্রথমে কেহ বুঝিতে পারেন নাই; পরে বুঝিতে পারিয়া জনৈক সেবক তাহাকে উপরে লইয়া গেলে সে মায়ের চরণতলে পড়িয়া প্রণাম করিল। তারপর নীচে নামিয়া সে পিতাকে উপরে লইয়া যাইবার জন্য হাত ধবিয়া টানিতে থাকিল। তিনি উচ্চঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন, **'ওরে, আমি মাকে দেখতে যাব কি—আমি যে মহাপাপী!"** বালক কিন্তু কিছুতেই ছাড়িল না। তখন তাহাকে কোলে করিয়া গিরিশচন্দ্র কম্পিতকলেবরে চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে উপরে গিয়া একেবারে শ্রীমায়ের পদতলে দন্ডবৎ পতিত হইলেন এবং বলিলেন **'মা, এ হতেই তোমার শ্রীচরণদর্শন হল আমার।"**

পুত্রটি কিন্তু স্বল্পায়ু ছিল—তিন বছর বয়সেই সে দেহত্যাগ করে। ইহার কিছুকাল পরে পুত্রশোক ভুলিবার জন্য নিরঞ্জনানন্দজীর পরামর্শে গিরিশচন্দ্র তাঁহার সহিত জয়রামবাটী যাইয়া কয়েক মাস কাটাইয়া আসেন। তাঁহাদের সঙ্গে সেবারে স্বামী সুবোধানন্দজী, নির্ভয়ানন্দজী এবং বোধানন্দজীও গিয়াছিলেন। গিরিশবাবুব সঙ্গে এক পাচক ব্রাহ্মণ এবং একজন চাকর ছিল। তাঁহাবা বর্ধমান ও উচালনের পথে কামারপুকুর হইয়া জয়রামবাটী যান। ইহা ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের কথা।"

মায়ের বাটীতে পৌঁছিয়া গিরিশচন্দ্র স্নানান্তে আর্দ্রবস্ত্রে মাকে প্রণাম করিতে চলিলেন। মায়ের দর্শনচিন্তায় তখন তিনি বিভোর, সমস্ত অঙ্গ ভাবে কম্পমান। শ্রীমায়ের চরণে মস্তক স্পর্শ করাইয়া তিনি যেমন উপরের দিকে চাহিয়াছেন, অমনি মায়েব মুখ দেখিয়া সবিস্ময়ে ভাবিলেন, "এ্যাঁ, মা তুমি।" এই বিস্ময়ের সহিত গিবিশেব জীবন-মরণের একটি ঘটনার সংযোগ ছিল। সে বহুকাল পূর্বের কথা। যুবক গিরিশ তখন বিসূচিকায় শয্যাগত—জীবনের আসা নাই। হঠাৎ তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, এক মাতৃমূর্তি মহাপ্রসাদ আনিয়া তাঁহার মুখে দিয়া বলিতেছেন, "খাও"। তাঁহার পরনে লাল কস্তাপেড়ে শাড়ি, দেহে এক অপার্থিব জ্যোতি, আর মুখে চিত্তহারী স্নেহ। সে প্রসাদ বড় সুস্বাদ ছিল। উহা খাইতে খাইতে গিরিশের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল; কিন্তু তখনও চক্ষে সে দেবীমূর্তি ভাসিতেছে, আর জিহ্বায় প্রসাদের স্বাদ রহিয়াছে। ক্রমে তিনি নীরোগ হইলেন। গিরিশ দেখিলেন, স্বপ্নের সেই দেবী আজ অকস্মাৎ সম্মুখে উপস্থিত। তিনি পূর্বে কখনও শ্রীমায়ের মুখ নিরীক্ষণ করেন নাই। আজ বুঝিলেন, এই দেবীই তাঁহাকে সতত রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তবু মায়ের মুখে সত্য জানিবার জন্য বাহিরে আসিয়া অপরের দ্বারা প্রশ্ন করিয়া পাঠাইলেন, শ্রীমা গিরিশকে পূর্বে ঐ ভাবে কখনও দর্শন দিয়াছেন কিনা। মা তাহা স্বীকার করিলেন। তথাপি জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি না হওয়ায় গিরিশ আর একদিন তাঁহার নিকট জানিতে চাহিলেন, *"তুমি কি*

রকম মা?" মা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, **'আমি সত্যিকারের মা; গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়—সত্য জননী।"**

প্রায় দুই সপ্তাহ সেখানে অবস্থানের পর গিরিশবাবু ও নিরঞ্জনানন্দজী ব্যতীত আর সকলে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। সেবারে দীর্ঘকাল পল্লীগ্রামে বাস করিয়া মহাকবির মনে অতীব আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল। শহরের কোলাহল ও শত ঝঞ্ঝাট হইতে মুক্ত থাকিয়া তিনি শ্রীমায়ের গৃহে অতি সুখে দিন যাপন করিতেন। তিনি মাঠে ঘাটে সরল কৃষাণদের সহিত বেড়াইতেন। উদর পূর্ণ করিয়া শ্রীমায়ের নিকট প্রসাদ পাইতেন এবং চেষ্টা না করিয়া স্বতই সর্বদা শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন আলোচনায় ও অধ্যাত্ম চিন্তায় ভরপুর হইয়া থাকিতেন। সূর্যাস্তের পর মুক্ত প্রান্তরে যাইয়া তিনি আপনমনে বসিয়া চক্ষু ভরিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য পান করিতেন। তিনি নাট্যকার ও নাট্যাচার্য—এই সংবাদ প্রচারিত হইতে অধিক দিন লাগে নাই। তাই পল্লীবাসীরা তাঁহার মুখে গান শুনিতে চাহিত। তিনি যতই বুঝাইতেন যে, তিনি রচয়িতা হইলেও গায়ক নহেন, তাহারা ততই অনুনয় করিতে থাকিত। অগত্যা তাঁহাকে গাহিতে হইত। শ্রীমা দূর হইতে তাঁহার মুখে গান শুনিয়া দুই-খানি শিখিয়া লইয়াছিলেন এবং পরে একদিন জনৈক সেবককে গাহিয়া শুনাইয়াছিলেন—

হামা দে পালায়, পাছু ফিরে চায়, রানী পাছে তোলে কোলে।
রানী কুতূহলে ধর ধর বলে, হামা টেনে তত গোপাল চলে।

একদিন দেশড়ার হরিদাশ বৈরাগী আসিয়া বেহালা-সংযোগে গান শুনাইয়া গেল—

কি আনন্দের কথা উমে (গো মা)
(ওমা) লোকের মুখে শুনি. সত্য বল শিবানী,
অন্নপূর্ণা নাম কি তোর কাশীধামে?
অপর্ণে, যখন তোমায় অর্পণ করি,
ভোলানাথ ছিলেন মুষ্টির ভিখারি।
আজ কি সুখের কথা শুনি শুভঙ্করী—
বিশ্বেশ্বরী তুই কি বিশ্বেশ্বরের বামে?
ক্ষেপা ক্ষেপা আমার বলত দিগম্বরে,
গঞ্জনা সয়েছি কত ঘরে পরে;
এখন দ্বারী নাকি আছে দিগম্বরের দ্বারে,
দরশন পায় না ইন্দ্র-চন্দ্র-যমে!
হিমালয়-বাস হর করিয়াছে,
ভিক্ষায় দিন-রক্ষা এমন দিন গেছে,
এখন কুবের-ধনেতে কাশীনাথ হয়েছে।

ফিরেছে কি কপাল তোর কপালক্রমে?
বিষয়বুদ্ধি, বটে, বিশ্বাস হইল মনে
তা না হলে গৌরীর এতেক গৌরব কেনে?
নয়নে না দেখে আপন সন্তানে,
মুখ বাঁকায়ে রয় শ্রীরাধিকার নামে।।

শ্রীমা ও ঠাকুরের জীবনলীলার বর্ণনাসদৃশ ভাববহুল সে সঙ্গীতশ্রবণে একদিকে গিরিশচন্দ্র প্রভৃতির এবং অপরদিকে গৃহাভ্যন্তরে শ্রীমায়ের অশ্রু বিগলিত হইয়াছিল।

জয়রামবাটীতে কালীমামার সহিত গিরিশবাবুর একদিন তুমুল তর্ক উপস্থিত হইল—বিষয়, শ্রীমা দেবী কিনা। মামা তাঁহাকে দিদি বলিয়াই জানিতেন। আর ইহা তাঁহার পক্ষে দূষণীয় নহে; কারণ পুরাণেও দেখা যায় যে, যদুবংশীয়গণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্য ক্রীড়া ও ভোজনাদি করিয়াও তাঁহাকে ঈশ্বররূপে চিনিতে পারেন নাই। এদিকে ভক্ত গিরিশের বিশ্বাসও অটল। কালীমামা বলেন, "তোমরা দিদিকে 'মা জগদম্বা, জগজ্জননী' ইত্যাদি কতই বল। কই আমরা এক মাতৃগর্ভে জন্মেছি—আমি তো কিছু বুঝতে পারি না।" গিরিশবাবু দৃঢ় ও গম্ভীর-কণ্ঠে বলেন, "কি বলছ? তুমি এক সাধারণ পাড়াগেঁয়ে ব্রাহ্মণের ছেলে; যজন-যাজন, পঠন-পাঠন ব্রাহ্মণের কাজ ছেড়ে চাষবাস নিয়ে জীবন কাটাচ্ছ। তোমাকে যদি একটা চাষের বলদ দেবে বলে তো তুমি তার পেছনে পেছনে অন্ততঃ ছ মাস ঘুরতে থাক। আর অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মহামায়া তোমাকে দিদিরূপে সমস্ত জীবনে ভুলিয়ে রাখতে পারেন না? যাও, যদি ইহ ও পরজন্মে মুক্তি চাও তো এখনই মায়ের পাদপদ্মে শরণ লও। আমি বলছি, যাও!" কথার মধ্যে একটা শক্তি ছিল! তাই কালীমামা দিদির নিকট গেলেন এবং গিরিশবাবুর পরামর্শানুযায়ী চরণ ধরিয়া শরণ লইলেন। কিন্তু শ্রীমা বলিলেন, "ওরে কালী, আমি তোর সেই দিদি। আজ তুই এ কি করছিস্?" সুতরাং কালীমামা সাধারণ মনোভাব লইয়াই ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু গিরিশবাবু ছাড়িবার পাত্র নহেন। সব শুনিয়া তিনি কালীমামাকে আবার পাঠাইতে চাহিলেন। কিন্তু মামা আর গেলেন না।

শ্রীমায়ের স্নেহ যত্নে সেবারে গিরিশ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পল্লীগ্রামে দুগ্ধ সহজলভ্য নহে; অথচ গিরিশবাবুর প্রভাত হইলেই চা আবশ্যক। শ্রীমা স্বয়ং সন্ধান করিয়া তাঁহার জন্য দুধ লইয়া আসিতেন। গিরিশচন্দ্র আরও দেখিতেন যে, তাঁহার বিছানার চাদর প্রতিদিনই ধপধপে সাদা। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া তিনি একদিন দেখিলেন, শ্রীমা পুষ্করিণীর ঘাটে সাবান দিয়া তাঁহার চাদর কাচিতেছেন।

এই সময়ের একটি ঘটনায় শ্রীমায়ের বিচারশক্তি এবং স্বীয় অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। সংসারতাপে ক্লিষ্ট গিরিশবাবু একদিন তাঁহার শ্রীচরণে সন্ন্যাসগ্রহণের বাসনা নিবেদন করিলে শ্রীমা সম্মতি দিলেন না। তখন

বুদ্ধিমান ও শব্দপ্রয়োগনিপুণ মহাকবি আধ ঘন্টা ধরিয়া নানাভাবে শ্রীমাকে বুঝাইতে লাগিলেন। এই প্রখর বুদ্ধিমত্তার সম্মুখে অতি অল্প লোকই স্বমতে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারতেন; কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে শ্রীমা স্বীয় সিদ্ধান্ত হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না।

ঐ অঞ্চলে থাকার সুযোগে গিরিশবাবু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থানেও কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। শ্রীমাও সঙ্গে গিয়াছিলেন। গিরিশবাবু জয়রামবাটী হইতে "ফিরিবার কালে শ্রীশ্রীমাকে অকপটে অন্তরের সরল কথা খুলিয়া বলিয়া অতঃপর তাঁহার ইতিকর্তব্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়াছিলেন। **এখন হইতে সম্পূর্ণ অন্য এক ব্যক্তি হইয়া তিনি কলিকাতায় ফিরিলেন এবং ঠাকুরের অলৌকিক চরিত্র এবং শিক্ষা-দীক্ষা লইয়া পুস্তক সকলের প্রণয়নে অবশিষ্ট জীবন নিয়োগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন"** ('উদ্বোধন', আষাঢ়, ১৩২০)।

সূক্ষ্মদর্শী ও সুকবি গিরিশের চক্ষু যেমন সুন্দর ও পবিত্র দৃশ্যাবলী চিরকালের মতো হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া লইত, তাঁহার নিপুণ ভাষাও তেমন প্রয়োজনস্থলে উহার নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত করিয়া অপরের তৃপ্তি ও কল্যাণ বিধান করিত। মা যখন সরকারবাড়ি লেনে গুদামঝড়িতে ছিলেন (১৮৯৬ খ্রীঃ), তখন গিরিশ প্রায়ই সেখানে তাঁহাকে প্রণাম জানাইতে যাইতেন। মা যেদিন সে বাড়ি হইতে দেশে ফিরিবেন, সেদিন কবিবর সেখানে আসিলেন এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া শুধু স্বামী যোগানন্দকে ডাকিয়া লইয়া গম্ভীরভাবে উপরে চলিয়া গেলেন। উপস্থিত সকলেই তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। গিরিশ শ্রীমাকে ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া যুক্ত-করে বলিলেন, **"মা, তোমার কাছে যখন আসি, তখন আমার মনে হয়, আমি যেন ছোট্ট শিশু, নিজ মায়ের কাছে যাচ্ছি। আমি বয়স্ক ছেলে হলেও মায়ের সেবা করতে পারতুম। কিন্তু সবই উল্টা ব্যাপার, তুমিই আমাদের সেবা কর, আমরা তোমার করি না। এই তো জয়রামবাটী যাচ্ছ। সেখানে পাড়াগাঁয়ের উনুনের পাশে বসে দেশের লোকের জন্য রাঁধবে আর তাদের সেবা করবে। আমি কেমন করে তোমার সেবা করব? আর মহামন্ত্রীর সেবার কিই বা জানি?"** বলিতে বলিতে তাঁর কণ্ঠ রূদ্ধ ও মুখ আরক্তিম হইল। একটু পরে সকলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, **"ভগবান ঠিক আমাদেরই মতো মানুষ হয়ে জন্মান—এটা বিশ্বাস করা মানুষের পক্ষে শক্ত। তোমরা কি ভাবতে পার যে, তোমাদের সামনে পল্লীবালার বেশে জগদম্বা দাঁড়িয়ে আছেন? তোমরা কি কল্পনা করতে পার যে, মহামায়ী সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো ঘরকন্না ও আর সব রকম কাজকর্ম করছেন? অথচ তিনিই জগজ্জননী, মহামায়া, মহাশক্তি—সর্বজীবের মুক্তির জন্য এবং মাতৃত্বের আদর্শস্থাপনের জন্য আবির্ভূতা হয়েছেন।"** গিরিশের উদ্দীপনাময়, ভাব-গম্ভীর বাক্যে সকলে ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে স্টেশন পর্যন্ত যাইয়া শ্রীমাকে গাড়িতে তুলিয়া দিলেন।

গিরিশ শ্রীমাকে প্রথমে গুরুপত্নীরূপে এবং পরে মাতা ও দেবীরূপে গ্রহণ

করিয়াছিলেন। সকল ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া মায়ের প্রতি তাঁহার ভক্তি বা শ্রদ্ধামিশ্রিত আত্মীয়তাবোধ এতই বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তিনি শুধু মায়ের সেবা ও প্রকাশ্যে মহিমা খ্যাপন করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, নিজ হৃদয়ে মায়ের প্রতি সন্তানবৎ একটা নিঃসঙ্কোচ ব্যবহারেরও শক্তি পাইতেন। গিরিশচন্দ্রের মাতৃসেবা সম্বন্ধে শ্রীমায়ের নিজের উক্তি হইতে জানা যায় যে, গিরিশ একসময়ে দেড় বৎসর কাল মায়ের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। তাঁহার সরল-পুত্রবৎ আচরণেরও একটি দৃষ্টান্ত দিলাম।

শ্রীমা একবার দীর্ঘকাল পরে দেশ হইতে ফিরিতেছেন; সঙ্গে যোগীন-মা এবং গোলাপ-মাও আছেন। বিষ্ণুপুরের গাড়ি হাওড়া স্টেশনে সকালে পৌঁছিবার কথা। তাই স্বামী ব্রহ্মানন্দজী স্বামী প্রেমানন্দজীকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবুরামদা, মা আসছেন অনেক দিন পরে; একবার কি হাওড়া স্টেশনে গিয়ে মাকে দর্শন করা যায় না।" প্রস্তাবে প্রেমানন্দজী সহজেই সম্মত হইলেন। কিন্তু স্টেশনে আসিয়া জানিলেন যে, গাড়ি প্রায় তিন ঘন্টা দেরীতে পৌঁছিবে। তথাপি এতদূর আসিয়া ফিরিয়া যাওয়া চলে না বলিয়া তাঁহারা অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। দারুণ গ্রীষ্ম, সকলের খুবই কষ্ট হইতেছিল, তথাপি কেহ দর্শন না করিয়া ফিরিলেন না। নির্দিষ্ট কালের বহু পরে গাড়ি আসিলে যোগীন-মা ও গোলাপ-মা সন্তর্পণে মাকে নামাইলেন। ব্রহ্মানন্দজী ও সমবেত ভক্তদের প্রতি গোলাপ-মার দৃষ্টি পড়িবামাত্র তিনি তাঁহাদের নিকটে আসিয়া শাসাইয়া গেলেন, "হ্যাঁ মহারাজ, তোমাদের কি একটু আক্কেল নাই? এই রোদে মা তেতেপুড়ে এলেন, আর তোমরাই যদি পেন্নাম করবার জন্য এখানে এসে বিভ্রাট কর, তো অপরের আর কথা কি?" নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় মহারাজ আর প্রণাম করিতে অগ্রসর হইলেন না, ভক্তদেরও তখন সেই অবস্থা। শ্রীমাকে বাগবাজারে লইয়া যাওয়া হইল। এদিকে মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজ ভাবিলেন, প্রণাম না করিলেও একবার মায়ের বাড়িতে গিয়া দেখিয়া আসা উচিত— ব্যবস্থাদি ঠিক ঠিক হইয়াছে কিনা। সুতরাং ভিন্ন গাড়িতে তাঁহারাও সেখানে পৌঁছিয়া নীচে বসিয়া রহিলেন। এমন সময় গিরিশবাবু আসিয়া উপস্থিত— ঘর্মাক্ত-কলেবর, গায়ে সামান্য একটা পিরান; তিনিও মায়ের দর্শনার্থী। মহারাজ প্রভৃতিকে নীচে দেখিয়া তিনি মায়ের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তিনি যথাসাধ্য নিম্নস্বরেই কথা কহিতেছিলেন; তথাপি গলার স্বাভাবিক গম্ভীর আওয়াজ উপরেও পৌঁছিতেছিল; ইহা শুনিয়া গোলাপ-মা নীচে আসিয়া আবার হাওড়া স্টেশনেরই মতো ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এবার পট পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে, আর নায়কের ভূমিকায় নামিয়াছেন মহারাজের স্থলে গিরিশচন্দ্র! তাই গোলাপ-মা যেমন বলিলেন, "বলিহারি যাই ঘোষজার এই অপূর্ব ভক্তি দেখে। বলি, গিরিশবাবু, মাকে তো দেখতে এসেছ! মা তেতেপুড়ে এলেন— কোথায় একটু জিরবেন, না এখানেও এলে কিনা জ্বালাতন করতে!" অমনি গিরিশবাবু সে কথায় কান না দিয়া সোজা উপরে চলিলেন এবং স্বামীজীকে ডাকিয়া বলিলেন, **'চল, চল, মহারাজ, বাবুরাম, মাকে দেখে আসি।"** গোলাপ-মার শাসনবাণী পুনরুচ্চারিত হইলে, গিরিশ সেবিকার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ঝাঁজা মেয়ে বলে কিনা মাকে জ্বালাতন

করতে এসেছি! কোথায় এত দিন পরে এসে ছেলের মুখ দেখে মায়ের প্রাণ জুড়িয়ে যাবে, আর ইনি মাতৃস্নেহ শেখাচ্ছেন!" তাঁহারা উপরে চলিয়া গেলেন এবং মাও তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণপূর্বক আশীর্বাদ করিলেন। গোলাপ-মাও ততক্ষণে আসিয়া পড়িয়াছেন। তিনি সজলনয়নে অভিযোগ করিলেন, "শেষে কিনা গিরিশবাবু আমাকে এরকম বললে!" শ্রীমা তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমাকে না অনেক বার বলেছি, আমার ছেলেদের সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করতে যেও না?" গিরিশবাবু জয়লাভ করিয়া সগর্বে নীচে নামিয়া আসিলেন।

১৩১৪ সালের শারদীয়া পূজার দিন ঘনাইয়া আসিতেছে শ্রীযুক্ত গিরিশ এবং তাঁহার দিদি শ্রীযুক্তা দক্ষিণা স্বামী সারদানন্দজীর দ্বারা জয়রামবাটীতে পত্র লিখাইলেন, তাঁহাদের একান্ত ইচ্ছা যে, শ্রীমা গিরিশবাবুর বাটীতে দুর্গোৎসবের সময় উপস্থিত থাকেন, তিনি না আসিলে পূজাই ব্যর্থ হইবে; শ্রীমায়ের সম্মতি পাইলেই তাঁহারা পাথেয় পাঠাইয়া দিবেন। শ্রীমায়ের শরীর তখন ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া খুবই খারাপ। তথাপি তিনি পত্র শুনিয়া ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য কলিকাতায় যাইতে সম্মত হইলেন। তদনুসারে সমস্ত ব্যবস্থা হইল। যথাসময়ে শ্রীমা বিষ্ণুপুরের পথে কলিকাতা যাত্রা করিলেন; তাঁহার সঙ্গে চলিলেন পাগলী মামী ও রাধু। বিষ্ণুপুরে পৌঁছিয়া তাঁহারা দেখিলেন যে, শ্রীযুক্ত মাস্টার মহাশয় ও ললিতবাবু অপ্রত্যাশিতভাবে তথায় উপস্থিত আছেন এবং আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। সেবার কলিকাতায় দাঙ্গা হইতেছিল—রাত্রে শহর অন্ধকার—তাই তাঁহারা শ্রীমায়ের নিরাপত্তার জন্য আগাইয়া আসিয়াছেন। আহারাদি হইয়া গেলে সকলে ট্রেনে উঠিলেন। সন্ধ্যার পর ট্রেন হাওড়া স্টেশনে পৌঁছিলে দেখা গেল, শ্রীমাকে লইয়া যাইবার জন্য ললিতবাবুর ঘোড়ার গাড়ি উপস্থিত আছে। উহাতে শ্রীমাকে বসাইয়া এবং প্রহরীরূপে পাদানে ও কোচবাক্সে কয়েকজন ভক্ত দাঁড়াইয়া বা বসিয়া সকলে বলরামবাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। এখানেই শ্রীমায়ের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

পরদিন গিরিশের দিদি আসিয়া প্রণাম করিয়া জানাইলেন যে, শ্রীমা আসাতে তাঁহাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান হইয়া গেল; কারণ গিরিশ বাঁকিয়া বসিয়াছিলেন, মা না আসিলে পূজা করা নিরর্থক; সুতরাং সেরূপ স্থলে তিনি পূজা করিবেন না।

দিন কয়েক পরে গিরিশ-ভবনে পূজা আরম্ভ হইল—শ্রীমায়ের সম্মুখেই কল্পরাম্ভ হইল। এদিকে আবার বলরাম-ভবনে আর এক পূজার সূত্রপাত হইল। সপ্তমীর দিন প্রাতঃকাল হইতেই দলে দলে ভক্ত আসিয়া শ্রীমায়ের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগিলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া তিনি শত শত ভক্তের অর্ঘ্য গ্রহণ করিলেন; পরে **গিরিশ-ভবন হইতে সংবাদ পাইয়া পূজা-দর্শনার্থে তথায় গেলেন এবং পূজা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই রহিলেন।** মহাষ্টমী-দিনেও শ্রীমা বলরাম-গৃহে ভক্তদের পূজা গ্রহণ করিলেন; গিরিশভবনেও তাহাই করিতে হইল। তখন শরীর অসুস্থ থাকিলেও চাদর মুড়ি দিয়া তিনি সকলের পূজা স্বীকার করিলেন, কাহাকেও

বিফলমনোরথ করিলেন না। দুই দিন এইরূপ পরিশ্রমের পর স্থির হইল যে, সন্ধিপূজায় মা উপস্থিত থাকিবেন না। সেবার গভীর রাত্রে সন্ধিপূজা। গিরিশ ও তাঁহার দিদি সংবাদ পাইয়া দুঃখে মুহ্যমান হইলেন এবং আক্ষেপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেরূপ পরিস্থিতিতে কিছুই করিবার নাই। এদিকে সন্ধিপূজার কিছু পূর্বে শ্রীমা বলিলেন যে, তিনি গিরিশ-ভবনে যাইবেন, এবং তদনুসারে বলরামবাবু বাটীর পশ্চিম পার্শ্বস্থ সরু গলি দিয়া তিনি ও স্ত্রী-ভক্তগণ হাঁটিয়া চলিলেন! গিরিশের খিড়কির দরজায় উপস্থিত হইয়া শ্রীমা দ্বারে আঘাত করিয়া বলিলেন, "আমি এসেছি।" সে সংবাদ বিদ্যুদ্বেগে সর্বত্র প্রচারিত হইয়া এক নব উদ্দীপনার সঞ্চার করিল। ঝি দরজা খুলিয়া দিল। গিরিশ সানন্দে শুনিলেন, সাক্ষাৎ জগদম্বা তাঁহার পূজা গ্রহণার্থে সমস্ত কষ্ট স্বীকার করিয়া এই গভীর রাত্রে সত্য সত্যই পূজামন্ডপে অবতীর্ণা।

একটু পূর্বে তিনি ভক্তদের সহিত উপরে বৈঠকখানায় বসিয়াছিলেন এবং বলিতেছিলেন যে, মা-ই যখন আসিলেন না; তখন পূজামন্ডপে যাওয়া বৃথা। এখন মায়ের আগমনসংবাদে সোল্লাসে, গদ্‌গদ স্বরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, "আমি ভেবেছিলুম আমার পূজাই হল না—এমন সময় মা দরজায় ঘা দিয়ে ডাকলেন, 'আমি এসেছি'।" তাড়াতাড়ি সকলে নীচে নামিয়া আসিলেন। শ্রীমা প্রতিমার প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া উত্তর-পশ্চিম কোণে দাঁড়াইয়া রহিলেন—ভক্তগণ আসিয়া তাঁহার শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। নবমীপূজাও এইভাবেই কাটিয়া গেল—তিন দিনই শ্রীমা সকলের অর্ঘ্য লইলেন; গিরিশের আত্মীয়স্বজন, এমন কি, থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রী, পরিচিত-অপরিচিত, কেহই বঞ্চিত হইল না। মহাপূজা শেষ হইল।

শ্রীমা সারদাদেবী : স্বামী গম্ভীরানন্দ।

গিরিশচন্দ্র যে ক'দিন 'মা' সারদার কাছে ছিলেন—প্রাণ খুলে মা-ছেলেতে অনেক কথা হয়েছে। মা ও সুযোগ পেয়ে ভৈরব ছেলেকে পেট পুরিয়ে যা যা ভালবাসে, খাইয়েছেন। প্রতিদিনই অধ্যাত্ম ভাবনার উচ্চকোটি কথা ও চিন্তার বিস্তার সেসময় গিরিশের অন্তরে গভীর ভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। নানা আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে গিরিশচন্দ্র 'মা'কে অন্তরের কথা খোলাখুলি বলতেন এবং পরবর্তী জীবনে কিভাবে কাটাবেন, কেমন করে চলবেন তাও জিজ্ঞাসা করতেন।

।। ছত্রিশ।।

জয়রামবাটী থেকে কলকাতায় ফিরেই গিরিশ সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ হয়ে প্রতিদিনের জীবন-ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করতে লাগলেন। অবসর পেলেই শ্রীশ্রীঠাকুর ও জ্যান্ত 'মা'র জীবনধারা আদর্শ অনুসরণ করতে সচেষ্ট হতেন। অন্তর সত্তায় বেদনা ও বাসনা—এই দুয়ের প্রতিকূলতাকে নিজের মধ্যেই মিমাংসা করে এগিয়ে যেতে উদ্যোগ গ্রহণ

করলেন অত্যন্ত বিচক্ষণতার মধ্যে। গুরুভাই সন্ন্যাসীদের কাছে মাঝে মাঝে যান—নানা কথা শোনেন বিচার বিশ্লেষণে যোগদান করে অন্তর-বিস্তারের 'ঠাকুর' ও 'মা'র প্রভাবকে আরো আরো নিবিড় করে অনুভব করার সুযোগ গ্রহণ করতেন। **তবে কোন কিছুই বিচার না করে গ্রহণ করা গিরিশচন্দ্রের স্বভাব বিরুদ্ধ।** গিরিশচন্দ্রের বিশ্বাসবোধ অত্যন্ত গভীর এবং কার্যকারণ বিধি অতিক্রান্ত যে কোন পরিস্থিতিতে পথ বের করে চলতে পারতেন। এমনি করেই অধ্যাত্ম জীবনের রাজপথে দেখা পেয়েছিলেন অনেকের।

একসময় স্ত্রীর প্রয়াণ, পুত্রের প্রয়াণ—গিরিশচন্দ্রের মানসিক এবং দৈহিক তপ্তবায়ু অত্যন্ত সুনিপণভাবে খুবই আছন্ন করে রেখেছিল। **কামারপুকুর ও জয়রামবাটী থেকে ফিরে সেই গিরিশচন্দ্র সম্পূণ অন্য মানুষ, অন্য গিরিশচন্দ্র, ভক্ত গিরিশচন্দ্র—যার ভক্তি বিশ্বাস পাঁচ সিকের অনুভব।**

কলকাতায় পাথুরিয়াঘাটার প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় বাগবাজারে এসে গিরিশচন্দ্রের সাথে দেখা করে নানা আলোচনায় একটি থিয়েটার পত্তনের কথা বলেন। গিরিশচন্দ্র অত্যন্ত মনোযোগের সাথে নাগেন্দ্রনাথের প্রস্তাব শুনলেন এবং বুঝলেন নাগেন্দ্রের অনেক অর্থ আছে—থিয়েটার চালাতে হয়ত সমর্থ হবে। তাই পুরাতন 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের' খালি জমির মালিক মহেন্দ্রনাথ দাসের কাছ থেকে লীজ নিয়ে থিয়েটারের ভিত্তি স্থাপন করা হল—নাম দেওয়া হল *'মিনার্ভা থিয়েটার'*। এদিকে 'সিটি থিয়েটারের নট-নটীগণ তাদের থিয়েটারের স্থানের অল্পতা এবং অর্থ ও অন্যান্য অনিবার্য কতকগুলি বিষয়ে নিয়মিত অসুবিধার কথা গিরিশচন্দ্রকে তারা জানিয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্র নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় দ্বারা অর্থ বিনিয়োগ করিয়ে নতুন নাট্যালয় নির্মাণ করালেন এবং সিটি থিয়েটারের নট-নটীদের যোগদানের পরামর্শ দিলেন। কিন্তু নতূন রঙ্গালয়ে যোগদানে যে সকল সর্ত নট-নটীদের কাছ থেকে এসেছিল তাতে নাগেন্দ্রভূষণ গ্রহণ করতে রাজি হলেন না। তা ছাড়া নতুন রঙ্গালয় *'মিনার্ভা'* তৈরী করতে প্রচুর টাকা লেগেছে এবং তাতে তিনি ঋণগ্রস্ত হয়েছেন।

মিনার্ভা থিয়েটার

গিরিশচন্দ্রের ইচ্ছাপূরণ না হওয়ায় বেশ কিছুটা থেমে গিয়েও নূতন উৎসাহে সব প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে নতুন নট-নটীদের সন্ধানে যখন চিন্তা-ভাবনা করছেন তখন আশীর্বাদের ধারায়, যেন যুক্ত হল অর্ধেন্দু শেখর মুস্তাফী সহ বেশ কিছু নবীন যুবক সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু), চুনীলালদেব, কুমুদনাথ সরকার, নীলমণি ঘোষ প্রভৃতি)—যাঁরা গিরিশচন্দ্রের নেতৃত্বে নাটক করার জন্য এগিয়ে এলেন। গিরিশচন্দ্র অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে সেইসব নবীন যুবকদের নাট্য চরিত্র রূপায়নে তালিম দিয়ে দিয়ে *'মিনার্ভায়'* নতুন ভাবনায় ও আঙ্গিকে ইংরেজী নাটক *'ম্যাকবেথ'* দ্বিতীয়বার অনুবাদ করে অভিনয়ের ব্যবস্থা করলেন। নাট্যভাবনায় ও অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র নতুন ভাবনায়

সিক্ত অভিনয় আঙ্গিকের অভিনবত্বে রঙ্গমঞ্চের পরিধি প্রসারিত করলেন। ম্যাকবেথ'এর অনুবাদ গিরিশচন্দ্র অনেক আগে 'গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারে' অভিনীত করিয়েছিলেন, সেসময় অনুবাদটির প্রশংসা ও গিরিশচন্দ্রের অতুলনীয় প্রতিভাব তারিফ করেছিলেন অনেক বুদ্ধিজীবীগণ।

ঈশ্বর প্রদত্ত পাণ্ডিত্যের রস মথিত করে গিরিশচন্দ্র প্রত্যেকটি চরিত্রের মূলকে গভীরভাবে রূপ দান করতে সমর্থ হয়েছিলেন প্রাণসতেজ অনুবাদের শক্তিতে। প্রথমবার 'ম্যাকবেথ' অনুবাদটি কোন একটি পরিস্থিতিতে (গিরিশচন্দ্র যখন অ্যাট্‌কিনসন কোম্পানী কাজ করতেন তখন 'ম্যাকবেথে'র অনুবাদের পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে যায়) খোয়া যাওয়ার পর দীর্ঘকাল পরে নতুন রস ও অভিনব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অনুবাদের অভিনয় সকলের সাধুবাদ কুড়িয়েছেন গিরিশচন্দ্র। বিশেষ করে ম্যাকবেথের *'ডাকিনী'* চরিত্রের প্রকাশ ও চিন্তার মূলকে স্পর্শ করতে সমর্থ হয়েছে।

১৮৯৩ সালের ২৮ শে জানুয়ারী **সেই 'ম্যাকবেথ' অভিনয় দিয়ে 'মিনার্ভা থিয়েটারে' এর প্রকাশ হয়।**

গিরিশচন্দ্র যৌবন বয়সে অভিনয়ের কলা কৌশলের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন **মিসেস লুইসের সাথে পরিচয়সূত্রে।** সেসময় সেক্সস্পীয়রের নাটকগুলি অভিনয়ের মাধ্যমে প্রচার করা হোত। 'মিনার্ভা থিয়েটার'এ অভিনীত 'ম্যাকবেথ' জানিয়ে দিল—**বাঙলা ভাষায় বাঙালী অভিনেতাদের মাধ্যমে মূলরস এতটুকু বিঘ্নিত** না করে সাবলীল সৌন্দর্য ও স্বকীয়তায় সুন্দর অভিনয় সম্ভব। একাজে গিরিশচন্দ্র যেভাবে প্রত্যেকটি চরিত্র অভিনয়ের শিক্ষা দান করেছেন তা তো সর্বস্তরের দর্শক ও নেতৃত্বস্থানীয় ইংরেজী সাহিত্যের পণ্ডিতগণও সুখ্যাতি করেছেন। একটা 'Admirable representation of all the conventions of an English Stage'.... **এই নাটকে তিনকড়ি দাসীর লেডী ম্যাকবেথের অভিনয় অসাধারণ। ইংল্যাণ্ডের তাবৎ বড় বড় শিক্ষিতা অভিনেত্রীদের ছাপিয়ে গিয়েছেন—তিনকড়ি দাসীর অভিনয় যা বাঙলা তথা ভারত তথা বিশ্ব নাট্য সমাজেও বিরল ঘটনা।** গিরিশচন্দ্র অভাবনীয় পরিশ্রম অধ্যবসায় এবং বিপুল অর্থব্যয় করে 'ম্যাকবেথ' অভিনীত করেন—কিন্তু সাধারণ দর্শক তেমন উৎসাহে নাটকটি গ্রহণ করতে পারেনি। গিরিশচন্দ্র অনুবাদের ধারায় এদেশীয় ভাবনা ও রসকে যতটা সম্ভব মূল থেকে বহিস্কৃত না করে সামগ্রিকতার দিকে নজর দিয়েছিলেন। অর্থব্যয় বিপুল—কিন্তু সেরূপ অর্থ আদায় হয়নি।

ম্যাকবেথ

'মিনার্ভায়' গিরিশচন্দ্রের প্রথম নাটক *'মুকুল মঞ্জুষা'* অভিনীত হয়। নাটকটি 'আদিরসাত্মক' দৃশ্যকাব্য।

মুকুলমঞ্জুষা

মিনার্ভায় 'ম্যাকবেথ' নাটকের তেমন কদর না হওয়ায় গিরিশচন্দ্র নাটকটি আবার

অভিনীত করিয়ে দর্শকদের আকর্ষণ করার অভিপ্রায়ে নিজে নাটকটি উল্লেখ করে Handbill ছেপে প্রচার করেছিলেন।

.... মিনার্ভা থিয়েটারে—৬ নং বিডন স্ট্রীট - শনিবার ২৩ শে মাঘ ১২৯৯—রাত্রি ৯ ঘটিকা। ম্যাকবেথ (তৃতীয় অভিনয় রজনী) I have freely avaited myself of European aid in mounting of dressing the piece with stick abherence to time and place. সুযোগ্য ইংরেজ চিত্রকর দ্বারা চিত্রপটগুলি চিত্রিত ও ইংরাজ তত্ত্বাবধানে পরিচ্ছদ প্রস্তুত।

খুলিয়া কালের দ্বার, আছে যার অধিকার
দেখ আসি চিত্র পরিচ্ছদ
উচ্চকাব্য অভিনয় যদি কারু প্রাণে লয়
বিকাশ হইবে তার চিত্ত কোকনদ।

If is hoped that the patronage kindly accorded to me on two previous occassions may not be withdrawn this time. আমার উৎসাহ দাতাগণ দুইবার (অর্থাৎ ন্যাশনাল ও স্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠাব সময) যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন, ভরসা করি এবারও সেইরূপ কবিবেন।

পরদিন রবিবার, ২৪ শে মাঘ, ১২৯৯ সাল, সন্ধ্যাব সময়—এই গিরিশচন্দ্র ঘোষ (অধীন) প্রণীত নতুন মিলনাত্মক নাটক 'মুকুল মঞ্জুষা'। প্রথম অভিনয রজনী। I have exerted my best as usual in making this new piece acceptable to an appreciative public not only by mounting and dressing it suitably, but by thoroughly rehearsing the company, so as to justify the hope of favourable reception.

সবিনয় নিবেদন যথাযোগ্য দৃশ্যপট ও পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়াছি। যথাসাধ্য সম্প্রদায়কে শিক্ষা দিয়াছি। ভরসা করি, দর্শকবৃন্দ নিজগুণে আমার এ নব উদ্যমে উৎসাহ প্রদান করিবেন। Sheer anxiety to appear before the public with new books by way of variety compels me to substitute Mukul Manjura for Macbeth on Sunday, not with standing the favourable reception of the latter.

G.C. Ghosh, Manager.

সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতিতে গিরিশচন্দ্র হ্যান্ডবিল ছাপিয়ে এবং তাতে তাঁর সৃষ্টির অভিপ্রায় উল্লেখ করে দর্শকদের চিত্তলোকে চমকারিত্ব অনুভব করার মধ্য দিয়ে আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। 'ম্যাকবেথ' এর নাটক দেখার গুরুত্ব ও রস-আস্বাদনের সাথে সাথে সম্পূর্ণ দেশীয় প্রেমের কাহিনীর মাধ্যমে দর্শকদের *মিনার্ভায়* আনার জন্য সচেষ্ট হলেন।

'মুকুল মুঞ্জরী' আদিরসাত্মক কাব্য—তাতে প্রকৃত প্রেম ও প্রেমিকার তথা সত্যিকার প্রেমিক-প্রেমিকার স্বরূপ কি গিরিশচন্দ্র অত্যন্ত গভীর রস-সঞ্চারে জানিয়ে দিয়েছেন।

প্রেমের অতুলনীয় শক্তি—যার প্রভাবে জড় প্রাণ পায়—সৃষ্টি চঞ্চল হয়ে ওঠে। ঘটনার বৈচিত্র্য-ভাষা-ভাব সর্বোপরি সৌন্দর্য্যের বিস্তারের মধ্য দিয়ে নাটকীয় সংঘাত জনিত চরিত্রের উত্তরণের দিকটি গিরিশচন্দ্র দেশীয় ভাবনায় চিত্রিত করেছেন বিভিন্ন নট-নটীদের অভিনয়ে। এক কথায় 'ম্যাকবেথ' এর পর 'মুকুল মঞ্জরী' দর্শকদের আকর্ষণ গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার প্রতি জোরালো সমর্থন লাভ করেছিল।

তিনমাস পর গিরিশচন্দ্র *'আবুহোসেন'* আরব্য উপন্যাসের গল্পকে নিয়ে গীতিনাট্য রচনা করে মিনার্ভায় অভিনীত করান (১৩ই চৈত্র ১২৯৯)। এই নাটকে আবুহোসেনের নাম ভূমিকায় সদ্য ফিরে আসা অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তাফীর অভিনয় দর্শকদের চিত্তকে মন্থন করে আনন্দবারি সিঞ্চন করেছিল। প্রত্যেকটি অভিনেতা-অভিনেত্রী গভীর দরদ ও ঐকান্তিক মানসিক-শ্রমে নাটকটির কৌতুকাবহ আবহাওয়াকে সুন্দরভাবে প্রবাহিত করেছিলেন। এই নাটকের গানগুলি সেসময় প্রায় প্রতিটি দর্শক তথা পাড়ায় মহল্লায় যুবক-যুবতীদের প্রাণ-চঞ্চল-আনন্দ বেগকে উস্‌কে দিতে অনুপ্রাণিত করেছিল।

আবুহোসেন

জুটলো অলি ফুটলো কত ফুল
দোলে হায় ধীর পবনে সৌরভ আকুল।
ঝর ঝর ঝরছে শিশির যেন সোনায় গাঁথা মালা মতির।
পাখীর তানে প্রাণে হানে তীর
আকাশে ঊষা হাসে, জলে কমলকুল।।

একে লো তোর এই ভরা যৌবন
রসে করেছে অবশ, আবেশে চলে নয়ন।।
ঘোর বিরহ বিকার তাতে, জোর করেছে নারীর ধাতে,
বাই কুপিতে সরল মন মাতে
ভরা হৃদি, গুরু ঊরু—বিষম কুলক্ষণ!

তাছাড়া **'রাম রহিম না জুদা করো, দিল কি সাঁচ্চা রাখো জী'**
গানটি সর্বস্তরের জাত ধর্মনির্বিশেষে খুবই জনপ্রিয় ছিল। অতি সাধারণ স্তরের মানুষের মধ্যে রঙ্গরসের প্রাথমিক সম্ভাষণে এই গানটির প্রচলন তখন গভীরভাবে সর্বত্র অনুসারিত হোত। পাগলা গারদে সাহিত্যিক-বৈজ্ঞানিক-ইতিহাসবিদ সহ সমাজের বরণীয়দের জীবন ও কথাবার্তায় যে রঙ্গরস বিচ্ছুরিত হয়েছে তা গিরিশ প্রতিভার অনবদ্য ব্যতিক্রম।

সপ্তমীতে বিসর্জন

১৩০০ সালের পূজোর সময় (২২ শে আশ্বিন) গিরিশচন্দ্রের *'সপ্তমীতে বির্সজন'* নাটকটি মিনার্ভায় অভিনীত হয়। বাঙালির

জাতীয় উৎসব দুর্গাপুজোর সময় বাঙালির মননে আনন্দের মোড়কে কৌতুক রসের জোগান দেবার অভিপ্রায়ে নাটকটি রচিত হয়েছিল।

তিন মাস পর সেই বৎসরই (১৩০০ - ৯ই পৌষ) বিখ্যাত পৌরাণিক নাটক 'মিনার্ভায় অভিনীত হয় *'জনা'*। *'মিনার্ভায়'* জনসন্তোষ তথা খ্যাতি 'জনা' নাটকের মধ্য দিয়ে গিরিশচন্দ্র বাঙলা নাট্যজগতে ও অভিনয় জগতে যে ধারাটি সঞ্চারিত করেছেন তা দীর্ঘদিন বজায় ছিল।

মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের কাহিনীকে অবলম্বন করে গিরিশচন্দ্র নাটকটি রচনা করেন। অভিনেত্রী **তিনকড়ি দাসী 'জনা'র ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন—আর 'প্রবীরে'র ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রের পুত্র সুরেনবাবু (দানিবাবু) এবং বিদুষক**

জনা

করেছিলেন অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তাফী। 'জনা' নাটকের গান অনবদ্য। সেকালের বহু সমালোচক গানগুলির বিষয়ে সুখ্যাতি করে আলোচনা প্রকাশ করেছিলেন বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়।

'জনা'র মাতৃত্ব ও বিদুষকের ভক্তি দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল। অর্দ্ধেন্দু শেখর 'বিদুষক' চরিত্র অভিনয়ে যে প্রতিভা দেখিয়েছেন তা অনবদ্য। কিন্তু মিনার্ভায় অভিনীত 'জনা' নাটকে তিনি কয়েকরাত্রি অভিনয় করার পর 'মিনার্ভা থিয়েটার' ত্যাগ করলেন। এই 'মিনার্ভা থিয়েটারে'র সুখ্যাতি ও যশ; ও নাটকের বিপুল সাড়া জেগেছিল গিরিশচন্দ্রের সাথে যখন অর্দ্ধেন্দুবাবু যুক্ত হলেন। উচ্চাভিলাষী অর্দ্ধেন্দুবাবু নিজে থিয়েটার চালাবার মানসিকতায় **মিনার্ভা থিয়েটার ছেড়ে গেলেন। গিরিশচন্দ্র বিষন্ন হলেন, বেদনাবিদ্ধ হলেন—কিন্তু অবসিত হলেন না। ঠাকুরের কথা স্মরণ করে তাঁর শরণ নিলেন এবং 'জনা' নাটকে নিজেই বিদুষকের চরিত্রে অভিনয় করলেন। সম্পূর্ণ নতুন আংগিকে বিদুষকের চরিত্রকে** (অর্দ্ধেন্দু শেখরের বিদুষক চরিত্রের যে খ্যাতি হয়েছিল তাকে পরিবর্তন করিয়ে) *রূপ দান করে 'জনা'* **নাটকের ভাবনা চিন্তায় 'বিদুষকের গুরুত্বকে প্রসারিত করলেন**। হাসির মধ্য দিয়ে ভক্তিবোধের গুরুত্বকে আদরনীয় করে দর্শকদের পুলকিত ও আপ্লুত করলেন। 'জনা'র সফলতা বিদ্যুৎপ্রবাহের আলোকমালায় বাঙলা নাটকের অন্তর্নিহিত শক্তি ও রসকে সর্বজন নন্দিত করেছিল। **গিরিশচন্দ্রের 'বিদুষক' চরিত্রের অভিনয় দর্শকদের শুধু মুগ্ধ করে নি—প্রতিদিনের জীবন অনুভবের ভাল-মন্দ ঠিক বেঠিক বোধের সল্‌তে উস্‌কে দিয়েছে যার ফলে চিন্তার ও ভাবের মেলবন্ধনকে দৃঢ় করতে সাহায্য করেছে।**

'জনা' নাটকের সাফল্যের জোয়ারে সেই বৎসরই বড়দিনের উপহার দেবার জন্য গিরিশচন্দ্র *'বড়দিনের বখসিস'* রচনা করলেন এবং 'মিনার্ভায়' ১০ই পৌষ তারিখে অভিনীত করান।

পরের বৎসর (২রা অগ্রহায়ণ ১৩০৯) গিরিশচন্দ্র রচিত *'স্বপ্নের ফল'* গীতিনাট্যটি 'মিনার্ভায়' অভিনীত হয়। নাটকের *'অধীর'* ও *'মনহরা' চরিত্রদুটিতে যথাক্রমে সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ* (দানিবাবু) এবং **তিনকড়ি দাসীর** অভিনয় খুবই স্পর্শকাতর আবেদনে সঞ্জীবিত। **দৈহিক আকর্ষণের ভূমিকায় যে প্রেম সচরাচর সমাজ জীবনের ব্যক্তিজীবনের চর্চায় ও ব্যবহারে প্রতিদিন পরিচিত, এই নাটকে দেহগত প্রেমকে তুচ্ছ অবাঞ্ছিত করে ত্যাগ ও নিঃস্বার্থ বোধে প্রেমের আকুতিকে প্রাণময় করে তুলেছে। 'স্বপ্নের ফুল' প্রেমের আত্মত্যাগ ও নির্মোহ চেতনার কথাই বলেছে।** সংসারের কোন সম্পর্কের দেনা পাওনায় প্রেম নেই এই নাটকে।

'ধীর' - 'অধীর', 'যুথী' ও 'বেলা', 'মনহরা' ও 'মনহরী' চরিত্রগুলিতে গিরিশচন্দ্র সংসার জীবনের মানুষী প্রকৃতির ভাবনাকে অতিক্রম করে নির্মোহ-ত্যাগ-সত্যে উত্তরণ করার চিন্তা করেছেন।

....আমরা স্বপ্নের মানুষ, স্বপ্নে কথা কই, স্বপ্নে দেখা দেই, ঘুম ভাঙ্গলেই চলে যাই....

নারী-আকাঙ্ক্ষা—নারী-বিতৃষ্ণা; অনুরাগ আর বিরাগ এইভাবেই গিরিশচন্দ্র জীবন আদর্শে প্রেমকে জাগাতে চেয়েছেন। **প্রেমের অপর নাম জীবন-মুক্তি।**

....দেখলি, কেমন মোহের কাঁটা, প্রেমের কাঁটা দিয়ে উঠে গেল, এখন দুটোই ফেলে দে—

দুটো কাঁটা ফেলে দে দেখ্, সেই সেই সেইরে
দেখ্ খুঁজে পেতে আর কি পাবি, আমি ত নেইরে।

সমস্ত বন্ধনমুক্তির চাবিকাটি 'এই' নাটকে বলা হয়েছে।

পরের মাসেই (পৌষ) গিরিশচন্দ্র *'সভ্যতার পাণ্ডা'* নামে একটি রূপক নাটক রচনা করে 'মিনার্ভায়' অভিনীত করান। চলতি সামাজিক চরিত্রের বিভাজনে প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যবোধের প্রেরণাকে জাগিয়ে তুলতে শ্লেষের মাধ্যমে দর্শকদের কাছে পেশ করেছেন। মাদকতা-প্রবঞ্চনা-অনাচার-ব্যভিচার নারীর চোখে মুখে আছন্ন—

সভ্যতার পাণ্ডা

....আমি মধুমাখা কথা কয়ে আগে ভোলাই কামিনী
হৃদয়াসনে সযতনে পূজি অহংকার
সে যে প্রাণপতি আমার
আমার হৃদয় রতন, যতনের ধন, জোর করি তো তার,
আমি তার গরবে গরবিনী, আদরে আদরিনী।

সামগ্রিক পর্যালোচনায় সভ্যতার নামে প্রাচীন ভারতের হিন্দু-সভ্যতার উপর অশোভন মানসিকতাকে দূরে ফেলে দিতে গিরিশচন্দ্র উদ্যোগী হয়েছেন।

এরপর গিরিশচন্দ্র জ্ঞানাশ্রয়ী ভক্তির প্রচারে 'ভক্তমাল' গ্রন্থ থেকে কাহিনী সংগ্রহ *'করমেতিবাই'* রচনা করেন এবং মিনার্ভায় অভিনীত করান (১৩০২-জ্যৈষ্ঠ)। কিন্তু দর্শক বেশীদিন তা গ্রহণ করল না।

সেই বৎসরই *'ফণির মণি'* নামক রচিত নাটক অভিনীত হয়। দর্শদের দ্বারা নাটকটি প্রশংসিত হয়েছে।

সেই মাসেই (পৌষ) গিরিশচন্দ্র রচিত *'পাঁচকনে'* নাটকটি অভিনীত হয় 'মিনার্ভায়'। চলতি সভ্যতার প্রতি শ্লেষ প্রকাশ করে সত্য-ত্রেতা-দাপর ও কলিযুগ—এই চার যুগের মূলকথাটিকে চারটি গানের মধ্যদিয়ে দর্শকদের মনোরঞ্জন করা হয়েছিল।

গিরিশচন্দ্র এরপর আর নতুন কোন নাটক রচনা করেননি। কিছু দিনের মধ্যে 'মিনার্ভা'য় যোগদানকারী নট-নটীদের অনেকেই চলে গেছেন। তাই ঝুকি না নিয়ে পুরাতন নাটকগুলি অভিনয়ের জন্য তৎপর হন গিরিশচন্দ্র। তাতে 'মিনার্ভা'র নাগেন্দ্রভূষনবাবুর সহমতে *সধবার একাদশী—পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস—দক্ষযজ্ঞ—পলাশীর যুদ্ধ— প্রফুল্ল—মেঘনাথ বধ* প্রভৃতি *নাটকগুলির অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র নিজে যথাক্রমে 'নিমচাঁদ', 'কীচক', 'দক্ষ', 'ক্লাইভ', 'যোগেশ', 'রাম ও ইন্দ্রজিৎ' ভূমিকায় অভিনয় করে দর্শকসমাজকে আপ্লুত করেন এবং 'মিনার্ভার' খ্যাতি উচ্চশিখরে নিয়ে যান।*

'পান্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটকের অভিনয়ে প্রথমে 'কীচকের' ভূমিকায় অঘোর নাথ পাঠক অভিনয় করেছিলেন। নাটকে এই চরিত্রে কিছু 'অশ্লীলতার' প্রশ্নে রাজ্য সরকার কর্তৃক অভিনয় বন্ধ করে দেওয়া হয়। অনেক আলোচনা-যুক্তিতর্কের পর পুনরায় নাটকটি অভিনয়ের ছাড়পত্র পায় এবং গিরিশচন্দ্র তখন নিজে 'কীচকের' ভূমিকায় অভিনয় করেন।

***'প্রফুল্ল'* নাটকটি মিনার্ভায় অভিনয় হয়—পূর্বে 'স্টারে' এই নাটকের 'যোগেশে'র ভূমিকায় অমৃতলাল মিত্র অভিনয় করেছিলেন। 'মিনার্ভায়' যোগেশের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র নিজে অভিনয় করেছিলেন।**

> ....স্টারে 'প্রফুল্ল' অভিনীত হইবার ছয় বৎসর পরে মিনার্ভা থিয়েটারের প্রফুল্ল নাট্যাভিনয়ের আয়োজন হয়। প্রতিযোগিতায় 'স্টার' ও এই সময়ে 'প্রফুল্ল'র পুনরাভিনয় ঘোষণা করেন। 'স্টার থিয়েটার'এ বিজ্ঞাপনে গিরিশচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল—

'তোমার শিক্ষিত-বিদ্যা দেখাব তোমায়' মিনার্ভায় প্রথমে যোগেশের ভূমিকা দেওয়া হইয়াছিল সুবিখ্যাত অভিনেতা মহেন্দ্রলাল বসুকে। মহেন্দ্রবাবু যোগেশের ভূমিকায় রিহারস্যাল দিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র 'স্টার'এ অমৃতলাল মিত্রকে যোগেশের ভূমিকা শিক্ষাপ্রদান করেন। মিনার্ভায় সে ছবি বদলাইয়া দিয়া মহেন্দ্রবাবুকে নতুনরূপে শিখাইতে আরম্ভ করেন। পরে

সম্প্রদায়স্থ সকলের অনুরোধে গিরিশচন্দ্রকে বাধ্য হইয়া এই ভূমিকা লইতে হইয়াছিল। তিনি এই সময়ে বলিয়াছিলেন—'আমাকে আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগ করিতে হইবে। যোগেশের ভূমিকায় যাহা শিক্ষাইবার অমৃতকে তাহা শিখাইয়াছি। এখন কি নতুন ছবি দিব, তাহাই ভাবিতেছি। .....

'মিনার্ভায়' এবং 'স্টার'এ একই সাথে 'প্রফুল্ল' নাটক অভিনীত হচ্ছে—একদিকে যোগেশের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র স্বয়ং অপরদিকে 'স্টারে' যোগেশের ভূমিকায় অমৃতলাল মিত্র। বাঙলার নাট্যজগতে সে এক বিরাট উত্তেজনা—গুরু-শিষ্য যুদ্ধ। স্বাভাবিকভাবেই 'প্রফুল্ল' নাটকের জনপ্রিয়তা তথা প্রত্যেক চরিত্রের দুই মঞ্চে পৃথক পৃথকভাবে অভিনয়ের আলোচনা মুখর হয়ে উঠল।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সমালোচনায় বলেছেন,

> ....পুরাতনকে কেমন করে সম্পূর্ণ নতুন ধাচে গড়িতে হয়, গিরিশচন্দ্র যোগেশের ভুমিকাভিনয়ে তা দেখিয়েছেন। যে অতুলনীয় নতুন ছবি তিনে দর্শক সাধারণের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন—দর্শকগণ সে দৃশ্য দর্শনে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়েছেন। সুরাপানে সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কিরূপে স্তরে স্তরে অধঃপতিত হয়ে দুর্দশায় গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত হয়—আদর্শ চরিত্র-লোকমান্য ব্যক্তি মদের মহিমায় কিরূপে স্ত্রীকে পথের ভিখারিনী করে তার শেষ সম্বল ভাঙ্গা বাক্সটি পর্যন্ত্য কেড়ে নিয়ে যায়—শিশুপুত্রের হাত মুচড়াইয়ে তার খাবারের পয়সা ছিনাইয়া নিয়ে যায়—এক ছটাক মদ পাবার জন্য লোভে শ্মশানে এসে ঘুরে বেড়ায়—একটি পয়সার জন্য হাত পেতে পথিকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছোটে, চক্ষের সম্মুখে এই ভীষণ ও জীবন্ত ছবি দেখে দর্শক শিহরিয়া উঠিল! বুঝল—এই সুরাপানে দেশের কি সর্বনাশ হইতেছে—কত বড় ঘর উৎসন্ন যাচ্ছে—কত লোকের কত **সাজান বাগান শুকিয়ে যাচ্ছে!'......**

।। সাঁইত্রিশ ।।

'মিনার্ভা' থিয়েটারের সুচনাকাল থেকেই গিরিশচন্দ্র রচিত অনেকগুলি নাটক যোগ্য নট-নটীদের দ্বারা অভিনয়ে মঞ্চস্থ হয়েছে। অর্থাগমও হয়েছে অনেক— বিশেষ করে পুরাতন নাটকগুলি, যেগুলি গিরিশচন্দ্র বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করে নাট্য-দর্শকদের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছিলেন, পুনরায় অভিনীত হবার ব্যাপারে অভাবনীয় অর্থের জোগানে স্বত্ত্বাধিকারী নাগেন্দ্রভূষণবাবু খুশী ছিলেন। কিন্তু মিনার্ভা থিয়েটারে কয়েকটি নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যয় (বিশেষ করে ম্যাকবেথের দৃশ্যসজ্জাসহ) অত্যাধিক হওয়ায় তিনি বেশ ঋণগ্রস্থ হয়ে যান। তিনিই মিনার্ভার টিকিট সংক্রান্ত দায়িত্বে। গিরিশচন্দ্র নট-নটী

নিয়োগ বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত। আয় অনেক ব্যয় ও অনেক—। কিন্তু আয়ের অংক থেকে ঋণ (থিয়েটার তৈরীর সময় যে ঋণ করা হয়েছিল) পরিশোধ করা হোত না। নানা অছিলায় নাগেন্দ্রভূষণ অবশেষে নিজেকে থিয়েটারে যুক্ত রাখতে চাইলেন না এবং গোপনে তিনি থিয়েটারের অর্ধেক স্বত্ত্ব শ্রীপ্রমথনাথ দাসকে বিক্রয় করে দেন। পাওনাদাররা প্রায়শই তাগাদা দিতে এসে গিরিশচন্দ্রের (তার কথা অনুসারে থিয়েটারের যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করতো) কাছে আর্জি জানাতো। গিরিশচন্দ্র অর্থ লেনদেনে একান্তই নির্লোভ, অনেকটা উদাসীন। তিনি পাওনাদার যুবকদের বেদনাসহ্য করতে না পেরে নিরুপায় হয়ে ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগ নিলেও নাগেন্দ্রভূষণ তা সমর্থন করলেন না। ফলে গিরিশচন্দ্র 'মিনার্ভা থিয়েটার' থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন এবং থিয়েটারের যাবতীয় কাজ পরিত্যাগ করলেন। এ ধরণের দুঃখজনক পরিস্থিতিতে অন্যরা, বিশেষ করে গিরিশচন্দ্র নট-নটীদের সম্মিলিত করে যে টিম তৈরী করেছিলেন, তারা সবাই 'মিনার্ভা থিয়েটার ত্যাগ করলেন।

গিরিশচন্দ্র 'মিনার্ভা থিয়েটার' ত্যাগ করেছেন—এ খবর প্রচারিত হবার সাথে সাথে কালবিলম্ব না করে 'স্টার থিয়েটারের' মালিকগণ গিরিশচন্দ্রের সাথে তাঁর বাড়ীতে দেখা করেন এবং অত্যন্ত আন্তরিক ভক্তি সহকারে তাঁরই তৈরী 'স্টার থিয়েটারের' নাট্যাচার্যরূপে তাঁকে বরণ করে 'স্টার থিয়েটারে' নিয়ে যান। গিরিশচন্দ্রও আনন্দিত— প্রচারিত সংবাদে বাঙলার দর্শককুলেও স্বস্তি এল।

গিরিশচন্দ্র 'স্টার থিয়েটারে' নাটকের পরিচালকরূপে পদ গ্রহণ করলেন— ম্যানেজার হবার আবেদন নাকচ করে। 'স্টার থিয়েটারে' নবপর্যায়ে গিরিশচন্দ্র রচনা করলেন *'কালাপাহাড়'*—এবং তা অভিনীত হল ১৩০৩/১১ই আশ্বিন মাসে। এই নাটকে 'কালাপাহাড়' চরিত্রে অমৃতলাল মিত্র এবং চিন্তামণি' চরিত্রে গিরিশচন্দ্র নিজে।

কালোপাহাড়

গিরিশচন্দ্র তাঁর ব্যক্তিগত জীবন-ধারার অনুষঙ্গকে এই নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দান করার চেষ্টা করেছেন। 'কালাপাহাড়'—বাঙলার নবাব সলিমানের সেনাপতি। পদমোহে কালাপাহাড় শক্তির দম্ভে উড়িষ্যাপতি মুকুন্দদেবকে পরাজিত করে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের বিগ্রহটিকে পুড়িয়ে দেয় এবং উল্লাস প্রকাশ করে। এই ধরণের মানসিকতার মধ্যে কালাপাহাড়ের জীবন দ্রুত একের পর এক নাস্তিক্যবোধের অত্যাচার তীব্র থেকে তীব্র হয়ে বাঁধাহীন গতিতে চলছিল। গিরিশচন্দ্রের যৌবনের মানসিক অবস্থায় সেরূপ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যৌবনে গিরিশচন্দ্র দেব-দেবী বিশেষ করে মানুষই ভগবান হতে পারে এ ধরণের বিশ্বাস মোটেই তার মধ্যে ছিল না। পরবর্তী সময়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণের সাথে যোগাযোগ এবং নবজীবন লাভ—এই নাটকের ধারাটিকে সুসংহত করেছে। 'চিন্তামণি' চরিত্রের মূল গঠনই গিরিশচন্দ্র তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের

প্রতিচ্ছবি দিয়েছেন। হৃদয়দ্বন্দ্ব এবং পরবর্তী সময়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণের আশীর্বাদ। হিংসা নয়, ক্রোধ নয়, প্রেম ভক্তিই অন্তর সত্যের প্রেরণা ও শক্তি এ কথাটিই 'কালাপাহাড়' নাটকের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বলতে চেয়েছেন গিরিশচন্দ্র। পরোক্ষভাবে ঠাকুরের প্রভাবে কিভাবে নাস্তিক গিরিশচন্দ্রের উত্তরণ হয়েছে, সংসার যন্ত্রনা থেকে উদার আনন্দে নতুন জন্ম লাভ করেছেন—তারই নাটকীয় রসে বর্ণনা করে অভিনয়ের মাধ্যমে জীবন্ত ও অনুসরণীয় প্রেরণা দান করেছেন। এই 'নাটকের শেষ অধ্যায়ে একটি গান—

'প্রেম-রসে আজ হৃদয় রসেছে
দেখ্‌রে দেখ্ হৃদয়-নিধি
সিংহাসনে বসেছে।।
রূপের ছটা দেখবে ভুবনময়
ঝলকে পুলক উথলে বয়,
জয় জয় জয়, জগন্নাথের জয়—
মনোমোহন চাঁদবদন হেরে
ভবের বাঁধন খসেছে।।

'কালাপাহাড়' জগন্নাথদেবের মূর্তি দগ্ধ করেছিলেন উন্মাদ শক্তির অহংকারে। সেই 'কালাপাহাড়' প্রেমের উত্তরণ শক্তির শান্ত সৃষ্টিসত্তায় জগন্নাথের'জয়গান করলেন। একদিন যে শক্তিকে 'কালাপাহাড়' তছ্‌নছ্ করেছে—পরবর্তী সময়ে সেই 'কালাপাহাড়' বলছে,

....শক্তি, তুমি প্রত্যক্ষ ভূবনে
বিরাজিত, বিদ্যমান অন্তরে অন্তরে
নেহারি তোমারে, আজীবন করিয়াছি
তব উপাসনা, এ সঙ্কটে প্রবঞ্চনা।
করো না করো না। দেহ বল, এ শৃঙ্খল
হোক্ দূর! করি চূর কঠিন পিঞ্জর!
জড় বা চেতন অন্বেষণ প্রয়োজন
নাহি, হও যেবা তুমি, 'ব্যাপিত আকাশ
ভূমি, কিবা পুরুষ প্রকৃতি, নিরাকার
অথবা সাকার আকর্ষণ করি ব্রহ্মতেজে,
ত্বরা দেহ তেজ, তেজের আকর।

ঠাকুর পরমহংসদেবের গুরুভাব যাহা গিরিশচন্দ্রের মধ্যে কার্যকর হ'ল নাটকে। দুটি চরিত্র—চঞ্চলা ও ইমান—অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাবনায় স্বতঃ উৎসারিত বাস্তব জীবনের ক্লেশ থেকে উত্তরণের এক একটি সিঁড়ি গেঁথে দিয়ে গিরিশচন্দ্র 'কালাপাহাড়'

নাটকটিকে প্রেম ও ঈর্ষার সংঘর্ষে প্রেমেরই জয়গান করেছেন। 'চঞ্চলা' কোমলা, কিন্তু হিংসার রসে ভীষনা - 'ইমান' শান্ত - কিন্তু সমন্বয় ভাবনায় আনন্দিত। স্বার্থের উর্ধে উঠে নির্মোহ প্রেমের প্রকাশকে নাট্যকার গুরুত্ব দিয়েছেন। 'বীরেশ্বর' চরিত্রটি সমস্ত নাটকে গিরিশচন্দ্র তার ব্যক্তিগত সত্তার পরিচয় দান করেছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের সর্ব ধর্ম সমন্বয় ভাবনার বাস্তব চিত্র এই নাটকে প্রতিফলিত।

পরের বৎসর (১৩০৪) মহারানী ভিক্টোরিয়ার ষাট বৎসর রাজত্বকালের পূর্তি উপলক্ষ্যে গিরিশচন্দ্র *'হীরক জুবিলী'* নামে নাটক রচনা করে স্টারে অভিনয় করান। তাতে নানা রঙ্গ-ব্যঙ্গ এবং রসতরঙ্গ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তৎকালের সমাজের ও দেশের চিত্র এঁকেঁছেন।

সে বৎসরই *'পারস্যপ্রসূন'* রচিত ও অভিনীত হয়। এই নাটকে 'নায়ক নুরুদ্দিনের উদারতা, নায়িকা পারিসানার পতিপ্রাণতা, হারুণ-উল-রসিদের মহানুভবতা, এলমোইনের স্বার্থপরতা, সেনজারার সহৃদয়তা, ইব্রাহিমের ধর্মের ভণ্ডামি'' সব মিলিয়ে দর্শকদের তৃপ্তি দান করেছিল।

গিরিশচন্দ্র মানুষের ভেতরকার রত্ন যা পাঁকে আবৃত তা উদ্ধার করে সাধারণ মানুষকে উপহার দিতে সচেষ্ট—যার মাধ্যমে মানুষ—দেশের মানুষ নিজের ছবি দেখতে পায়। আত্মসমর্থনের জন্য নাটকের ঘাত প্রতিঘাতে জীবনকে সার্থক করে তোলার প্রেরণা ও পথ পায়।

নবাগতা নরীসুন্দরীর 'পারিসানার' অভিনয় দর্শকদের হৃদয় জয় করেছে গভীরভাবে। এই নাটকের ঘাত প্রতিঘাতে সৃষ্ট ভাব তরঙ্গে সঙ্গীত খুবই কার্যকর হয়েছে।

পরের বৎসর (১৩০৪) নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের *'মায়াবসান'* সামাজিক নাটক অভিনীত হয় 'স্টার থিয়েটার'-এ। **গিরিশ নিজে কালীকিঙ্কর বসুর চরিত্রে অভিনয় করেন।**

এই নাটকে গুরুভাই স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শকেপ্রছন্নভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

....মেদিনী মিশিল তরল সলিলে
তপন শুষিল বারি।
তপন নিভিল, অনিল বহিল
বিপুল ব্যোমচারী।।
নীরব রব শূন্য শরীরে
শূন্যে শূন্যে মিশিল ধীরে
নিবিড় তিমিরে চেতন ঝলসে
মায়া কায়াহারী।।

জ্ঞান ও চৈতন্য প্রভাবে অজ্ঞানতার শেষ। 'মায়াবসান' নাটকে কালীকৃষ্ণ বসু চরিত্রটি কঠোর সত্যানুরাগী-জ্ঞান পিপাসু-পরদুঃখকাতর। কিন্তু জীবনচর্চায় বস্তু বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ তন্ময় মানুষ। সংসার জীবনে নানা পরিস্থিতির সূত্রে হিংসা-প্রতিশোধস্পৃহা অনিবার্যভাবে কখনও এসে যায়। কিন্তু তাই একমাত্র সত্য নয়—একথা গিরিশচন্দ্র তার নাটকে—বস্তু যে কোনভাবেই মানুষের অন্তরসত্যের আনন্দ সত্যকে প্রতিষ্ঠা দিতে পারে না—তার কথাই বলেছেন। মায়া—মায়া—তার অবসান চাই জ্ঞান-ভক্তি আদর্শে। বিজ্ঞান আলোচনায় নায়ক কালীকিঙ্কর বুঝতে পেরেছেন....

> ....নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় মন! শুনেছি সেই আনন্দের অবস্থা! কিন্তু এ কি সম্ভব? কখন না কল্পনামাত্র। প্রলোভন বাক্য। সুখদুঃখ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী, বায়ু সংঘর্ষণে ঘূর্ণবায়ু উপস্থিত হয়। দীপ নির্বান সম্ভব। নিষ্কম্প দীপ অসম্ভব—স্বভাবে অসম্ভব। ঐ যে দীপ কম্পিত হচ্ছে, প্রবল বায়ুতে নির্বান হবে, বায়ুহীন হলে ও নির্বান হবে। এ দীপ নির্বানি হবে, মৃত্যুতে কি জ্ঞানদীপ নির্বান হবে? অসম্ভব। জড়েরই পরিবর্তন—জড়েরই ধ্বংস। চৈতন্যের বিনাশ! কল্পনা করা যায় না। বিপদ, ঘোর বিপদ অনন্ত বিপদ! এ কি? এ কি আভাস? আত্মত্যাগ! সে কি? সে কি? নতুন কথা, নতুন কথা! আপনার জন্যই সব, আপনার জন্যই যন্ত্রণা। আত্মত্যাগ সম্ভব-সম্ভব-সম্ভব!"

এই নাটকে 'রঙ্গিনী' (নরীসন্দরী) কালীকিঙ্করের সযত্ন শিষ্যা। গুরুবাক্যে উদ্বুদ্ধ এই নারী বিশ্বাস ও সত্যানুভাবনায় এক জাগ্রত শক্তি। যে শক্তির প্রভাবে অসুস্থ মৃতপ্রায় কালীকিঙ্কর মৃত্যুদ্বার থেকে অমৃতময় আলোময় জীবনে ফিরে এসেছিলেন।

সংসার জড়িত মমতাকে মন থেকে মুছে ফেলা খুবই কষ্টকর। দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতায় যে সত্য উপলব্ধি হয়েছে তা জানিয়ে না গেলে আরও বেদনা অন্তরজুড়ে থাকবে। তাই সযত্ন শিষ্যা রঙ্গিনীকে কাছে ডেকে কালীকিঙ্কর বললেন,

> ....তোমায় একটি কথা বলতে এসেছি, এই আমার শেষ কথা। তুমি কথাটি বুঝলে আমার বন্ধন কাটে। শুনেছিলে কি? আত্মত্যাগ! মনে করেছিলাম, একটা কথার কথা চলে আসছে, তা নয়, সত্যই আত্মত্যাগ আছে। মরণে আত্মত্যাগ হবে না, আত্মা সঙ্গে যাবে; এইখানে আপনাকে বিলিয়ে দিলে তবে আত্মত্যাগ হবে।....
>
> রঙ্গিনী বলিল, ছোটবাবু, কি বলছ? আমি তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না।
>
> .... তোমায় এতদিন উপদেশ দিয়েছি—পরের উপকার কর, আমি এ পরহিতে জীবন উৎসর্গ করেছিলেম। কিন্তু শান্তি পাইনে কেন জান? সুখে বলতেম, নিষ্কাম কর্ম—নিষ্কাম ধর্ম; কিন্তু অভিমান ফল-কামনা ছাড়ে না। সুখ আশায়

পরিহিত করেছি, ধর্ম উপার্জন করতে পরহিত করেছি, আত্মোন্নতির জন্য পরহিত করেছি, ফল-কামনায় পরহিত করেছি। আজ গঙ্গাজলে ফল বিসর্জন দিয়ে পরকার্যে রইলেম। রইলেম কি—জগতে মিললেম।

রঙ্গিনী....আমিও আভাস পাচ্ছি, আমিও মিলিয়ে যাচ্ছি

....বেশ! আমাদের অপূর্ব মিলনে আর বিচ্ছেদ হবে না।

রঙ্গিনী....সত্য অবিচ্ছন্ন মিলন! প্রতি পরমাণুতে মিলন, অনন্ত মিলন!

জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাতে অনন্তের প্রতি আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই চিরশান্তি—আর সেই শান্তির পথই আলোময়—বিচ্ছেদ-বেদনার কোন অসন্তোষ-কান্না সবই মিশে যায় চেতনার উজ্জ্বল বন্যায়।

গিরিশচন্দ্র এই নাটকে আপন সত্ত্বার নানা প্রশ্নকে গভীরভাবে কালীকিঙ্করের মর্মলোক থেকে প্রকাশ করেছেন। নাটকের এ দিকটায় গভীর জীবন প্রত্যয় দর্শকদের একটি অংশকে গভীরভাবে ভাবিয়েছে—তাই নাটক শেষ হবার পর উল্লাস যতটা হওয়া উচিত ছিল—তা না হয়ে গভীর গাম্ভীর্য সুখ আনন্দ রসে দর্শক মুগ্ধ।

।। আটত্রিশ ।।

'কালাপাহাড়' ও *'মায়াবসান'* নাটক দুটির অভিনয় সাফল্য গিরিশচন্দ্র জীবন-ভাবনার বিচিত্র তরঙ্গাঘাতে যে সত্যবোধের উপলব্ধিতে নিজেকে পরিশুদ্ধ ও বিশ্বস্ত করেছেন তারই প্রকাশ এ সময়ের নাটক রচনার প্রেরণা।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবন-আদর্শের প্রতি গভীর প্রত্যয়নিষ্ঠ মন বার বার জীবন-মন্থন জাত সৃষ্টির স্পন্দন নাটকের মধ্যদিয়ে দেশের দর্শক সমাজকে আপ্লুত করেছেন।

গিরিশচন্দ্র অনিবার্য ঘটনার প্রভাবে বাধ্য হয়ে 'স্টার থিয়েটার' ত্যাগ করলেন। গিরিশচন্দ্র মানুষের প্রতি বঞ্চনা তথা অশোভন মিথ্যাচার সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর তৈরী নট-নটীদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় এতটুকু কাহারো হস্তক্ষেপ তিনি বরদাস্ত করতে পারেন নি।

গিরিশচন্দ্র থিয়েটারের কাজে নেই—নাটক রচনায়ও তেমন আগ্রহ নেই। একটা শূন্য মানসিকতায় মাঝে মধ্যে গুরু ভাই সন্ন্যাসীদের আখড়ায় যান-ঠাকুর ও শ্রীশ্রী মায়ের কথা আলোচনা করেন। অত্যন্ত নিষ্ঠা ও উৎসাহে মা সারদার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন—কোন সমস্যা জাগলে তার সমাধানে এগিয়ে এসে সন্ন্যাসীভাইদের সাথে যুক্ত হন। বাগবাজারে তখন অন্যান্য পল্লীর মত ধনীদের বাড়ীতে **হাফ্ আকড়াই** সঙ্গীতের

প্রচলন ছিল। এই হাফ্ আক্ড়াইতে গান রচনা করার নৈপুণ্যে নামজাদা হবার প্রতিযোগিতা ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। গিরিশচন্দ্র পাড়ার বন্ধু-বান্ধবদের অনুরোধে কয়েকটি গান রচনা করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবে গানের মাধ্যমে গানের লড়াই—কবির লড়াইয়ের ধারায়। গিরিশচন্দ্র সেই সকল গানের লড়াইতে যোগদান করেছিলেন এবং তাতে খ্যাতিও লাভ করেছিলেন।

গিরিশচন্দ্র 'স্টার থিয়েটার' ছেড়ে দেবার পর (১৩০৪) কলকাতার দর্শকসমাজে বেশ অসন্তোষজনিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। সেসময় স্বামী বিবেকানন্দের আত্মীয় হাবুবাবুর অনুরোধে গিরিশচন্দ্র নিজে এবং তাঁর অনুগত নাটুকে দল অভিনয় করার জন্য রামপুর-বোয়ালিয়ার গিয়েছিলেন। রামপুর বোয়ালিয়ারে গিরিশচন্দ্র দলবল নিয়ে নবনির্মিত (ললিত মোহনবাবুর উদ্যোগে) 'মার্ভাল' থিয়েটারে 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের অভিনয়—দর্শকদের সমাগম হয়েছিল বিপুল। গ্রাম থেকে দর্শকরা এসেছিলেন।

সেসময় কলকাতায় 'প্লেগ' রোগের প্রকোপ। প্রায় প্রত্যেক পাড়ায় ও মহল্লায় প্লেগের প্রতিরোধে সংকীর্তন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। গিরিশচন্দ্র এমনি দর্জিপাড়ায় সংকীর্তন সম্প্রদায়ের জন্য সংকীর্তন রচনা করেছিলেন—পাড়ার ছেলেদের সাথে মিলিত হয়ে তিনি গান গাইতে গাইতে পাড়া পরিক্রমা করতেন। এমনি একটি গান:

কলিকাতা আনন্দধাম!
প্লেগ বন্ধু হয়ে এসেছে হে ছড়াছড়ি হরিনাম।
কাঁপিয়ে ভুবন গগনভেদী রোল,
হুহুঙ্কারে উথলে উঠে হরি হরি বোল,
মত্ত হয়ে নৃত্য সদা গর্জে শত খোল,—
ঝঙ্কারে করতালি ঝঞ্ঝাসম অবিরাম
মরণ তো হবে, এড়ায় কে কবে
চার যুগে কে মরে এমন নামের উৎসবে?
হরিবোল, বোল হরিবোল
হরি হরি—ধুলোট হয় ভবে,
ওরে, ভয় কি তবে গভীর রবে—
নাম গেয়ে আয় পূরাই কাম।।
যে নামে হয় রে মৃত্যুঞ্জয়,
তত্ত্ব জেনে মত্ত হয়ে গায় রে মৃত্যুঞ্জয়,
যে অভয় নামে - নাইরে যমের ভয়,
নামের সনে হৃদয়মাঝারে নাচে নব ঘনশ্যাম।।
প্লেগ,—থাকবি যদি থাক্

শমনদমন নামে শমন হয়েছে অবাক
হরিনাম প্রাণভরে শোন, এই কথাটি রাখ
নাম শুনে প্রাণ ত্যজবে যে জন কিন্‌বে হরি গুণধাম।।

গিরিশচন্দ্র পাড়ায় নানাবিধ সমাজ কাজে যুবকদের অনুপ্রাণিত করেন। অবসর পেলে কখনোও বা একান্তে বাড়ীর রাস্তার বারান্দায় বসে লোকজন দ্যাখেন। কখনো বা গুরুভাই সন্ন্যাসীদের কাছে যান নানা তত্ত্ব আলোচনায় জড়িয়ে আনন্দ লাভ করে বাড়ী ফিরে আসেন।

এমনি একদিন নাট্যানুরাগী অমরেন্দ্রনাথ দত্ত গিরিশচন্দ্রের বাড়ী এলেন এবং গিরিশচন্দ্রকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত *'ক্লাসিক থিয়েটারে'* যোগদান করার জন্য অনুরোধ জানান। অমরেন্দ্রনাথ দুরসম্পর্কে গিরিশচন্দ্রের ভাগ্নে। শৈশবে নাটক ও অভিনয় সম্পর্কে মাঝে মাঝে গিরিশচন্দ্রের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। মাঝ বয়সে 'রেলিব্রাদার্সে' কাজ করার সময় থেকেই নাটকের, বিশেষ করে থিয়েটার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন—ভাবতেন কিভাবে স্বপ্ন পূরণ হয়। গিরিশচন্দ্র তখন 'মিনার্ভা থিয়েটারে' যুক্ত। অমরেন্দ্রবাবু সেসময় সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) চুনীলাল দেব—এদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি নাটকের ক্লাব করেন এবং মিনার্ভায় 'পলাশীর যুদ্ধ' অভিনয় করেন। অমরেন্দ্রনাথ সেই নাটকে সিরাজের অভিনয় করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র সব জানতেন এবং অমরেন্দ্রনাথকে উৎসাহিত করতেন। মিনার্ভা থিয়েটার ও তাঁর প্রতিভাকে কাজে লাগাবার জন্য 'এমারেল্ড' থিয়েটার ভাড়া করে 'ক্লাসিক থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করেন। 'ক্লাসিক থিয়েটারে' গিরিশচন্দ্রকে সর্বোচ্চ পদ 'নাট্যাচার্য' রূপে প্রতিষ্ঠিত করে বিজ্ঞাপন করেন এবং পুরনো নাটক 'দক্ষযজ্ঞ'—'মেঘনাদ বধ'—'প্রফুল্ল' অভিনয় করা হয়। কোন নতুন নাটক সেসময় গিরিশচন্দ্র রচনা করেননি।

দেলদার

এই *'ক্লাসিক থিয়েটারে'* পরবর্তী সময়ে (১৩০৬) গিরিশচন্দ্রের *'দেলদার'* গীতিনাট্যটি অভিনীত হয়। নাটকটি 'রূপকাশ্রয়ী' মনোরঞ্জনকারী—নিষ্কাম নিঃস্বার্থ ভালবাসার শক্তিতে পাষাণে প্রাণ প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। গিরিশচন্দ্র তাই 'দেলদার' নাটকের কৈফিয়ৎ দিয়ে বলেছেন,

....দুনিয়ায় সবই দেখবার—ওর আর রকম-বেরকম নেই। মন্দ কিছু না দেখলেই মন্দ নেই, ভাল না দেখলেই ভাল নেই। আমি ভাল দেখি, মন্দ দেখিনে।.....

ভাল-মন্দ বাছ-বিচার না করে বাঁধনহীন বেগে নিজেকে প্রসারিত করার মধ্যে যে আনন্দ তা একান্তই স্বার্থহীন—নির্মোহ। কারণ জগৎটাই ভাল-মন্দ মেশানো। শুধু ভাল নয়, কেবল শুধুই মন্দ নয়।

চল্ চল্ দুনিয়া দেখে আসি আয়
শুনেছি সখের বাজার, সখ করে পায় যে যা চায়
বিকোয় সুধা আর গরল, কুটিল আর সরল
বিকোয় অনল শীতল জল
মনের গুণে বিকোয় সখের ফল
সুধা ফেলে গরল কেনে এমন সখ কে কোথায় পায়
কেন সখে জ্বলে হয়লো সারা সখ হলে ত নিবে যায়

প্রাণখোলা সহজ কথা গিরিশচন্দ্র 'দেলদার' নাটকের প্রস্তাবনায় নিজেই বলেছেন। নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়া, ভাল-মন্দ কোন বিচার বিশ্লেষণ না করে বিলিয়ে দেবার বাসনা। এবং তা কখনো সচেতনভাবে হিসেব করে হয় না। স্বাভাবিক মানসিক প্রবণতার প্রবলতায় বাঁধনহীন পথেই আপন ভাললাগা হয়ে ছড়িয়ে দেবার সহজ প্রবাহ।

এই গীতিনাট্যে গানগুলি গিরিশচন্দ্র তাঁর স্বাভাবিক মনন-জ্ঞাত আকাঙ্ক্ষায় পুষ্ট প্রতিভা রসে সঞ্জীবিত হয়ে দর্শকদের তৃপ্তি দানই শুধু করেনি, ব্যবহারিক জীবনচর্চায় কিভাবে চলার মধ্যে নিঃস্বার্থ আনন্দ উপভোগ আছে তার প্রতি নজর দেবার প্রয়াস। প্রাণের কথা, যা গিরিশচন্দ্র তার যৌবন থেকে বলার বলাবার জন্য সচেষ্ট—যার উৎস-শক্তিতে তাঁর নাটক রচনা—তার প্রকাশের শিল্পে অভিনয়—সব কিছু যেন একই সাথে 'দেলদার' নাটকে এসে গেছে—দর্শকদের খুশী করেছে।

এর পরবর্তী নাটক *'পাণ্ডব-গৌরব'* ক্লাসিক থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র অভিনীত করান (১৩০৬) **এবং নিজে 'কুঞ্চুকী' চরিত্রে অভিনয় করেন**। পৌরাণিক কাহিনীর উৎস মহাভারতের—বিপুল উৎসাহে নাটকের মর্যাদা বেড়ে গিয়েছিল—'ক্লাসিক থিয়েটার' গৌরব-গুরুত্বে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল।

মহাভারতের কাহিনীর বীরবত্তা-ভক্তি এই দুটি রসের জোগানে গিরিশচন্দ্র কুরু পাণ্ডবের মানসিক চিন্তার উত্থান ও পতনের হৃদয়ভেদী সংঘাতের সূত্রে চরিত্রের নাটকীয়তাকে পুষ্টিদান করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ—আর ভীষ্ম, ভীম, অর্জুন—প্রত্যেকটি চরিত্রের অন্তর নিংড়ানো ভাব ও ভাষায় এমনভাবে নাটকটিকে গতিদান করেছিল যা প্রাক্ গিরিশচন্দ্রের কোন নাটকে কোন চরিত্রে এমন স্বচ্ছ অপ্রতিরোধ্য সত্যকে পরিস্ফুট করা সম্ভব হয়নি।

পাণ্ডব গৌরব

গিরিশচন্দ্র নিজে 'কুঞ্চুকী' চরিত্র অভিনয় করে অপূর্ব সৃষ্টির মুন্সিয়ানাকে বাংলা নাট্য সাহিত্যে তথা নাট্য চরিত্রের অভিব্যক্তিত্বে নূতন রস-ভংগী তথা শব্দ-ক্ষেপনের বিশেষত্বকে ফুটিয়েছেন। বিশ্বাসী প্রভুভক্ত একটি ব্রাহ্মণ চরিত্র কুঞ্চুকী।

'ক্লাসিক থিয়েটারে' অভিনীত নাটকগুলির অভিনয় দক্ষতা দর্শকদের মন গভীরভাবে ভরিয়ে দিয়েছিল। বহু দর্শক স্থানাভাবে ফিরে যেতেন। চারিদিকে গিরিশচন্দ্র ও ক্লাসিক

থিয়েটার—আর 'পাণ্ডবগৌরবের' নাটকের সংলাপ পথে পথে দর্শকদের মুখে মুখে।

এমনি উজ্জ্বল পরিস্থিতিতে গিরিশচন্দ্রের সাথে 'ক্লাসিক থিয়েটার'—মালিক অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের অপ্রত্যাশিত বিরোধ আসে। গিরিশচন্দ্র খুবই বেদনাসিক্ত হলেন।

'মিনার্ভা থিয়েটারের' নব স্বত্ত্বাধিকারী নরেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় গিরিশচন্দ্রের কাছে এলেন 'মিনার্ভায়' যোগদান করার জন্য। অনেক কাকুতি মিনতি করার পর গিরিশচন্দ্র আন্তরিকভাবে নরেন্দ্রনাথবাবুর প্রতি সদয় হলেন। নরেন্দ্রবাবু নিজেও একজন নাট্যকার ও অভিনেতা। তাই গিরিশচন্দ্র নরেন্দ্রবাবুর আবদার উপেক্ষা করতে পারলেন না।

একথা জানাজানি হয়ে গেলে গিরিশচন্দ্রকে আটকাবার জন্য অমরবাবু গিরিশচন্দ্রের উপর injunction জারি করার ব্যবস্থা করেছিলেন কিন্তু কার্যতঃ তা সফল হয়নি।

গিরিশচন্দ্র মিনার্ভায় যোগদান করে বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' উপন্যাসটিকে নাটকাকারে রূপ দান করেন এবং মিনার্ভায় তা অভিনীত করান (১৩০৭)। **গিরিশচন্দ্র নিজে 'সীতারাম' এর ভূমিকায়।** গিরিশচন্দ্র সীতারাম উপন্যাসের নাট্যরূপে সীতারামের পতন কিভাবে হল—তার অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র যুগান্তকারী প্রতিভার পরিচয় দিলেন—

সীতারাম

> ....জীবনে কোনটা ঠিক? আমি সীতারাম, ভারতবিজয়ী যবন বিরুদ্ধে হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করব—সেইটে ঠিক? একাকী প্যারীলালের সাহায্যে যবনসৈন্য জয় করেছি— সেইটি ঠিক? হিন্দুর জন্য সর্বস্ব অর্পণ করে জীবনদানে প্রস্তুত ছিলাম—সেইটে ঠিক? কি রণরঙ্গিনী মুর্তি দেখে উন্মাদ হয়েছিলাম—সেইটে ঠিক? তারজন্য পতিপ্রাণা রমার মৃত্যুর কারণ হয়েছিলাম—সেইটে ঠিক? নন্দার বিষপানে মৃত্যু—সন্তানসন্ততির মুখে মিষ্টান্নের ন্যায় বিষপ্রদান—সেইটে ঠিক?—না কোনটা ঠিক? আমি কোন সীতারাম? প্রজাপালক— হিন্দুধর্ম, সংস্থাপক, আত্মত্যাগী—পরহিতব্রত সীতারাম—সেইটি ঠিক না কোনটা ঠিক? না কামুক সীতারাম—সেইটি ঠিক?
>
> ....দেহসুখ ও মর্মান্তিক দুঃখের কারণ—সত্যই কারণ— বোধ হয় বুঝেছি, না বুঝে থাকি— ভগবান! এ দুঃখের সময় বুঝিয়ে দাও।....

গিরিশচন্দ্র ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভাবনায় সীতারাম চরিত্রের প্রতিটি মুহূর্তকে অভিনয়ের বাক্ ক্ষেপনের ও শব্দের উচ্চারণে ভাবকে মথিত করে যেভাবে সীতারামের অন্তর-জ্বালার ছবি দর্শকদের দিয়েছেন—বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের পাঠে পাঠক ততটা পায় নি। প্রত্যেকটি চরিত্র সার্থকভাবে দর্শকদের সামনে জীবন্ত করে তোলার কলাকৌশলের

শিক্ষা গিরিশচন্দ্র অত্যন্ত গভীর আন্তরিকতায় দান করেছিলেন। ভাব ও মূল কাহিনীর ভারসাম্য রক্ষায় গিরিশচন্দ্র 'সীতারাম' নাটকে বঙ্কিমচন্দ্রের গান-স্তব পরিবর্তন করেছেন।

মিনার্ভায় (১৩০৭) গিরিশচন্দ্রের 'মণিহরণ' গীতিনাট্য অভিনীত হয়। শোনা যায়,

মণিহরণ

সীতারাম নাটকে সীতারাম অভিনয় করার ফাঁকে ফাঁকে ২৮টি গান মুখে মুখে 'বলে' গীতিনাট্য *'মণিহরণ'* রচনা করেন এবং পরবর্তী সময়ে অভিনয়ও করেন।

নন্দদুলাল

সেই বৎসরই গিরিশচন্দ্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিবস উপলক্ষে *'নন্দদুলাল'* গীতিনাট্যটি অভিনীত করান।

।। উনচল্লিস ।।

মিনার্ভায় গিরিশচন্দ্রের যোগদানের পর থেকে আর্থিক উন্নতি খুবই হয়েছিল—কিন্তু থিয়েটারের মালিক নরেন্দ্রবাবুর অভিপ্রায় ছিল গিরিশচন্দ্র যেমন নাটক রচনা করবেন—পরিচালনা করবেন তেমনি তাঁর রচিত প্রত্যেকটি নাটকে বিশেষ চরিত্রে অভিনয়ও করবেন। এই অভিপ্রায় নরেন্দ্রবাবু যথাবিহিতভাবে গিরিশচন্দ্রকে জানিয়েও কোন ফল না হওয়ায় তিনি আন্তরিকভাবে ক্ষুন্ন ও বিরক্ত হয়েছিলেন গিরিশচন্দ্রের প্রতি। গিরিশচন্দ্র বিষয়টিকে খুব একটা গুরুত্ব দেন নি। কিন্তু নরেন্দ্রবাবুর মানসিক অবস্থায় গিরিশচন্দ্রের প্রতি বিরূপতা গভীর করার ব্যাপারে থিয়েটারের এবং তার নিজস্ব কিছু বংশধরদের মন্ত্রনা অত্যন্ত কার্যকর হয়েছিল যার প্রভাবে নরেন্দ্রনাথ সরকার বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে মিনার্ভা থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের যোগদানের শর্ত তথা এগ্রিমেন্ট বাতিল করে দিলেন। গিরিশচন্দ্র তার প্রতিবাদ করেন নি—তিনি যথাবিহিতভাবে আপন মর্যাদার শোভনতায় 'মিনার্ভা থিয়েটার' ছেড়ে দিলেন।

এদিকে 'ক্লাসিক থিয়েটারে'র স্বত্ত্বাধিকারী অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় গিরিশচন্দ্রের প্রতি যে ব্যবহার করেছেন তাতে অনুতপ্ত হয়ে তিনি সরাসরি গিরিশচন্দ্র সমীপে উপস্থিত হলেন এবং অনুতপ্ত হৃদয়ে মার্জনা চাইলেন।

গিরিশচন্দ্র নাটুকে—নট— নাট্যকার—তথা অন্তর শক্তিতে একান্তভাবে প্রেমের ভালবাসার ভিখারী। অমরেন্দ্রবাবুর অবস্থা অনুধাবন করে কিছুমাত্র বিলম্ব না করে পুনরায় 'ক্লাসিক থিয়েটারে' যোগদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। অমরেন্দ্রবাবু ও আহ্লাদিত হয়ে গিরিশচন্দ্রের 'ক্লাসিক থিয়েটারে' যোগদানের খবরটি নাটকের আরম্ভে প্রচার —বিজ্ঞাপন—হ্যান্ডবিলে সারা কলকাতায় ছড়িয়ে দিলেন। বিজ্ঞাপনে বলা হল—

....গিরিশবাবুর সহিত বিবাদ করিয়া নিতান্তই ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়াছিলাম। বড় সুখের বিষয়, সমস্ত মনোমালিন্য অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিয়া, তাঁহার স্নেহময় কোলে আবার তিনি টানিয়া লইয়াছেন। গিরিশবাবুর কোনও থিয়েটারের সহিত এখন কোনও প্রকার সম্বন্ধ নাই। তাঁহার সমস্ত, নূতন নূতন নাটক, গীতিনাট্যও পঞ্চরং এখন ক্লাসিকে অভিনীত হইবে।

....*শ্রীযুক্ত 'গিরিশচন্দ্র এখন ক্লাসিকের।*

অমরেন্দ্রবাবুও গিরিশচন্দ্রের নিজস্ব তৈরী নট।

'ক্লাসিকে' যোগদানের কয়েকদিন পরেই গিরিশচন্দ্র একমাত্র কন্যার সুতিকারোগে আক্রান্ত হওয়ায় গভীরভাবে চিন্তিত হলেন। কন্যাকে বাঁচা‌নর জন্য গিরিশচন্দ্র কলকাতার বড় বড় চিকিৎসকদের এনেছিলেন। কিন্তু তাতে কোনরূপ সফল না হওয়ায় কন্যার কথামত গিরিশচন্দ্র তারকেশ্বরে বাবা তারকনাথের কাছে ছুটে গেলেন।

তারকেশ্বরে বাবা তারকনাথের আরাধনা করে মনে তৃপ্তি পেলেন না—ছুটে এলেন কলকাতায় কন্যার কাছে—কিন্তু কন্যাকে পেলেন না—তারকেশ্বরে থাকাকালিন প্রিয়তমা কন্যার প্রয়াণ হয়। শোকতপ্ত হৃদয়—ঘরের ভেতর নিঃসঙ্গ নির্বাক গিরিশচন্দ্র। মাঝে মধ্যে কন্যার কথা স্মরণ করতে করতে ঠাকুরকে আহ্বান করেন অন্তরের শোকানল শান্ত করার জন্য।

একদিন অন্তর-যন্ত্রনায় ঠাকুরের অভাবনীয় আশ্রয় লাভ করে শোক ভুলেছিলেন—অতিক্রম করে আবার নাটকের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। আজ সেইভাবেই 'ক্লাসিক থিয়েটারে' নতুন নাটক *'অশ্রুধারা'* রচনা করেন—অভিনয় করান। এই নাটকের মূল কথা মহারানী ভিক্টোরিয়ার প্রয়াণ শোকগাথা।

কিন্তু গিরিশচন্দ্রের মনের অবস্থা আপন আয়ত্বে তখনও পর্যন্ত আসেনি। জীবনে শোক অনেক পেয়েছেন—তা থেকে নিজেকে সামলে চললেও পরিনত বয়সে কন্যার প্রয়াণ তাঁকে যেন বেশ বেগ দিয়েছে। তাই নানাভাবে নিজেকে নাটক রচনায় ও পরিচালনায় যুক্ত রেখে অনেকটা স্থির হয়েছিলেন।

'মনের মতন' এই নামে নতুন নাটক রচনা করে ক্লাসিকে অভিনয় করান। নাটকটির ভেতরের কথা দর্শকদের গিরিশচন্দ্রের পূববর্তী কয়েকটি নাটকের স্মৃতিকে উস্‌কে দিয়েছিল। আদর্শবোধের গভীরতায় সংসার জীবনের পরিধিকে নতুন মাত্রা দিতে চেয়েছেন গিরিশচন্দ্র। প্রেমই জীবনের প্রকাশ—সৌন্দর্যকে গভীর ও আন্তরিক করে তোলে। কিন্তু অবিশ্বাস ও সন্দেহ প্রেমকে সরাসরি কাছে আসতে দেয় না। অথচ জগৎজুড়ে এই প্রেমের পথই শান্তির পথ এবং সেই পথেই সংশয় ও অবিশ্বাসকে জয় করা যায়।

'মনের মতন' নাটকে **'ফকির' একটি চরিত্র**। এই চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন অঘোরনাথ পাঠক। 'ফকির'-এর কণ্ঠে গিরিশচন্দ্র একটি গান যুক্ত করেছিলেন। গানের ভাষা পুরোটা বাংলা নয়—উর্দুও নয়—হিন্দিও নয়—একটা মেশালো শব্দ দিয়ে রঙ্গতামাসার রস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নাট্যকার আনন্দ বিনোদনের সার্থকতা লাভ করেছিলেন।

মনের মতন

স্বামী বিবেকানন্দ কোন একটি কাজে বাগবাজারের গিরিশ আলয়ে এসেছিলেন। সেসময় গিরিশচন্দ্রের 'মনের মতন' নাটকটির পাণ্ডুলিপি পড়েছিলেন—তিনি ফকিরের গানটি পাঠ করে বলেছিলেন।

> ....জে, সি তোমার ফকিরের গান দু'খানি চমৎকার হয়েছে, কিন্তু ভাষার মাথামুণ্ডু নেই, না বাংলা—না হিন্দি—না উর্দু—এ কি বল দেখি....

গিরিশচন্দ্র হাসতে হাসতে উত্তরে বললেন,

> ....খাঁটি হিন্দী বা খাঁটি উর্দু সাধারণ দর্শক বুঝতে পারে না। দুই চার জন তাহার মর্ম গ্রহণ করতে পারে।....

> ....হিন্দি কি উর্দু একটা ডৌল আর ধরণ দেখাতে পারলেই চরিত্র যে স্বতন্ত্র তাহাও দেখান হয়, আর দর্শক ও গানের মর্ম গ্রহণ করে।....

'ক্লাসিক থিয়েটারে'র দর্শকদের কথা চিন্তা করে গিরিশচন্দ্র *বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের* নাট্যরূপ দেবার কথা ভাবলেন। চার জন লেখককে নিজের বাড়ীতে ডেকে এনে একদিনেই সমগ্র উপন্যাসের নাট্যরূপ করলেন এবং ১৩০৮ সালেই 'ক্লাসিক থিয়েটারে' অভিনয় করান। দর্শকদের অভাবনীয় সাড়া গিরিশচন্দ্রকে এবং ক্লাসিক থিয়েটারের অমরেন্দ্রবাবুকেও খুবই উৎসাহিত করেছিল। **অমরেন্দ্রবাবু এই নাটকে নিজে নবকুমার চরিত্রে** গিরিশচন্দ্রের নির্দেশানুসারে নিখুঁত স্পর্শকাতর অভিনয় করেন। কপালকুণ্ডলার চরিত্রে কুসুমকুমারী এবং কাপালিক চরিত্রে অঘোরনাথ পাঠক খুবই সার্থক সৃষ্টি হয়েছিল। **গিরিশচন্দ্র এই নাটকে অধিকারী—চটীরক্ষক মাতাল—মুটে ও প্রতিবেশী এই ৫ টি চরিত্রে পরপর দৃশ্যের সংশ্লিষ্ট স্থানে একা অভিনয় করেছেন**—কিন্তু কোথাও দর্শক তা একই লোকের দ্বারা অভিনীত হতেছে তা বুঝতে পারেন নি।

কপালে কুণ্ডলা

'কপালকুণ্ডলা'র নাট্যরূপে দর্শকের আনন্দ ও হৃদয়গ্রাহী হওয়ায় গিরিশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের **'মৃণালিনী' উপন্যাসের নাট্যরূপ** যা বহুদিন আগে ন্যাশনালে অভিনীত করিয়েছিলেন—তাকেই সামান্য ঘসা মাজা করে ক্লাসিকে অভিনয় করান—১৩০৮ সালেই 'ক্লাসিক থিয়েটারে' **মৃণালিনী নাটকের দুরাত্রি পশুপতির ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র নিজে অভিনয় করে তা পরিত্যাগ করেন। তৃতীয় রাত্রি থেকে**

মৃণালিনী

পশুপতির ভূমিকায় পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঘোষকে (দানুবাবু) দিয়ে চরিত্রটির রূপ দান করান হয়। 'মৃণালিনী' দর্শক সমাজে সুন্দর স্বীকৃতি লাভ করেছিল। গিরিশচন্দ্র এই নাটকের জন্য কয়েকটি গানও রচনা করে দৃশ্যান্তরে চরিত্রের মধ্যে তার প্রভাব বিস্তারে যুক্ত করেন।

সেই বৎসরেই (১৩০৮) গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক কাহিনীর মাধ্যমে *'অভিশাপ'* নাটক

অভিশাপ

রচনা করে 'ক্লাসিক থিয়েটারে' অভিনয় করান। **এই নাটকে গানের সঙ্গে নাচ শিক্ষা দেবার ভূমিকায় কুসুমকুমারী দেবীর সংযোজন বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে প্রথম।** কাহিনীর সূত্রটি গিরিশচন্দ্র গ্রহণ করেছিলেন 'অদ্ভুত রামায়ণ' থেকে।

শান্তি

পরের বৎসর গিরিশচন্দ্র রূপক ভাবনায় বুয়র যুদ্ধের অবসানে সন্ধি স্থাপনকে কেন্দ্র করে *'শান্তি'* এই নামে একটি গীতিনাট্য পরিবেশন করেন 'ক্লাসিক থিয়েটারে'।

।। চল্লিশ ।।

গিরিশচন্দ্র সারাটা জীবন আপন অনুভূতির সাথে সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবন ও ভাবনার গভীর তাৎপর্য কি তা বুঝতে চেষ্টা করেছেন—এবং তার সমীকরণে ব্যক্তিগত আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রচ্ছদকে কাজে যুক্ত করেছেন। তার অনুধাবনে এসেছে বিচিত্র অভিজ্ঞতার রং এবং তাকেই নিজের জীবনে ও কর্মধারায় রাঙিয়ে এগিয়ে গেছেন। কিন্তু জীবনের সায়াহ্নে গিরিশচন্দ্র মানবমনের বিচিত্র ঘরে বিচরণ করেছেন অনুভূতির গভীরতায়—সেখানে ঠাকুর রামকৃষ্ণের নির্দেশিত পথকে বার বার আঁকড়ে এগিয়েছেন।

মানুষ সংসারে বিচিত্র কর্মধারায় যে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার আস্বাদন গ্রহণ করে তাকে একান্ত ভাবাটাই একটা 'ভ্রান্তি'। এই 'ভ্রান্তি' এককভাবে ব্যক্তিমানুষের ভাবনাকে আশ্রয় করে চলে। সেখানে প্রকৃত সত্য তেমন করে প্রকাশ পায় না—প্রকৃত সত্য সংসার জীবনের, বাস্তব জীবনের ঘটনার ফাঁকে ফাঁকে অদেখা অধরার হাতছানি—তারই অনুভবে বিচিত্র রসের জোগান, ছোট-বড় ভাবনায় প্রতিদিন তার প্রকাশে আমাদের জীবনকে মশগুল করে রাখে। তখন কল্পনার আশ্রয়ে ব্যক্তিগত মানসিকতায় পরিচয়ের তারতম্য ঘটায়।

ভ্রান্তি

এমনি ভাবনায় গিরিশচন্দ্র *'ভ্রান্তি'* নাটক রচনা করেন এবং 'ক্লাসিক থিয়েটারে' অভিনয় করান (১৩০৯)।

ভ্রান্তি' নাটকে গিরিশচন্দ্র নিজেই নাটকের কেন্দ্রবিন্দু চরিত্র 'রঙ্গলালের' ভূমিকায় অভিনয় করেন। আর অমরেন্দ্রনাথ দত্ত অভিনয় করেন নিরঞ্জনের চরিত্র।

বাংলার তৎকালের নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর বিরুদ্ধে বাংলার রাজশাহীর জমিদার রাজা উদয়নারায়ণের বিদ্রোহ—কাহিনী ইতিহাস হলেও গিরিশচন্দ্র আপন ভাবনার মাধুরী মিশিয়ে ইতিহাসের আঙ্গিনা থেকে অনেক দূরে—মানব জীবন ও চরিত্রের বিচিত্র তরঙ্গাঘাতে সৃষ্ট সংঘাতের মধ্যদিয়ে প্রকাশ করেছেন একটি সত্য—নিষ্কাম কর্ম। এই নিষ্কাম কর্ম মুখে মুখে প্রচারিত হলেও হৃদয় কন্দরে ফলের আকাঙ্ক্ষার রেশ থেকেই যায়।

'রঙ্গলাল' তার ব্যতিক্রম—কামনাশূন্য মানবপ্রেমিক। মানুষকেই অন্তর-সিংহাসনে বসিয়ে নিরলস সেবা করার প্রবণতা এবং উদ্যোগ রঙ্গলালের চরিত্রের মূল প্রবাহ। মঠ-মন্দিরের প্রতিষ্ঠিত দেব-দেবীর প্রতি খুব একটা আকর্ষণ না থাকলেও রঙ্গলাল বলেন,

> ....অমন পাথুরে মাকে মানি না মানি, তাতে বড় এসে যায় না। ....আমার দেবতা প্রত্যক্ষ। আমার দেবতা কথা কয়, আমার দেবতার প্রাণ আছে, আমার দেবতা অমন দৃষ্টিভোগ খায় না, সত্যি ভোগ খায়, আমার দেবতা পরম সুন্দর। ....সেই দেবতা মানুষ।

> ....আমার দেবতা প্রাণময় মানুষ, যার সেবা করলে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়। যার সেবা করে মনকে জিজ্ঞাসা করতে হয় না ভাল করেছি কি মন্দ করেছি। যে দেবতার পূজায় কোন শাস্ত্রে নিন্দা নাই, তর্ক বিতর্ক নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের উপদেশামৃতে গুরুভাই বিবেকানন্দের **ভগবান জ্ঞানে নারায়ণ অনুভবে মানুষের সেবা**—গিরিশচন্দ্র এই সত্য বোধ 'রঙ্গলালের' চরিত্রে তথা নিজে অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শক সমাজকে আকৃষ্ট করেছিলেন।

গিরিশচন্দ্র 'রঙ্গলালের' ভূমিকায় যে আদর্শবোধ মানব সত্যকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন 'ভ্রান্তি' নাটকে—তার সহকারীরূপে 'গঙ্গা' চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন কুসুমকুমারী দেবী। 'গঙ্গা' রঙ্গলালের কর্মসহযোগিনী—কিন্তু গণিকা। এই গণিকাও যে দীক্ষিতা হতে পারে এবং মানব সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে তার প্রতিফলন এই 'ভ্রান্তি' নাটকে গিরিশচন্দ্র দেখিয়েছেন।

'ভ্রান্তি' নাটকে উদয়নারায়ণের পরিত্যক্তা স্ত্রী অন্নদার জীবনে যে আলো—উজ্জ্বল দিব্যভাব গিরিশচন্দ্র এঁকেছেন তা অত্যন্ত আদর লাভ করেছিল দর্শকদের। দর্শক অন্নদার জন্য রোদন করেছেন, আবার তার উত্তরণে আনন্দও লাভ করেছেন।

'ভ্রান্তি' নাটকের বিষয়ে সমালোচনায় বলা হয়েছিল.....

....গিরিশবাবু, তুমি ধন্য! তুমি 'রঙ্গলাল' আঁকিয়াছ আর তুমি রঙ্গলাল সাজিয়া রঙ্গমঞ্চে আপন চিত্র দেখাইয়া বঙ্গনাট্য মঞ্চে রঙ্গ-রসের যে উৎস ছুটাইয়াছ পরোপকার মহাব্রতের যে ধ্যান কথা শুনাইয়াছ, তাহা অনেকদিন শুনি নাই, দেখি নাই......

বঙ্গবাসী ২১ভাদ্র ১৩০৯

সাহিত্য সেবী দীনেন্দ্র কুমার রায় বলেছেন—

....ভ্রান্তির প্রত্যেক কথা ভাবিতে হয়—ভাবিয়া দেখিতে পারিলে আমি যে সত্য সত্যই এতটুকু আমার যে স্পর্দ্ধার কিছুই নাই। আমার মধ্যে পুরুষকারের কিছুই নাই—তাহা বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়।

....আর রঙ্গলাল, গঙ্গা....এমন স্বার্থত্যাগ বাঙালি একবার চক্ষু খুলিয়া দেখিবে কি? এক দিকে স্বার্থ, হিংসা, দ্বেষ,—আর একদিকে স্বর্গের পবিত্রতা। দাঁড়াও রঙ্গলাল, এই অধঃপতিত বাঙালির সম্মুখে তোমার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করিলে বাঙালির শ্রী ফিরিবে। গঙ্গা বার বিলাসিনী—ফকির রঙ্গলাল কেমন ধীরে ধীরে তাহাকে পরহিতব্রতে দীক্ষিত করিল।

....ভ্রান্তি দেখিবার জিনিষ—দেখাইবার জিনিস

'ভ্রান্তি' নাটকে একটি গান দীর্ঘদিন পাড়ার বয়স্ক দর্শকদের এবং বুদ্ধিজীবিদের অন্তর বারবার দোলা দিত।

..নাই তো তেমন বনে কুসুম
মনে যেমন ফোটে ফুল।
মধুভরে থরে থরে আপনি কুসুম হয় আকুল।
সোহাগের চাঁদের কিরণ খেলে এ ফুলে
ফুলে ফুলে অজানা—তাল হাসি মুখ তুলে
মধু উছলে যবে, মাতে ফুল আপন সৌরভে
আলোক-লতার মালা গাঁথা—বিকিয়ে
গিয়ে চায় না মূল।।

সাকার ভাবনায় নিরাকারের ধ্যান—এ সম্পর্কে 'ভ্রান্তি' নাটকের গানটি খুবই আনন্দঘন উৎসাহের সৃষ্টি করেছিল—

আয়না

এর পরবর্তী নাটক *'আয়না'* সামাজিক ঘটনার আদলে একটি চিত্রণ—'ক্লাসিক থিয়েটারে' অভিনয় করিয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র।

'আয়না' নাটকের পরবর্তী নাটক *'সৎনাম'* অভিনীত হয় দু'বছর পর ১৩১১ সালে।

'সৎনাম' নাটকে গিরিশচন্দ্র অন্তরে বিশ্বাসের গুরুত্ব ও তার অভাবনীয় শক্তির কথা জানিয়েছেন। **ন্যায়-অন্যায়-পাপপূণ্য সব কিছুর মুলে বিশ্বাস থাকলেই উত্তরণ সম্ভব**। গিরিশচন্দ্র ঐতিহাসিক ঘটনার প্রবাহে আপন মানসিক চিন্তাকে রূপায়িত করতে চেয়েছেন প্রায় তাঁর রচিত প্রত্যেকটি নাটকে। তাই প্রয়োজনে চরিত্র সৃষ্টি করে নিজের কথাকে প্রসারিত করেছেন। 'সৎনাম' নাটকে 'গুলসানা' সৃষ্ট চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রেম ও প্রতিহিংসা—দুই বিপরীত প্রবাহে দ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন। **এই নাটকটিতে হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বকে এমনভাবে পেশ করেছেন তাতে গিরিশচন্দ্রকে গভীর প্রতিবাদের মুখে পরতে হয়েছিল**। অভিনয়কালে হিন্দু দর্শকদের দুঃখজনক বেদনার বহিঃপ্রকাশ বেশ ভাবিয়েছিল গিরিশচন্দ্রকে। 'সৎনাম' ক্লাসিকে তিন রাত্রি মাত্র অভিনয় হয়েছিল—তারপর এই নাটকের অভিনয় সেভাবে হয়নি।

সৎনাম

।। একচল্লিশ।।

নাটক রচনা ও তার অভিনয় ও অভিনয় শিক্ষা তথা সামগ্রিকভাবে নাটকের পরিচালনা সব কাজই গিরিশচন্দ্র অত্যন্ত আন্তরিকভাবে সুসম্পন্ন করতেন—। এ বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত ভাবনা ও চিন্তার প্রবাহ বঙ্গনাট্যমঞ্চ—বঙ্গনাটক ও তার অভিনয় কলা শিল্পে গভীরভাবে ছাপ রেখে গেছেন—যা অন্য কোন নাট্যকারের পক্ষে তখনও সম্ভব হয়নি।

নাট্যশাস্ত্রের খুঁটিনাটি অভিনয়ের বিবিধ আঙ্গিকের প্রবাহে গিরিশচন্দ্র যেমনটি অনুভব করে তা প্রকাশ করতে পেরেছিলেন তাতে নাটক—অভিনয়—দর্শক একাকার হয়ে যেতে এতটুকু অসুবিধা হোত না। দর্শকের হৃদয়কে নাট্যকারের সৃষ্ট চরিত্রের অনুভব ও বক্তব্যকে গ্রহণ করে আনন্দ-বেদনার সঙ্গী হতে এতটুকু দেরী হোত না—এটাই গিরিশচন্দ্রের কালজয়ী নাটক রচনা—চরিত্রাভিনয় ও পরিচালনার ইতিবাচক প্রতিভা।

'ক্লাসিক থিয়েটার'-এ গিরিশচন্দ্র যোগদান করার পর প্রায় প্রত্যেক নাটকের বিষয়, তার অভিনয় ও চরিত্রের নানা খবর ইংরেজী ও বাংলা সংবাদপত্রে ফলাও করে প্রকাশিত হোত। তার ফলে নাটক ও তার অভিনয় বিষয়ে সামাজিক জীবনে একটা গুরুত্ববোধের সিঁড়ি তৈরী হয়ে গেল—যাকে অনুসরণ করে অভিনেতা-অভিনেতৃবৃন্দের প্রেরণা ও শিক্ষার সুযোগ লাভ হোত।

একদিকে 'ক্লাসিক থিয়েটারে' গিরিশচন্দ্রের যোগদানের পর থেকে থিয়েটারের আয় আশাতীত বেড়ে যায়, তাতে অমরবাবু খুশী ছিলেন—কিন্তু অভাবনীয় অর্থ উপার্জ্জন করেও তিনি কিছুই সঞ্চয় করতে পারেন নি। এক সময় ব্যয়ের আধিক্যে অমরবাবু

ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়লেন। সেসময় তিনি বিখ্যাত কন্ট্রাক্টর মনমোহন পাঁড়ে মহাশয়ের কাছ থেকে টাকা ধার নিতেন—সেই ধার এমন পর্যায়ে, যে টাকার অংক বেড়ে গেল।

অমরবাবু অর্থের আধিক্যে 'ক্লাসিক' ও 'মিনার্ভা'—দুটি থিয়েটার চালাবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু তাতে আরো বেশী ঋণগ্রস্থ হলেন অমরবাবু।

অবশেষে নানা ঘটনার কেন্দ্র বিন্দুতে অর্থের ঋণ পরিশোধ ব্যাপারে অমরবাবু *মনমোহন পাঁড়ে মহাশয়কে 'মিনার্ভা থিয়েটার' লীজ দিয়ে দিলেন*।

নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গিরিশচন্দ্র অনেক টাকা অমরবাবুকে ঋণ দিয়েও 'ক্লাসিক থিয়েটার' রক্ষা করাতে পারেন নি—অবশেষে পাওনাদারদের চাপে বাধ্য হয়েই দেনা পরিশোধ করার ব্যাপারে হাইকোর্টে মামলা করা হয়—'ক্লাসিকে' রিসিভার নিযুক্ত হল—**অমরবাবুকে ইনসল্‌ভেন্ট নিতে হয়**।

'মিনার্ভা থিয়েটারে'র মনমোহন পাঁড়ে শ্রীচুনীলাল দেব মহাশয়কে থিয়েটারের সাব লীজ দিলেন। **চুনীলালদেব হলেন মিনার্ভার অধ্যক্ষ ও পরিচালক**। এদিকে 'ক্লাসিক থিয়েটারে' *'সৎনাম'* নাটকটির বিপর্যয় হেতু অভিনেতা-অভিনেতৃগণ দলে দলে ক্লাসিক থিয়েটার ত্যাগ করে 'মিনার্ভায়' যোগদান করলেন। 'মিনার্ভায়' তখন *'সংসার'* সামাজিক নাটক বেশ জমে উঠেছে। নাট্যকার মনোমোহন গোস্বামী। 'সংসার' থেকে 'মিনার্ভায়' অর্থ আসছে দর্শকদের ভীড় ও হচ্ছে সেইমত। চুনীলাল বাবু সুযোগ পেলেই মনমোহন পাঁড়েকে লীজ শর্ত অনুসারে টাকা দিতেন।

এভাবে চলতে চলতে চুনীলালদেব মহাশয় মিনার্ভায় ভাল অভিনয়ের জন্য ভাল নাটক ভাল পরিচালক এবং ভাল টাকায় ভাল অভিনেতা অভিনেত্রীদের সমাবেশ করার ভাবনা করছেন—কিন্তু তার জন্য অর্থের প্রচুর দরকার। সে পরিমান অর্থ চুনীবাবু কোথায় পাবেন?

সেসময় 'বসুমতী সংবাদপত্রে'র *প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়* সৎসাহিত্য প্রসার ও প্রচার করার জন্য অনেক *'অতুল গ্রন্থাবলী'* ছেপেছিলেন কিন্তু বিক্রী না হওয়ায় তিনি স্থির করলেন, 'অতুল গ্রন্থাবলী' তিনি নাটকের দর্শকদের মধ্যে উপহার স্বরূপ বিলি করবেন। প্রথমে উপন্দ্রেবাবু 'ক্লাসিক থিয়েটারের' অমরবাবুকে এই প্রস্তাব দেন। অমরবাবু তা তেমনভাবে সায় দিলেন না। পরে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাব 'মিনার্ভার' চুনীলালবাবু গ্রহণ করলেন এবং সেইমত নাটকের বিজ্ঞাপনে উপহারের সংবাদ ও বিজ্ঞাপিত করলেন।

'মিনার্ভা থিয়েটারে' নাটক দেখবার জন্য উপহারের আকর্ষণে অপ্রত্যাশিতভাবে দর্শক সমাগম হয়—পর পর কয়েকদিন দর্শকদের সমাগমে প্রচুর অর্থ উপার্জনে 'মিনার্ভা'র ভাগ্য প্রসন্নতা লাভ করল—চুনীবাবু সাহস ও শক্তি লাভ করলেন ভবিষ্যৎ

পথে তাঁর চিন্তাকে সার্থকভাবে সফল করার জন্য।

'সংসার' নাটকে অভিনয়ে সাড়া জাগল সর্বত্র। **স্টার' থেকে অর্ধেন্দু শেখর মুস্তফী—ইউনিক থিয়েটার থেকে তারাসুন্দরী এবং তিনকড়ি দাসী মিনার্ভায় চুনীবাবুর আশ্রয়ে। গিরিশচন্দ্রকে চুনীলালদেব মহাশয় অত্যন্ত যত্নে ও শ্রদ্ধায় 'ক্লাসিক থিয়েটার' থেকে (গিরিশচন্দ্র ৩ মাসের বেতন পাননি) মিনার্ভায় নিয়ে এলেন।**

সামান্য কারণে মনমোহন পাঁড়ে মহাশয়ের সাথে চুনীবাবুর মত বিরোধ হয়-চুনীবাবু থিয়েটার ছেড়ে দেন। অবশ্য পরে উকিল মহেন্দ্র কুমার মিত্র মহাশয়ের মধ্যস্থতায় চুনীবাবু পুনরায় 'মিনার্ভায়' যোগদান করেন। রঙ্গমঞ্চের আর্থিক ক্ষতি যাতে না হয় মহেন্দ্র মিত্র মহাশয় অত্যন্ত গভীরভাবে নানাদিক পর্যালোচনায় 'মিনার্ভায়' গিরিশচন্দ্রকে যুক্ত করা হল।

গিরিশচন্দ্র সেসময় একটি সামাজিক নাটক *'বলিদান'* লিখছিলেন। কিন্তু শিব-রাত্রি উৎসব নিকটে থাকায় গিরিশচন্দ্র দর্শকদের কথা চিন্তা করে *'হরগৌরী'* **এই নামে একটি গীতিনাটক রচনা করেন এবং উহা 'মিনার্ভায়' অভিনীত হয়। এই নাটকে হরপার্বতীর দৈব মননকে খুব একটা অংকন না করে বাংলার ঘরের জীবনের সাথে যুক্ত করলেন**। গার্হস্থ চিত্ররূপে গীতিনাটকটি দর্শকদের শিবরাত্রির পবিত্র ভাবনায় অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে জীবনকে উত্তরণের পথে এগিয়ে দিলেন।

হরগৌরী

এর পরবর্তী নাটক *'বলিদান'* সামাজিক নাটক হিসেবে গভীরভাবে দর্শক সমাজকে আকৃষ্ট করেছিল। এই নাটকে তৎকালীন সমাজে **'কন্যাদান' যেন কন্যাকে *'বলিদান'* করার ব্যাপার বলে উল্লেখ করেছেন**। *'বলিদান'* বাংলার গৃহ-চিত্র। কন্যাদায়গ্রস্থ পিতার লাঞ্ছনা-উৎপীড়নের মর্মান্তিক বেদনাবিদ্ধ ছবি নাটকের চরিত্রের কথায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। **এই নাটকে 'করুণাময়' চরিত্রে গিরিশচন্দ্র অভিনয় করেছেন।**

বলিদান

মিনার্ভায় 'বলিদান' অভিনীত হয় ১৩১১ সনে। **'করুণাময়ে'র চরিত্র রূপায়ণে গিরিশচন্দ্রের অসামান্য প্রতিভা দীর্ঘদিন বাংলার কন্যাদায়গ্রস্থ অসহায় পিতার অন্তর ভাবনায় শক্তিদান করেছিল**।

'বলিদান' এর অভিনয় সফলতা তখনকাব বাংলা-ইংরেজী পত্র পত্রিকায় ফলাও করে প্রকাশিত হয়েছিল।

> ..বঙ্গেব বঙ্গমঞ্চে বাঙালীর ঘবেব ছবি যে এতটা পরিস্ফুট হইবে দর্শকের হৃদয যে একটা উদ্বেলিত হইবে, বলিদান অভিনয দেখিবার পূর্বে আমবা তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই।

'বলিদান' এর সফল অভিনয় গিরিশচন্দ্রকে গভীরভাবে আরো আরো বেশী করে নাটকের মধ্যদিয়ে সাধারণ মানুষের জাগরণের কলাকৌশল রপ্ত করাব জন্য মনোযোগ

দিতে হল। *গিরিশচন্দ্র নাটক রচনা ও অভিনয়ের মাধ্যমে মানুষের শিক্ষা দেবার যে নির্দেশ ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে পেয়েছিলেন—সফল সময় তিনি তা যাতে বজায় রাখতে পারেন তার জন্য সবিশেষ চিন্তা করতেন।*

সময়টা বাংলায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের পটভূমি। চারিদিকে বিশেষ বিশেষ নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ ভাবনায় গভীরভাবে চিন্তান্বিত। দেশবাসীদের সজাগ করার কাজে ও চিন্তায় নানাভাবে প্রেরণা দান করে চলেছেন। দেশবাসীর অন্তরে দেশাত্মবোধ জাগাবার জন্য পথ খুঁজছেন। সর্বস্তরের বুদ্ধিজীবীদের অন্তবে প্রচন্ড তোলপাড়। ঠিক

সিরাজদ্দৌলা

এমনি সময়ে গিরিশচন্দ্র *'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির—অনুরোধে বাংলার শেষ নবাব 'সিরাজদ্দৌলা সম্পর্কে নাটক রচনা করেন*। গিরিশচন্দ্র সেসময় সিরাজের জীবন তথা বাংলার শেষ বাঙালি নবাবের বিষয়ে উল্লিখিত ঘটনার পুস্তকগুলি সংগ্রহ করতে লাগলেন। সিরাজের জীবনকাহিনী বিরাট এবং নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে বহু কাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু তাতে নাটকের অভিনয় সময় ততটা উপযুক্ত হবে না—তাই গিরিশচন্দ্র কাহিনীর অনেক অংশ অনিবার্যভাবে বর্জন করে—সিরাজের জীবনের অর্ধেকটা যুক্ত করলেন। *সিরাজের স্বদেশ-প্রীতি, যৌবন সুলভ চপলতা, অনুতাপ সহ ব্যক্তিগত জীবনের সুখ ও আনন্দরূপ নাটকে যুক্ত করলেন। সিরাজদ্দৌলা নাটকে গিরিশচন্দ্র করিমচাচা ও জহরা এই দুটি নিজস্ব সৃষ্টির অন্তরালে সিরাজের মানসিক রূপবেখাটি সুন্দবভাবে অংকন কবলেন*—যার সঙ্গে ইতিহাসের যোগ না থাকলেও ইতিহাসের বর্ণিত চবিত্রেব কোন ক্ষতি হয়নি। **করিমচাচার অভিনয় গিরিশচন্দ্র করেছিলেন।**

শোনা যায়, **কলকাতায় তখন কংগ্রেসের অধিবেশন চলছে। বালগঙ্গাধর তিলক অধিবেশন সমাপ্ত করে 'মিনার্ভায়' *'সিরাজদ্দৌলা'* নাটকটি দেখেন এবং এত প্রীত হয়েছেন যে নাট্যকার গিরিশচন্দ্রকে আলিঙ্গন করে নাটকটির প্রশংসা করেছিলেন।** 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকটির সুখ্যাতি চারিদিক থেকে গিরিশচন্দ্রের কাছে এসেছে। বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জলধর সেন, সাহিত্যিক জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস সহ বহু দর্শক গিরিশচন্দ্রকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

> ...both from the dramatic and literacy point of view, SirajUd-Dowllah is destined to occupy a high and an enduring place in our National Literature
>
> –Bengali - 1906/3rd Feb .

> ...The company at this theater has been playing Serajud-Doullah by G C Ghosh, for the past five months with unabated success
>
> –Statesman, 17th Feb, 1906

'পলাশীর যুদ্ধ' রচয়িতা নবীনচন্দ্র সেন সিরাজদ্দৌলা নাটক পাঠ করেছিলেন। সুদুর প্রবাস থেকে (রেঙ্গুন) গিরিশচন্দ্রকে একটি পত্রে লিখেছেন—

> ...৬০ বৎসর বয়সে তুমি সিরাজদ্দৌলা লিখিয়াছ শুনিয়া তাহার একখানি আনাইয়া এইমাত্র পড়া শেষ করেছি। তুমি আমার অপেক্ষা শক্তিশালী, আমার অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান। আমি নবযুবক সিরাজের পত্নীর মুখে শোক-সঙ্গীত দিয়াছিলাম। শোকের সময়ে সঙ্গীত মুখে আসে কিনা বড় সন্দেহের কথা বলিয়া বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন। সেইজন্য সঙ্গীত পরে উঠাইয়া দিয়াছিলাম। তুমি চিরদিন গোঁয়ার। দেখিলাম তুমি সেই সন্দিগ্ধ পথ অবলম্বন করিয়াছ।.....

নাটকটি নবীনচন্দ্র সেন দেখেননি। পরবর্তী সময়ে গিরিশচন্দ্রের 'করিমচাচার' ভূমিকায় প্রশংসা শুনে খুবই প্রীত হয়েছিলেন।

ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্র গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকটি পাঠ করে লিখেছেন,—

> ....আমি আপনার অভিনয় দর্শন করি নাই, তাহার কথা লোকমুখে শুনিয়াছি মাত্র।...আপনি ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষা করিয়া নাটকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছেন, ইহাই আপনার রচনা প্রতিভার আত্মপ্রসাদ। ইতিহাস লিখিয়া সুখী হইতে পারি নাই, লিখিতে লিখিতে অশ্রুবির্সজন করিয়াছি। নাটকটি পড়িয়াও সুখী হতে পারিলাম না, পড়িতে পড়িতে অশ্রুবিসর্জন করিলাম।

'বলিদান' ও 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক রচনা ও নাটকের অভাবনীয় সফলতার পশ্চাতে গিরিশচন্দ্র যেভাবে প্রতিটি চরিত্র সার্থকভাবে রূপদানের জন্য শিক্ষাদান করেছিলেন তাতে তাঁর শরীর খুবই অসুস্থ হয়ে যায়। 'হাঁপানী'র আক্রমণ অত্যন্ত ‑গভীরভাবে গিরিশচন্দ্রকে পীড়া দিয়েছিল। দেহ ও মন দুই‌ই জরাগ্রস্থতায় আক্রান্ত হলেন গিরিশচন্দ্র। অসুস্থ গিরিশচন্দ্রের আজও এমন শারীরিক অবস্থায় নিজের দিকে তাকাবার অবসর নেই। থিয়েটারের জন্য নতুন নাটকের তাড়া তাঁকে বিশ্রামের অলসতায় দিন কাটাতে বাধা দিচ্ছে অনবরত। তারই মধ্যে *'বাসর'* এই নামে গানের নাটক রচনা করেন। কাহিনী রাজা বিক্রমাদিত্য জীবনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। সেখানে রাজধর্ম—সতীসাধ্বী স্ত্রীর ধর্ম, ব্রাহ্মণের ধর্ম ইত্যাদির ধারণা কাহিনীর মাধ্যমে দেশের মানুষের কাছে তুলে ধরা হল। সত্যকে একমাত্র আশ্রয় করে জীবনের নানাপথ করায়ত্ব করার শক্তি বর্ণিত হয়েছে। গিরিশচন্দ্র নাটকটি রচনা করেন—কিন্তু নাটকের চরিত্রগুলি যথাযথ রূপদানে যে শিক্ষাদান তা তিনি অসুস্থাবশতঃ করতে পারেন নি।

বাসর

'মিনার্ভায়' গিরিশচন্দ্র নাটকের অভিনয়ে বেশ মাতিয়ে তুলেছেন।

শরীর কিছুক্ষণ সুস্থ হবার পর নতুন নাটকের সন্ধানে চিন্তার অবিরাম কর্ষণে বেশ ক্লান্তি এসে গেল। কিন্তু নাটক চাইই। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের *'দুর্গেশনন্দিনী'* উপন্যাসের কাহিনীকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে নাটকে রূপান্তরিত করলেন 'মিনার্ভায়' অভিনয়ের জন্য।

দুর্গেশনন্দিনী

ইতিপূর্বে *ন্যাশনালে* থাকাকালিন গিরিশচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী'র নাট্যরূপে নাটক পরিবেশন করেছিলেন—কিন্তু এবারের নাট্যরূপ সম্পূর্ণ নতুন ও চমৎকারিত্বের ওজনে খুবই ভারী। আগের পাণ্ডুলিপির অনুকরণ নয়। নবরূপের 'দুর্গেশনন্দিনী' **নাটকে গিরিশচন্দ্র বীরেন্দ্র সিংহের ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করে** স্থানীয় নাট্য-দর্শকদের তথা বুদ্ধিজীবীদের অন্তরে গভীর শ্রদ্ধায় উপবিষ্ট হলেন।

।। বিয়াল্লিশ ।।

গিরিশচন্দ্র স্বদেশানুরাগের পটভূমিকায ইতিহাসে বর্ণিত জাতীয় ইতিহাসের ঘটনাকে দেশ-উপযোগী ও তাঁর অন্তর-আদর্শের অনুকুল ভাবনায় অনেক মতামত গ্রহণ ও বর্জন করে ঐতিহাসিক চরিত্রের উপস্থাপনায় নতুন চরিত্র সৃষ্টি করে নাটকের সংলাপে জাতীয় ভাবনার প্রেরণাকে সঞ্চারিত করেছেন। যে সময়ে গিরিশচন্দ্র নাটক ও নাট্য চরিত্রের প্রস্তাবনা দর্শক সমাজকে অনুপ্রাণিত করার জন্য অগ্রসর হয়েছেন সেসময়কার দেশ ও জাতীয় মানসিকতার প্রতি গভীরভাবে বিশ্বস্ত থেকে নাটক রচনা গিরিশচন্দ্রের বিশেষত্ব।

মীরকাশিম

তাঁর 'সিরাজদ্দৌলার' **করিমচাচার** চরিত্র সেদিক থেকে অনবদ্য এবং নিজে সেই চরিত্র রূপদান করে সেসমযের দর্শককূলকে শুধু আনন্দ দানই করেন নি—পরাধীন ভারতের দুঃখদুর্দশার কেন্দ্রীভূত ঘটনার ও চরিত্রের প্রকাশও করেছেন।

"বঙ্গভুমিরূপ সাধের উদ্যান স্বার্থকুসুম ফুটেই বযেছে— ছোট বড় সব স্ব স্ব প্রধান— সুসৌবভে এ বলে আমায দেখ, ও বলে আমায দেখ। এ বাংলাব যিনি শান্তি স্থাপন কববেন তিনি বিধাতাপুরুষ। বাংলা ফিবে গড়তে হবে, পুবানো বাংলা চলবে না।"

গিরিশচন্দ্রের মানসিক তত্ত্ববিকাশে এই ভাবনা নিজের ব্যক্তিগত জীবন উত্তরণের বীজকে একমাত্র অবলম্বন করেছেন। তাই নিজের অভিজ্ঞতার আলোতে জাতীয় অন্ধকার দূর করার পথ দেখাতে নাটকের চরিত্র সৃষ্টির অবলম্বনে বক্তব্যকে প্রসারিত করেছেন।

'মীরকাসিম' নাটকের মধ্য দিয়েও বাংলার স্বদেশভাবনার কথা গিরিশচন্দ্র চরিত্র-সংলাপে নানাভাবে আঘাত ও শ্লেষের মাধ্যমে বলেছেন। 'মীরকাশিম' নাটকে মীর

চরিত্রের সৃষ্টিতে ইতিহাস ও মানসিক আনুগত্য দুইই গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে অত্যন্ত সুন্দরভাবে যা নাটকটির অভিনয় আকর্ষণ দীর্ঘদিন ধরে একনাগাড়ে 'মিনার্ভা' থিয়েটারকে মুখরিত করেছিল। নাটক সম্পর্কে কিছু কিছু ভদ্র আভিজাত্য এক একটি পল্লীর নামী মানুষরাও সপরিবারে 'মীরকাসিম' নাটক দেখতে এসেছিলেন।

এই নাটকে 'মীরজাফর' চরিত্রটি রূপায়ণে গিরিশচন্দ্র যেভাবে তার পরিণত বয়স-শক্তি-তদুপরি অসুস্থতাকে বিন্দুমাত্র আমল না দিয়ে নিজে চরিত্রটি রূপদান করেছেন তা শুধু অনবদ্যই নয়, অভাবনীয়।

'মীরকাসিমের' পতন এবং ইংরেজের সিংহাসন লাভের পরিকল্পনার সূত্র তখনকার যুবক সম্প্রদায়কে দেশ-ভাবনায় একটি অন্য গভীরমাত্রা দান করেছিল। সময়টা দেশের জাগরণ ভূমির কর্ষণ করার কাজে দেশ বরণ্যগণ ব্যস্ত—তারই মধ্যে 'সিরাজদ্দৌলা' ও 'মীরকাসিম' এই দুটি নাটক দর্শকদের অনেক দূর এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

> ....গিরিশচন্দ্র তাঁহার পবিণত বয়সের সকল শক্তি ও আগ্রহ তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও অনন্যসাধারণ লিপিকুশলতার সহায়তায় এই নাটকখানিকে তাঁহার স্বকীয় কীর্তিস্তম্ভে পরিণত করিয়াছেন। এই স্তম্ভের বনিয়াদ হইতে চূড়া পর্যন্ত্য স্বদেশ-প্রেমের পাকা সোনায় গঠিত।....
>
> গিরিশচন্দ্রের রচনা-কৌশলে মুগ্ধ হইয়াছি, অভিনয়ের পারিপাট্যে পরিতৃপ্ত হইযাছি। ইতিহাস পাঠ করিয়াছি, মীরকাসিম প্রজাহিতৈষী নরপতি ছিলেন, ইংরাজ বণিকের কর্মচারীর হস্তের ক্রীড়াপুত্তলিকা হইয়া তিনি নবাবী করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাই তিনি ইংরাজেব সঙ্গে লড়িয়াছিলেন, হটিয়াছিলেন ও শেষে সর্বস্ব-বঞ্চিত হইয়া নিরাশ্রয় অনাথের ন্যায় মরিয়াছিলেন। এই কঙ্কালটুকু অবলম্বন করিয়া এমন একখানি বিচিত্র ও বিপুল নাটক গিরিশবাবু ভিন্ন অন্য কেহ রচনা করিতে পারিবেন কিনা জানি না।

বসুমতী - ৩০ আষাঢ় ১৩১৩

'মীরকাসিম' নাটকের দর্শকসমাজের **আলোড়নে ইংরেজ সরকার নাটকটির অভিনয় ও প্রচার বন্ধ করে দেন।**

অসুস্থ অবস্থায় গিরিশচন্দ্র *'সিরাজদ্দৌলার' করিমচাচা* এবং *'মীরকাসিম' এর মীরজাফর* এই দুটি চরিত্রের রূপদানে সংলাপ ও অনুভূতির প্রেক্ষণে আরো বেশী তাঁর শরীরের ক্ষতি হয়ে গেল। গিরিশচন্দ্র আবার হাঁপানীর রোগে গভীরভাবে আক্রান্ত হলেন। চোখ-মুখ এমন কি বুক পর্যন্ত্য অসহ্য যন্ত্রণায় জীবনের আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন। কাছেই বড়দিন—নতুন নতুন নাটক রচনা ও অভিনয়ের স্বাভাবিক মরশুম। তাই 'মিনার্ভার' কর্মকর্তারা গিরিশচন্দ্রের কাছে এসে বললেন,—

> ....মহাশয়, সব থিয়েটারে নতুন বই হইতেছে, আপনি পীড়িত, আমরা কিছুই করিতে পারিলাম না।...

পীড়িত অসুস্থ গিরিশচন্দ্র কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে রইলেন--ঠাকুরকে স্মরণ করলেন—করুণা ভিক্ষা করলেন—দু ফোটা চোখের জলে তাঁর অন্তরে দেবতার রাখা চরণদুটো ধুয়ে দিয়ে মাথা উঁচু করে তাদের বললেন,—

> ....ভাবিবেন না, যাহা হউক কিছু একটা করিয়া দিব।

'মিনার্ভার' কর্মকর্তারা আশান্বিত হয়ে চলে গেলেন। সেদিনই সন্ধ্যায় দেবেন্দ্রনাথ বসু এসেছিলেন অসুস্থ গিরিশচন্দ্রকে দেখতে। তাঁর কাছে গিরিশচন্দ্র সব বললেন।

য্যায়সা কো ত্যায়সা

দেবেন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ভাবছেন—অসুস্থ পীড়িত গিরিশচন্দ্রের প্রতি এতটুকু মায়া দয়া নেই নাট্য-মালিকদের। তারপর নিজেই আশ্বস্ত করে বললেন,—ঠাকুরের কৃপায় তুমি পাববে—তোমার শক্তি তিনিই জোগাবেন। দেবেন্দ্রনাথ বসুর আশ্বাসে উদ্দীপ্ত গিরিশচন্দ্র আলোর রেখা দেখতে পেলেন। কিছুক্ষণ পরেই গিরিশচন্দ্র অসুস্থ অবস্থায় সামনের দেওয়ালের তাকের উপর রাখা সারি সারি পুস্তকের ভেতর থেকে ফরাসী নাট্যকার মলিয়ারের গ্রন্থাবলি টেনে নিলেন। তারপর সারারাত জেগে মলিয়ারের 'L Amour Medicine' পড়তে পড়তে একটি প্রহসন *'য্যায়সা কা ত্যায়সা'* রচনা করলেন—এক রাত্রিতে। খবর পাঠালেন 'মিনার্ভায়'। বিজ্ঞাপন দেওয়া হল—নতুন নাটক— প্রহসন—য্যায়সা কা ত্যায়সা—রচনা গিরিশচন্দ্র।

গিরিশচন্দ্র অসুস্থ শরীরে প্রহসনের শিক্ষক চরিত্রটি রূপদান করলেন। হৃদয়গ্রাহী উত্তেজনায় প্রহসনটি দর্শকদের বিপুলভাবে আনন্দ দান করেছিল। পরবর্তী সময়ে 'য্যায়সা কা ত্যায়সা' বহুদিন অভিনয় হয়েছিল।

প্রহসনখানির দর্শক সমৃদ্ধ হবার পর গিরিশচন্দ্র আবার একান্তে তাঁর ঠাকুরকে স্মরণ করলেন।

পরদিন গ্রন্থখানি উৎসর্গ করলেন শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসুকে,—

> ....তোমার উদ্যোগ ও সাহায্য ব্যতীত শয্যাশায়ী অবস্থায় এ প্রহসনখানি লিখিতে পারিতাম না। তুমি চিরদিনই আমাব সহায়, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি তোমার নামে উৎসর্গকৃত করিযা আমি....তৃপ্ত।

।। তেতাল্লিশ ।।

হাঁপানীর অসুস্থতা গিরিশচন্দ্রকে বেশ কাহিল করেছিল। তবে তিনি কোনভাবেই অবসিত হতেন না। পরম করুণাময় তাঁর ইষ্টদেবতার কথা স্মরণ করে অসুস্থতার মধ্যেও নাটক রচনা, নাটকের চরিত্র রূপদানে অভিনয় শিক্ষা ইত্যাদি— কাজ করতে আনন্দ পেতেন—অসুস্থতা সম্পর্কে হাসতে হাসতে তিনি বলতেন—

> ....দেখ, অকৃতজ্ঞ দেহটার উপর আর আমার কোনও মমতা নাই। এই দেহের পুষ্টির জন্য কত উপাদেয় আহার দিয়েছি, কত যত্নে ইহাকে সাজিয়েছি গুজিয়েছি—কিন্তু এই দেহই পরম যত্নে হাঁপানীকে ডাকিয়া আনিয়া আশ্রয় দিয়াছে। সত্য বলিতেছি, আমার প্রাণের ইচ্ছা নয় যে এই রোগ আমার সারিয়া যায়। হাঁপানীব প্রত্যেক টানে দেহের ক্ষণভঙ্গুরতার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ....জগদীশ্বর জগদীশ্বব—তুমি মঙ্গলময়— যেন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত এই বিশ্বাস থাকে।....

মাঝে মধ্যে একান্ত নির্ভর সেই পরম ঠাকুরের চরণ ধ্যান করতে কখনও কান্না কখনও হাসি কখনও বা আনন্দের অমৃত আস্বাদনের উল্লাসে জয় ধ্বনি করে উঠতেন গিরিশচন্দ্র। আশে পাশের বাড়ী থেকে সেই বিরাট বপুর মানুষের অট্টহাসিতে ছুটে আসতো তাঁর বাড়ীতে। গিরিশচন্দ্র তখন একান্তভাবেই স্বাভাবিক—অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে প্রতিবেশীদের সম্ভাষণ করতেন এবং নিজেই কুশলবার্তা জিজ্ঞেস করতেন।

বসন্ত আগমনে শরীর সুস্থ বোধ করছেন জেনে বিখ্যাত সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় গিরিশচন্দ্রকে অনুরোধ জানালেন 'নাদির শার' ভারত আক্রমণের উপর একটি নাটক রচনা করে দেবার জন্য। নাটকটি রচনা করতে করতে গিরিশচন্দ্র বুঝতে পারলেন তাঁর রচিত 'সিরাজদ্দৌলার' নাটকের কিছু কিছু ঘটনা ও চরিত্রের মিল এসে যাচ্ছে—তখন চিন্তান্বিত হয়ে নাটকটি অসমাপ্ত রেখে দিলেন। কিন্তু নাটকের কাহিনীর সূত্রে ভেতরে ভেতরে আর এক বিরাট মানুষের জীবন ও কর্মধারার স্ফুলিংগ মনকে আলোকিত করে তুললো—তিনি ইতিহাসের সেই পরম দেশপ্রেমিক 'শিবাজী'। এতটুকু বিলম্ব না করে গিরিশচন্দ্র *'ছত্রপতি শিবাজী'* এই নামে একটি জীবন-সমৃদ্ধ কাহিনীর মধ্য দিয়ে নাটকটি রচনা করলেন। এবং এইটুকু সময় নষ্ট না করে ভগ্ন শরীরেই নাটকটির অভিনয়ের জন্য 'মিনার্ভা থিয়েটারে' রিহার্সেল ও অভিনয় শিক্ষা দিতে তৎপর হলেন।

ছত্রপতি শিবাজী

'ছত্রপতি শিবাজী' নাটকের যথাবিহিত রিহারসেল হতে হতেই গিরিশচন্দ্রের কাছে একটু নতুন নাটমঞ্চের দায়িত্বভার গ্রহণের আবেদন-অনুরোধ এল— যা তিনি বিশেষ কারণে ফেরাতে পারলেন না। অসমাপ্ত রিহার্সসেল এর

বাকী অংশটুকু অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের উপর ভার দিলেন। সেই সময় অমরবাবুও 'মিনার্ভার' অধ্যক্ষ পদে ব্রত হলেন। গিরিশচন্দ্রকে অন্য একটি নাট্যমঞ্চে অনিবার্যভাবে যোগদান করতে হল।

নদীয়ার কুড়ুলগাছীর বিদ্যোৎসাহী জমিদার, হাইকোর্টের উকিল প্রসন্ন কুমার রায়ের পুত্র শরৎকুমার রায় বহু টাকায় নুয়ে পরা *'এমারেল্ড থিয়েটার'টি* প্রকাশ্য নিলামে কিনে নেন। শরৎবাবু থিয়েটার কিনে তাকে সুশৃঙ্খলভাবে নিয়মিত অভিনয় করার কাজে গভীরভাবে মনোনিবেশ করলেন। কিন্তু সুস্থ ও পরিচ্ছন্নভাবে থিয়েটার পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা শরৎবাবুর নেই। তাই তিনি সেকাজে একজন মানুষকে খুঁজছিলেন।

কোহিনূর থিয়েটার

পিতা প্রসন্নকুমারের পরামর্শে শরৎবাবু গিরিশচন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করলেন। শরৎবাবু সেইমত কয়েকদিন গিরিশচন্দ্রের কাছে নতুন নাট্যমঞ্চ পরিচালনা ও নাটকের অভিনয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে মানসিকভাবে উৎসাহিত ও তৃপ্তিলাভ করে সরাসরি গিরিশচন্দ্রকে তার প্রস্তাবিত নাট্যমঞ্চের ভার গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান এবং সাথে সাথে গিরিশচন্দ্রের যোগদানের জন্য প্রতিমাসে চারশত টাকা বেতনসহ দশ হাজার টাকা বোনাস দেবেন বলে জানান। **গিরিশচন্দ্র নতুন থিয়েটারে অধ্যক্ষ পদে বৃত হলেন। নানা পরামর্শে নাট্যমঞ্চের নতুন নাম হল 'কোহিনুর থিয়েটার'**। গিরিশচন্দ্র 'কোহিনুর থিয়েটারে' যোগদান করলেন। কিন্তু ভগ্নপ্রায় এমারেল্ড থিয়েটার সংস্কারের কাজ তখনও চলছিল—তা ছাড়া নাটকের জন্য প্রয়োজনীয় পোষাক পরিচ্ছদসহ, অনিবার্য অনেককিছুরই অভাব। গিরিশচন্দ্র নিজে উদ্যোগ গ্রহণ করে সব ব্যবস্থার মধ্যে পুরোপুরি চলনসই অবস্থায় 'কোহিনুর'কে প্রতিষ্ঠিত করলেন। কিন্তু নাটক? নাট্যকার পণ্ডিত **ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ** কোহিনুর

চাঁদবিধি

থিয়েটারের জন্য একটি নাটক *'চাঁদবিধি'* রচনা করছিলেন। কিন্তু তা শেষ না হওয়ায় গিরিশচন্দ্র আপন প্রতিভায় নাট্যমঞ্চের শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য উল্লিখিত 'চাঁদবিধি' নাটকের অসম্পূর্ণ অংশ নিজে লিখে অভিনয় করার সংকল্প করলেন। নতুন নাটক—তাকে অভিনয় উপযোগী চরিত্র চিত্রণে রিহারসেল দেবার বিষয়ে গিরিশচন্দ্র অসুস্থ শরীরে দিন-রাত পরিশ্রম করে তা উপযোগী করে তুললেন। গিরিশচন্দ্রকে কাছে পেয়ে অভিনেতা-অভিনেতৃবৃন্দ যারপর নাই আনন্দিত—প্রচুর উৎসাহে স্ব স্ব চরিত্র সার্থকভাবে রূপদান করার জন্য প্রস্তুত।

'চাঁদবিধি' 'কোহিনুর থিয়েটারে' অভিনীত হল—প্রথম অভিনয় রজনীতে অভাবনীয় দর্শক সমাগম এবং তাতে প্রায় ২২৫০ টাকার টিকিট বিক্রয় সকলকে বাড়তি প্রেরণা ও উৎসাহ বাড়িয়ে দিল।

'চাঁদবিধি' অভিনয় সাফল্যে গিরিশচন্দ্র কিছুদিন পর **'কোহিনুর থিয়েটারে' তাঁরই রচনা 'ছত্রপতি শিবাজী' অভিনয় করান।**

মিনার্ভায় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত পরিচালিত 'ছত্রপতি শিবাজী' এবং গিরিশচন্দ্র 'কোহিনুরে' 'ছত্রপতি শিবাজী'—দুটি নাট্যমঞ্চে একই নাটকের অভিনয় দর্শক মহলে তথা বাংলা নাট্য মঞ্চে বিশেষ মাত্রা যোগ হল।

'কোহিনুর থিয়েটারে' 'ছত্রপতি শিবাজী'তে গিরিশচন্দ্র ঔরঙ্গজেবের ভূমিকায় অভিনয় করেন।

পত্র পত্রিকায় একটি নাটকের দুটি রঙ্গালয়ে অভিনয়—প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অভিনয় উৎকর্ষতার চরম অবস্থায় বঙ্গরঙ্গমঞ্চের অপ্রত্যাশিত সুনাম ছড়িয়ে পড়ল।

গিরিশচন্দ্র এই নাটকে *'পুতুলবাই'* একটি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন যার মধ্য দিয়ে অন্তরের গোপন সত্তার পরিচয় প্রকাশ্যে এনেছেন। 'পুতলাবাই' সতী সাধবী—অন্তর প্রেমের গভীরতায় স্বামীর চিত্তকে আকর্ষন করে মহীয়সী হয়েছেন।

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী তাঁর *'বেঙ্গলী'তে* 'ছত্রপতি শিবাজী নাটকের সমালোচনায় এক জায়গায় বলেছেন,—

> ... Chatrapati is one of the best and most powerful dramas ever produced on the Indian Stage.

পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর নিজে গিরিশচন্দ্রের *'ছত্রপতি শিবাজী'* অভিনয় দেখবার জন্য 'কোহিনুর থিয়েটারে' এসেছিলেন। নাটকটি শেষ হবার পরও দেউস্কর বিমুগ্ধ আনন্দে কিছুক্ষণ ছত্রপতির জীবন-প্রবাহে মহারাষ্ট্রের তথা ভারতের জাগরণের দীপ শিখায় অন্তরে প্রজ্জ্বলিত সত্যে যে সকল ভাবনার উদ্ভব হয়েছে তাতে খুবই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন—'হিতবাদী'তে তিনি লিখেছেন,—

> ....মহারাষ্ট্রীয়রা ছত্রপতি শিবাজীকে যেরূপ শ্রদ্ধার চোখে দর্শন করিয়া থাকেন, গিরিশবাবুর নাটকে তাহা বিন্দুমাত্র ক্ষুন্ন হয় নাই দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। শিবাজীর চরিত্রের বিবিধ সদগুণ এবং তাহার সহচর ও কর্মচারীদিগের চরিত্রের বিশেষত্ব এই নাটকে অতীব দক্ষতার সহিত পরিস্ফুট করা হইয়াছে। জাতীয় অভ্যুদয়ের সঙ্গে ঐ সকল গুণের প্রয়োজনীয়তার বিষয় চিন্তা করিলে বলিতে হয়, গিরিশবাবু অতি সুসময়েই এই নাটকের প্রচার করিয়াছেন। বাঙালির জাতীয় ভাব বর্ধন বিষয়ে এই নাটক বিশেষ সহায়তা করিবে....

বিখ্যাত সাহিত্যিক ও *সম্পাদক জলধর সেন* 'বসুমতী'তে বলেছেন....

> ....শিবাজীর অভিনয় দেখিতে দেখিতে মনে হয়, যেন শিবাজী দেশ বিশেষে, যুগ বিশেষে জন্মগ্রহণ করেন নাই; ধরাতলে যখন অত্যাচার প্রবল হয়, দরিদ্র উৎপীড়িত হয়, দেবমূর্ত্তি চূর্ণ হয়, সতীলক্ষ্মীগণ পাষণ্ড হস্তে নিগৃহীতা হন তখনই সেই দেশকে বক্ষা করিবার জন্য বিধাতা একজন শিবাজীকে

> ছত্রপতিরূপে প্রেরণ করেন; এই জন্যই শিবাজী শিবশক্তি শম্ভু ও শঙ্করের অংশ। গিরিশবাবু শিবাজী জননী জিজিবাঈকে যেভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, এই হতভাগ্য জাতির মাতৃত্বের বরণীয় আদর্শ সেইরূপ—সহনীয় হওয়া কর্তব্য। গিরিশবাবু তাঁহার পরিণত বয়সের সংযত কল্পনার সকল শক্তি, সকল জ্যোতিঃ ঢালিয়া এই প্রাতঃস্মরণীয় মহারাষ্ট্রীয় দেশনায়কের উজ্জ্বল-চিরপূজ্য-বরণীয় মহনীয় দেবমূর্তি অঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছেন।. ..

স্টেট্‌সম্যান আলোচনায় লিখেছেন,

> ....The popularity of Babu Girish Chandra Ghosh's powerful drama Chhatrapati, Which deals with some of the most striking incidents in the life of Sivaji, is manifest from the large audience which are attracted to the Minarva...
>
> 17 11 1907

গিরিশচন্দ্রের যোগ্য পরিচালনায় খুবই কম সময়ের মধ্যে *'কোহিনুর থিয়েটার'* দর্শক তথা বঙ্গনাট্য মঞ্চে গভীরভাব বিশেষ স্থান পেয়েছিল। কিন্তু তার শেষরক্ষা হল না। 'কোহিনুর থিয়েটারের' মালিক শরৎবাবুর মা প্রয়াণ হবার পর পরই তিনি ও অসুস্থ হন এবং অল্পকালের মধ্যে পরলোকগমন করেন। এদিকে গিরিশচন্দ্রেরও হাঁপানীর রোগ আরো আরো গভীরভাবে তাকে আক্রান্ত করে—যার ফলে নিয়মিত থিয়েটারে আসা এবং অভিনয় করা খুবই অসুবিধা হয়। শরৎবাবুর প্রয়াণ এবং তার ফলে তার ছোট ভাই শিশিরকুমার রায় সর্বেসর্বা হয়ে থিয়েটারের পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন।

'শরৎবাবুর অবর্তমানে এবং গিরিশচন্দ্রের অসুস্থতাবশতঃ 'কোহিনুর থিয়েটারে' বিশৃংঙ্খলা দেখা দিল। গিরিশচন্দ্র ও অসুস্থতাবশতঃ কোন নতুন নাটক রচনা করতে পারছিলেন না—তার ফলে পুরনো নাটকের প্রদর্শনে আয় ও কমে আসছিল।

নতুন মালিক শিশিরকুমার রায়ের সাথে গিরিশবাবুর তেমন পরিচয় ছিল না। তার ফলে নতুন নাটকের অভিনয় না হওয়ায় এবং গিরিশচন্দ্রের অসুস্থতাবশতঃ থিয়েটারে দীর্ঘ দিন অনুপস্থিতি— শিশিরবাবুর মনে নানাপ্রকার অসন্তোষজনিত সন্দেহের দানা বাসা বাঁধল। তিনি গিরিশচন্দ্রের মাসিক বেতন দেওয়া বন্ধ করে দিলেন। গিরিশচন্দ্র অসুস্থ—তা সত্ত্বেও নাটকের প্রয়োজনে নতুন ঐতিহাসিক *'ঝান্সির রানীর'* নাটক লিখতে শুরু করলেন। নাটকটি সম্পূর্ণ করার আগেই রাজ্য সরকারের নির্দেশে ঐতিহাসিক নাটক রচনা বন্ধ করে দেন—'ঝান্সির রানী' অসমাপ্ত হয়ে রইল। গিরিশচন্দ্র তখন সামাজিক নাটক লিখবার জন্য প্রস্তুত হলেন। এদিকে অনেক মাসের বেতন না পাওয়ায় অসুস্থ গিরিশচন্দ্র বেতনের টাকার জন্য আবেদন করলেন। কিন্তু শিশিরবাবু গিরিশচন্দ্রের আবেদনে সাড়া দিলেন না। গিরিশচন্দ্র নিরুপায় হয়ে বাধ্য হয়েই আদালতের দ্বারস্থ হলেন।

অবশেষে আদালতের রয়ে গিরিশচন্দ্র চারমাসের বেতন এবং বোনাসের চার হাজার টাকা পেলেন।

গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে 'কোহিনুর থিয়েটারের' সম্পর্ক ছিন্ন হল।

সে সুযোগে পুরাতন *'স্টার থিয়েটারের'* মালিকগণ এবং *'মিনার্ভা'র* মালিক গিরিশচন্দ্রকে তাদের থিয়েটারে যোগ দেবার জন্য বার বার অনুরোধ করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র অসুস্থ—হাঁপানী রোগের যন্ত্রণা বেশ ক্লান্ত-অবসন্ন। নতুন কিছু করার ভাবনা তেমন নেই। কিন্তু নাটক—অভিনয়—তার রক্তের স্পন্দন—তা ছেড়ে থাকা তাঁর পক্ষে মৃত্যুর সামিল। তাই বাধ্য হয়ে অবশেষে মহেশকুমার মিত্রের অনুরোধে এবং অন্তর— **প্রেরণায় পুনরায় 'মিনার্ভায়' যোগদান করলেন।**

।। চুয়াল্লিশ।।

গিরিশচন্দ্র আবার 'মিনার্ভায়' যোগদান করলেন—কিন্তু মনের ও শরীরের দিক থেকে তেমন জোর পাচ্ছেন না। তবু ও নাটক-রঙ্গালয়-অভিনয় এ সবের ভাবনা তাঁর প্রাণসত্তার গভীরতম পরিচয় তার শ্বাস-প্রশ্বাসে—সেই নরম নরম অন্তর· স্নিগ্ধ আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ জীবন-আনন্দ।

সময়টা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের **প্রবর্তিত বিধবা বিবাহের প্রবাহ** এবং তাকে কেন্দ্র করে বাংলার বুদ্ধিজীবী মহলে আলোচনা—সভা ও সমিতির প্রবাহ। যেখানে যাওয়া যায়—ছোট কি বড় পাড়ায়-মহল্লায় শুধু একটি কথা *বিধবা বিবাহ ঠিক না অঠিক*।

মিনার্ভাব কর্তৃপক্ষ গিরিশচন্দ্রকে এই 'বিধবা বিবাহ' সম্পর্কে একটি রসঘন অথচ মতামত সম্বলিত সামাজিক নাটক রচনার অনুরোধ জানান। গিরিশচন্দ্র প্রথমে রাজি হন নি—কারণ বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর সমাজ ও মহলে। কিন্তু নাট্যকারের নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ববোধের কথা চিন্তা করে গিরিশচন্দ্র অত্যন্ত মানসিক সতর্কতায় 'বিধবা বিবাহের' বিষয়ে '*শাস্তি কি শান্তি*' এই নামে একটি নাটক রচনা করেন এবং মিনার্ভায় তার অভিনয় করান।

শাস্তি কি শান্তি

গিরিশচন্দ্র নাট্যকার—কিন্তু এই *শাস্তি কি শান্তি* এই নাটকে নিজেকে না জড়িয়ে পুরো ভাবনাটি বিচার বিশ্লেষণের বিষয় করে ছেড়ে নিজেকে মতামতের বাইরে রাখলেন। নাটকের চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে বিষয়টির বিশ্লেষণে এক একটি চরিত্র তাদের মতামত প্রকাশ করলেও নাট্যকার পরিছন্নভাবে নিজেকে সরিয়ে রেখেছেন। পক্ষে ও বিপক্ষে চরিত্র সৃষ্টির রসকলায় নানাভাবে 'শাস্তি' আবার 'শান্তি' এই দুইই যুক্তিগ্রাহ্য করিয়েছেন।

বিদ্যাসাগর গিরিশবাবুর আদর্শস্থানীয় এবং শ্রদ্ধার বৃহত্তম মানব—তাই তাঁর আদর্শবোধকে গভীরভাবে প্রকাশ করতে এতটুকু জড়তা দেখান নি। যখন বলা হয় বিধবা বিবাহ মহাপাপ তখন গিরিশচন্দ্রের নাটকের নায়ক প্রসন্নকুমার স্ত্রীকে বলেন—

> ....ভ্রূণহত্যা মহাপাপ নয়? স্বেচ্ছাচারিণী হওয়া মহাপাপ নয়? নীতিবিরোধী কাজ মহাপাপ নয়? উপায় থাকতে উপায় না কবা মহাপাপ নয়? চোখের উপর অনাচাব দেখবে— চোখের উপর মেয়ে ভ্রষ্টা হবে দেখবে— চোখের উপর উপপতির আনাগোনা দেখবে?

প্রসন্নকুমারের স্ত্রী ও স্পষ্টভাবে বিনাদ্বিধায় উত্তরে বলেন,

> ....ইন্দ্রিয় কি এতই দুর্দ্দম, যে নিষ্ঠাচার ধর্মাচবণে দমিত হয না?

প্রসন্নকুমার বলেন,

> ....ইন্দ্রিয় দুর্দ্দম কি না তোমার সন্দেহ আছে? পুত্রশোকাতুরা নারী বৎসর ফেরে না, আবাব পুত্র প্রসব করে।

গিরিশচন্দ্র অত্যন্ত সন্তর্পনে নাটকের মূলভাবনার সমাধানের পথ থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছেন। তবে গভীরভাবে নাটকটির সংলাপ ও অভিনয়ের স্ফুরণে গিরিশচন্দ্রের মননের কিছু পরিচয় পাওয়া যায় যে, তিনি ভারত ঐতিহ্যের প্রতি আস্থাশীল—আর তা ভারতের তপোবন—আশ্রিত মাধুর্যবোধের সৌন্দর্য পথে অমৃত আস্বাদনের সংকল্প।

একসময় দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' নাটক অভিনয় করে গিরিশচন্দ্র বঙ্গ-দর্শকসমাজকে যে আনন্দ ও রস বর্ষণ করেছিলেন আজ জীবন সায়াহ্নে সেই ভাবনায় বিধবা বিবাহ 'শাস্তি কি শান্তি' নিজে রচনা করে অভিনয় করালেন। সেদিনের ভাবনার সিদ্ধান্ত যাঁর ছিল সেই দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের আজ গিরিশচন্দ্র তার ভাবনার ও সত্যবোধের মুখবন্ধ করা কলসীটি উৎসর্গ করলেন দীনবন্ধু মিত্রকেই।

'শাস্তি কি শান্তি' নাটকের অভিনয় চলাকালীন গিরিশচন্দ্র আবার হাঁপানী রোগে আক্রান্ত হলেন। ডাক্তারের পরামর্শে তাঁকে বায়ু পরিবর্তনে কাশীতে যেতে হল। অত্যাধিক পরিশ্রম তথা নাটকের চরিত্র চিত্রণ ভাবনায় দেহের ক্লান্তি গভীরভাবে আছন্ন করেছে। কাশীতে এসে পূর্ণবিশ্রাম নিচ্ছেন—আর মাঝে মাঝে পূর্বের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ইচ্ছাশক্তিতে কিছু কিছু চিকিৎসা করছেন। কাশীর আবহাওয়া গিরিশচন্দ্রকে বেশ সুস্থ করছে এবং মনের আরাম-আনন্দে তিনি দিন কাটাচ্ছেন। কাশীতে গিরিশচন্দ্র 'রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে'র সন্ন্যাসীদের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা করেন এবং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় অনেক অনাথরোগীদের আরোগ্য দান করেন। গিরিশচন্দ্র সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজের কাছে সিকরায় রামপ্রসাদের বাগান বাড়ীতে থাকতেন। প্রায় দু-বৎসর তিনি কাশীতে ছিলেন।

কাশীতে রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমের সন্ন্যাসীগণ, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের সেবকগণ, গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ—ডাঃ নৃপেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ উনওয়ালা সাহেব, পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, থিয়োজফিক্যাল সোসাইটির অম্বিকাকান্ত চক্রবর্তী, উকীল আনন্দ কুমার চৌধুরী, সতীশচন্দ্র দে প্রভৃতিগণ—গিরিশচন্দ্রকে দেখতে আসতেন এবং দেশ ও সমাজের নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। গিরিশচন্দ্র আহ্লাদে তাদের সাথে গল্পগুজবে মাতোয়ারা হতেন আর মাঝে মাঝে প্রয়োজনে হোমিওচিকিৎসায় রোগীদের দেখাশোনা করতেন।

গিরিশচন্দ্র রাত্রিতেও পড়াশোনা করতেন—হিন্দু কলেজের লাইব্রেরী থেকে বই এনে পাঠ করতেন। সেসময় তিনি অনেকগুলি প্রবন্ধ ও গল্প রচনা করেন। কাশীতে থাকাকালীন গিরিশচন্দ্র *'শঙ্করাচার্য'* সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন এবং মনের অত্যন্ত গভীরস্থানে তা স্থান দিয়ে রাখেন পরবর্তী কোন সময়ে নাটকের উপাদান হেতু। সামাজিক-অবস্থা-মানসিক দ্বন্দ্বমুখর জীবনের নানা সমস্যা এবং ইতিহাসসমৃদ্ধ ঘটনাবহুল চরিত্রের আদর্শ রূপায়ন তৎসহ প্রহসন—হাসি সংক্রান্ত বিষয়ের নাটক রচনা হয়েছে—কিন্তু নাটক রচনার পিপাসা এখনও গিরিশচন্দ্রকে রাত্র-দিন অসুস্থশরীরেও তাড়া করছে অনবরত। নাটকীয় মানসিকতার সাথে যুক্ত আপন চেতনালোকের প্রবাহ দিন দিন দেশ ও দেশের মানুষে'র উত্তরণের পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে একান্তভাবে গভীর নিমগ্নতায় গিরিশচন্দ্র কেমন যেন মাঝে মাঝে নিঃসঙ্গতার আবরণে চুপ থেকে চোখ বুজে দিন-রাত কাটান।

শঙ্করাচার্য

গিরিশচন্দ্রের অন্তরে 'শঙ্করাচার্যের' জীবন ও ধর্মাদর্শের কথা বার বার উঁকি মারতো। কিন্তু বেদান্তের নীরসতা কতটা দর্শককে, সাধারণ মানুষকে আকর্ষণ করবে এই তাঁর ভাবনা। শঙ্করাচার্যের মানসিক দিকগুলি ভালভাবে বাছাই করে তাঁর জ্ঞানমার্গ তথা অদ্বৈত চেতনার সাথে ভক্তিমার্গের বোধকে প্রসারিত করার পরিচ্ছন্ন ভাবনা গিরিশচন্দ্রের চিন্তায় গভীরভাবে আন্দোলিত।

অবশেষে *'শঙ্করাচার্য'* নাটক রচনা করলেন গিরিশচন্দ্র। নাটকটির অভিনয়—বিভিন্ন চরিত্র রূপায়ণের জন্য যে রিহারসেল দেওয়া তা গিরিশচন্দ্র নিজে দিতে পারেননি অসুস্থতাবশতঃ—বিশেষ করে তিনি তখন কাশীধামে। পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) নিজে কাশীধামে গিয়ে 'শঙ্করাচার্যের' ভূমিকায় কিছু শিক্ষা পিতার কাছ থেকে জেনে অভিনয় করেছিলেন।

মিনার্ভায় (১৩১৬ মাঘ) 'শঙ্করাচার্য' অভিনীত হয়।

নাটকটি দর্শক সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বেদান্ত প্রচারক **শঙ্করাচার্যের চরিত্রটি গিরিশচন্দ্রের** হাতে রসময় হয়ে সকলের শ্রদ্ধা-ভক্তি লাভ করেছিল।

স্বামী সারদানন্দ নাটকটির প্রশংসা করেছিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও বেদান্তের

মূলভাবকে কাব্যরসে উন্নীত করে গানের মাধ্যমে খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়েছেন বলে অভিমত প্রকাশ করেন।

কাশীধাম থেকে গিরিশচন্দ্র কলকাতায় ফিরে এলেন। 'শঙ্করাচার্য'র প্রশংসা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল আর একটি নাটক রচনায়। কিন্তু শরীর পুরোপুরি সুস্থ নয়। অধিকাংশ সময় বাড়ীতেই থাকেন।

এমনি একটি সন্ধ্যায় গিরিশচন্দ্র তার খোলা বারান্দার প্রিয় হেলান চেয়ারে বসে আছেন। বিশ্রামে তন্দ্রা-আচ্ছন্ন চোখ দুটি যখন বুজে আসছে ঠিক সেসময় একটি গানের কথায় চমক ভেঙ্গে সোজা হয়ে সজাগ হলেন এবং এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন গানের কলি যেদিক থেকে ভেসে আসছে—শুনলেন,

শুনাও, তোমার অমৃত বাণী,
অধমে ডাকি চরণে আনি...

উঠে দাঁড়ালেন গিরিশচন্দ্র। এগিয়ে গেলেন গানের ' বেহাগ' সুরের অন্তরকাড়া আকুতিতে— কে সে! কে গায়! —কার এমন হৃদয় উজাড় করা আকুতি! আরও এগিয়ে যান গিরিশচন্দ্র। দেখলেন এক বৈষ্ণবী রাস্তার ধারে কদমতলায় বসে গাইছে—

শুনাও তোমার অমৃতবাণী
অধমে ডাকি চরণে আনি
সতত নিষ্ফল শত কোলাহলে
ক্লিষ্ট শ্রুতিযুগ কত হলাহলে
শুনাও হে....

গিরিশচন্দ্র এগিয়ে গেলেন সেই কদমগাছের তলায়—গিরিশচন্দ্রকে দেখে বৈষ্ণবী তাকিয়ে দেখলেন—আবার স্বতঃৎসারিত কণ্ঠে গাইলেন,

শুনাও, শীতল মনো-রসায়ন
প্রেম-সমধুর যন্ত্রখানি
হউক সে ধ্বনি দিক প্রসারিত
মিশ্র কলরব ছাপিয়া.. .

গাইতে গাইতে বৈষ্ণবী এবার উঠে দাঁড়িয়ে গিরিশচন্দ্রকে বসার জন্য ইংগিত দিয়ে গাইছেন,

উঠুক ধরণী শিহরি পুলকে
কাঁপিয়া সুখে কাঁপিয়া
বিতরি'এ ভবে শুভ বরাভয়
রুগণে করি হরি, চির নিরাময়।
শুনাও হে;—

শুনাও, দুর্বল চিত্ত, হে হরি,
তোমারি শ্রীপদ—নিকটে টানি—
শুনাও তোমার অমৃত বাণী.....
শুনাও তোমার অমৃতবাণী—

গিরিশচন্দ্রের চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল; ক্ষণিকের মধ্যে সব অবসাদ-ক্লান্তি দূর হল—কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—

কার গান গাইলে মেয়ে!

বৈষ্ণবী স্মিতহাস্যে একটু চুপ করে বললে,

..... তোমার ভাল লেগেছে!

.....বল না কার গান—এমন বেহাগ সুরে দরাজ গলায় তুমি গাইলে—অন্তরটা এ দেহ থেকে বেরিয়ে যেন সেই 'হরি চরণ' ছুতে চায়! বল, বল এ কার গান! গিরিশচন্দ্র নাটকীয় ভংগীর অন্তরজোড়া আকুতিতে জিজ্ঞাসা করলো।

.....গানটি আমাদের রাজশাহীর কান্তের গান গো..... বৈষ্ণবী ধীরে ধীরে বলল,

রাজশাহী! কান্ত! কে সে? গিরিশচন্দ্র উদাস কণ্ঠে বললেন।

....ঐ যে, মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়....

....ও বুঝেছি, বুঝেছি—রজনীকান্তের গান!

আঃ কি গান, কি কথা—অন্তর নিংরানে অঞ্জলি।—

এ কথা বলে গিরিশচন্দ্র বৈষ্ণবীকেকিছু দান দিয়ে নিজের ঘরে যেতে যেতে 'শুনাও তোমার অমৃত বাণী' অনুরণনের বিমুগ্ধতায় আবার চেয়ারে বসলেন। ভাবছেন, রজনীকান্ত সেন— সেই 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই' ..... কি গান, কি স্বদেশ আকুতি?

চোখের সামনে রজনীকান্তের মুখখানা আর তার সঙ্গে শোনা সেই গানের শব্দ ভেসে ভেসে গিরিশচন্দ্রকে পুলকিত করল। গিরিশচন্দ্র আহ্লাদিত হলেন।

'শঙ্করাচার্য' নাটকের বিপুল সাফল্য গিরিশচন্দ্রের দেহের ও মনের ক্লান্তি দূর করেছিল অনেকটাই। জীবন-মন্থন করে প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় সংগ্রাম ও আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার অদম্য ব্যাকুলতা শৈশবকাল থেকে তাঁর চরিত্রকে গড়তে সাহায্য করেছিল। আজ জীবন সায়াহ্নে গিরিশচন্দ্র গভীর প্রত্যয়ে জীবন ও সংসার সম্পর্কে নিজের ভাবনাকে শুধু বিকশিতই করেননি, দেশ ও জাতিকে নাটকের মধ্যদিয়ে সর্বজনীন আনন্দের পরিবেশনে যে সত্যবোধের পরিচয় দিয়ে গেলেন তা দীর্ঘদিন বঙ্গনাট্য মঞ্চে তথা অভিনেতাদের অনুপ্রাণিত করবে। নাটকের বিভিন্ন চরিত্র চিত্রণে বাস্তব জীবন ও

সমাজের প্রত্যক্ষভাবনাকে সমকালীন ঘটনার মধ্যেই আবদ্ধ রাখেন নি—অনন্তজীবন প্রবাহের ধারায় তার জন্য একটা গতি অত্যন্ত সুনিপুণভাবে এসে গেছে যা পরবর্তী সময়ে বিশেষভাবে আদরনীয় হয়েছে।

ভারতের মূল সত্য ও আশ্রয় বেদান্ত। সেই বেদান্তভাবনাকে তপোবনের আশ্রয় থেকে সর্বস্তরের মানব সভ্যতায় রূপান্তরিত—অনুরণিত করার যে প্রয়াস ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মধ্যে গিরিশচন্দ্র প্রত্যক্ষ করেছেন, তারই আলোর দ্যুতিতে উদ্‌ভাসিত চেতনা থেকে বার বার চরিত্র চিত্রণে সজাগ থেকেছেন।

'শঙ্করাচার্য' নাটকের সাফল্যের পর তাই তাঁর মননে আরো গভীর উৎসাহ জেগে উঠল। কিন্তু শরীর অবসন্ন-ক্লান্ত। বন্ধু কুমুদবন্ধু সেনের প্রেরণার গিরিশচন্দ্র তখন

অশোক

'অশোক' নাটক রচনায় মনোনিবেশ করলেন। 'বেদান্তে'র ভাব ও তার প্রত্যক্ষ জীবনচর্চায় সঞ্চারিত করার আগ্রহ—বীজ গিরিশচন্দ্র নাটকের মধ্যে নিজস্ব কিছু চরিত্রের মধ্য দিয়ে উপ্ত করেছেন—'অশোক' নাটকেও সেই উপ্ত বীজ অংকুর লাভ করেছে। 'অশোক' সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের পটভূমিকায়—মায়ার বিনাশ, চেতনার উন্মেষ—বিশেষভাবে তিনি প্রকাশ করেছেন। অবিদ্যাশক্তির প্রতাপ তীব্র, তবুও বিদ্যাশক্তির কাছে তাকে পরাভূত হতে হয়েছে। *অশোক নাটকের মূল ভাবনা সেই চেতনার উত্তরণে।*

'চন্ডাশোক' আর 'ধর্মাশোক' মানবজীবনের এই দুই বিপরীত শক্তিকে 'অশোক' নাটকের কেন্দ্রবিন্দুতে রূপদান করা হয়েছে। 'চন্ড' অতিক্রম করেই 'ধর্ম' নাটকের ভাবনা সেই দিকে। গিরিশচন্দ্র আপন জীবনের 'চন্ডবোধ' থেকে কিভাবে 'ধর্মবোধে' উত্তরণ করলেন তার প্রভাব তিনি নাটকে 'অশোক' চরিত্রের মধ্যে প্রকাশ করেছেন। 'আত্মজয়' এর গৌরব ভাবনায় পুষ্ট এই নাটক।

সাধারণভাবে দর্শক সমাজে 'অশোক' নাটকের ভাব অনুধাবন করা সহজ হয়নি—কিন্তু ইতিহাসের পটভূমিকায় বুদ্ধিজীবীদের, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদেব কাছে 'অশোক' নাটকের রসতত্ত্ব ও রসসমৃদ্ধি খুবই প্রশংসার বিষয় হয়েছিল। **সে সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পণ্ডিত সর্বজন শ্রদ্ধেয় মনীষী আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 'অশোক' নাটকটি পাঠ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের পাঠ্যসূচিতে তা অর্ন্তভুক্ত করেন।**

'অশোক' নাটকটি 'মিনার্ভায়' অভিনীত হয় (১৩১৭/অগ্রহায়ণ)।

এদিকে গিরিশচন্দ্র বন্ধু দেবেন্দ্রবাবুকে সাথে করে বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের অনুরোধে অসুস্থ কবি রজনীকান্ত সেনকে মেডিকেল কলেজের 'কটেজে' দেখতে গিয়েছিলেন। রজনীকান্তের অবস্থা দেখে; বিশেষ করে আর্থিক অপ্রতুলতার

অবস্থা দেখে গিরিশচন্দ্র খুবই চিন্তান্বিত হলেন। এ বিষয়ে সারদা মিত্র মহাশয়ের সাথে আলোচনা করে 'মিনার্ভা থিয়েটারে' রজনীকান্তের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে *'রাণাপ্রতাপ'*ও *'ভগীরথ'*দুটি নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যবস্থা করা হল—এ বিষয়ে *মনমোহন পাঁড়ে* গভীরভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। নাটক দুটির অভিনয় থেকে পুরো টাকা রজনীকান্তের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল। 'মিনার্ভায়' নাটক শুরু হবার আগে গিরিশচন্দ্র রজনীকান্তের সম্পর্কে নিজের একটি লেখা অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে পাঠ করতে বলেন—গিরিশচন্দ্র 'কবিবর রজনীকান্ত সেন' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন....

> মেডিকেল কলেজে যাইতে যাইতে পথে ভাবিয়াছিলাম যে, রোগ তাড়নায় পূর্ব পরিচিত যুবার কান্তি অতি মলিন অবস্থায় শয্যাশায়িত দেখিতে হইবে। কিন্তু তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে দারুণ রোগে যদিও সেই মনোহর কান্তি নাই, কিন্তু এ কঠোর অবস্থায়ও শান্ত পুরুষ কিছুমাত্র বিচলিত নন। ....রজনীকান্ত তখন কবিতা রচনায় নিযুক্ত ছিলেন। এ অবস্থায় পরিশ্রম করিতেছেন, তাহাতে আমার কষ্ট বোধ হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ইহাতে তো অসুখ বৃদ্ধি হইতে পারে? তাহাতে তিনি পেন্সিলে লিখিয়া উত্তর করিলেন, তাঁহার এই এক শান্তির উপায় আছে। ভাবিলাম, হায় বঙ্গমাতা, তোমার এই কোকিলের কলকণ্ঠ কেন রুদ্ধ হইল! রজনীবাবুর সহিত আলাপ করিতে করিতে আমার হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হইল যে, এই দুঃখের অবস্থাতাতেও মঙ্গলময়ের মঙ্গলপদ শ্রীচরণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ভগবান যে সর্বমঙ্গলময়—ইহা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিয়াছেন। *'আমার সকল রকমে কাঙাল করেছে গর্ব করিতে চুরি'* গানটি আমার মনে পড়িল, বুঝিলাম যে এই গানে তাঁহার হৃদয়ের অকপট বিশ্বাস অঙ্কিত। কাঙাল হওয়া তাঁহার আনন্দ, তাঁহার দেহাদিভাব এখনো যে লুপ্ত হয় নাই, এই তাঁহার খেদ। ইহা সামান্য লক্ষণ নয়, ইহা মোক্ষলুব্ধ চিত্তের খেদ। প্রত্যেক কবিতাতেই তাঁহার হৃদয়ের নির্মল ভাব প্রতিফলিত এবং সকল কবিতাই বাগাড়ম্বরে অনাবৃত। সেই স্বভাব কবির শোচনীয় অবস্থা মর্মে লাগিল। ভাবলাম, কি অভিশাপে বঙ্গজননী এই রত্নহারা হইতে বসিয়াছেন, যিনি এই কঠিন পীড়াশায়িত কবিকে না দেখিয়াছেন, তিনি আমার বর্ণনায় বুঝিতে পারিবেন না যে,— ঈশ্বরে চিত্রার্পিত কবি কিরূপ অবিচল ও প্রশান্তচিত্তে কবিতাগুচ্ছ রচনা করিতেছেন; দেখিলে বুঝিবেন যে, যাঁহারা ঐশ্বরিক শক্তি লইয়া পৃথিবীতে আসেন, তাঁহাদের গঠন ও স্বতন্ত্র। এই ভাব হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলাম।....

বঙ্গনন্দিত রজনীকান্ত

এদিকে 'মিনার্ভা থিয়েটার এর মালিকানা নিয়ে সামগ্রিকভাবে কিছু পরিবর্তন হয় যা বঙ্গনাট্যজগতে বিশেষ একটা মাত্রা জুগিয়েছিল। মনমোহন পাঁড়ের পিতা বীরেশ্বর পাঁড়ে জীবনের শেষ অধ্যায়ে কলকাতা ছেড়ে কাশীতে বসবাস করার অভিপ্রায় জানালে পুত্র মনমোহন সেইমত কাশীধামে একটি বাড়ী ও শিবালয় তৈরী হেতু 'মিনার্ভা থিয়েটার' অন্য কারু হাতে ছেড়ে দিতে মনস্থ করেন। সেই সুযোগে নানা কারণে অন্যতম অংশীদার মহেন্দ্রবাবুকে 'মিনার্ভা থিয়েটার' বিক্রয় করেন মনমোহন পাঁড়ে। মহেন্দ্রবাবু পুরোপুরি 'মিনার্ভা থিয়েটার' পরিচালনা করছেন এবং নাটক অভিনয় করাচ্ছেন। হঠাৎ প্রস্তাবিত অতুলকৃষ্ণ মিত্র রচিত *'রকমফের'* নূতন নাটকের অভিনেতাদের মধ্যে কয়েকজন 'মিনার্ভা' ত্যাগ করায় মহেন্দ্রবাবু খুবই সংকটে পড়লেন। সেসময় থিয়েটার বাঁচাতে তিনি গিরিশচন্দ্রের বাড়ী এসে তাঁর শরণাপন্ন হন। গিরিশচন্দ্র মহেন্দ্রবাবুর দুরবস্থা তথা 'মিনার্ভা থিয়েটার'এর সংকট দেখে নিজে সংশ্লিষ্ট নাটকের অভিনেতা অভিনেতৃদের কাছে গিয়ে তাদের বোঝালেন; উৎসাহিত করলেন। শুধু মুখের কথায় নয় নিজে 'রকমফের' নাটকে অসুস্থ শরীরে **গিরিশচন্দ্র 'জালিমের' ভূমিকায় অভিনয় করে নাটকটির** এবং থিয়েটারের সুস্থিতি শৃংঙ্খলা রক্ষা করলেন।

গিরিশচন্দ্র নাটক ও অভিনেতা অভিনেতৃদের প্রতি অত্যন্ত আনুগত্যপূর্ণ শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন—নাটুকেদের অপমান নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করতেন। সারাটা জীবনে গিরিশচন্দ্র এভাবেই মানুষের সুস্থ পরিচ্ছন্ন জীবনের জন্য নিজের চিন্তা ও কর্মকে যুক্ত করতে এতটুকু দ্বিধা প্রকাশ করেন নি। যে 'মিনার্ভা থিয়েটার' থেকে চলে গিয়েছিলেন— সেই মহেন্দ্রবাবুর বিপদকালে নাটকের বিশৃংঙ্খলায় নিজে এগিয়ে তার শৃংঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতাকে রক্ষা করলেন।

'মিনার্ভা থিয়েটারে' সেই মাসেই (আষাঢ় ১৩১৮) *'বলিদান' নাটক পুনরায় অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয় এবং 'করুণাময়ের' ভূমিকায় অভিনয় করবেন বলে গিরিশচন্দ্রের নাম বিজ্ঞাপিত করা হল*। সেদিন বর্ষার দুর্যোগপূর্ণ রাত্রি—সবাই প্রায় হতাশ হলেন—টিকিট আদৌ বিক্রয় হবে কিনা—দর্শক আসবেন কিনা। কিন্তু **'করুণাময়ের' চরিত্রে গিরিশচন্দ্রের অভিনয় সংবাদে নাটুকে দর্শকদের মধ্যে একটা আলাদা উত্তেজনার প্রবাহ দাপিয়ে দাপিয়ে থিয়েটার প্রায় ভর্তি হয়ে গেল।**

'বলিদান' নাটকের করুণাময় চরিত্রটির একটি জায়গায় অনাবৃত দেহে গিরিশচন্দ্রকে অভিনয় করতে হয়— সেদিন প্রচন্ড বর্ষার হিমশীতল আবহাওয়ায় গিরিশচন্দ্র অনাবৃত দেহে অভিনয় করেছেন। তাতে অনিবার্যভাবে ঠাণ্ডা তার হাঁপানির রোগটিকে জাগিয়ে দিয়ে গেল— ফলে গিরিশচন্দ্র গভীরভাবে পুনরায় রোগে আক্রান্ত

পুনরায় বলিদান

হলেন। হোমিও প্যাথি চিকিৎসা চলল—কিন্তু শরীরের অবসন্নতা, বিশেষ করে একটা অপরিচ্ছন্নতা শরীর যন্ত্রনায় কাতর অস্থিরতায় অবসাদগ্রস্থ হচ্ছিলেন।

বন্ধুদের পরামর্শে গিরিশচন্দ্র সেকালের প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতির চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করলেন। বেশ কিছুদিন আগে বহুবাজারের বিখ্যাত মতিলাল বংশের এক ছেলে শ্রীশচন্দ্র মতিলাল গিরিশচন্দ্রকে পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে *'বিশ্বামিত্র'* সম্পর্কে একটি নাটক রচনা করার আন্তরিক অনুরোধ জানিয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্র কাশীতে থাকাকালীন কথাটি মনে রেখে 'রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম পাঠাগার' থেকে *'বিশ্বামিত্র'*সম্পর্কে কাহিনীর বিস্তার অত্যন্ত গভীরভাবে পড়েন এবং ***'তপোবল'*এই নামে একটি নাটক রচনা করেন।**

কলকাতায় ফেরার পর অসুস্থ শরীরে 'তপোবল' নাটকের মহড়া নিজের বাড়ীতে কয়েকবার করেছেন। শরীরের (হাঁপানীর) অবস্থার মধ্যেও 'তপোবল' নাটকের

তপোবল

চরিত্রগুলি অভিনয় শিক্ষায় বেশ পরিশ্রম করতেন। 'মিনার্ভায় থিয়েটারের' অবস্থার পরিবর্তন হেতু **গিরিশচন্দ্র (১৩১৮ অগ্রহায়ণ) 'তপোবল' নাটকটি অভিনয় করান**। সম্পূর্ণভাবে গিরিশচন্দ্রের অধ্যক্ষতায় নাটকটির পরিবেশন, অভিনয় নৈপুণ্য দর্শকদের আপ্লুত করেছিল।

নাটকটি রামায়ণ-এর কাহিনীর—তপস্যার মহিমা তৎসহ ব্রাহ্মণ্য তেজের গৌরব—এই দুয়ের ভিত্তিতে রচিত। সাধারণ মানুষ তপস্যার দ্বারা দুলর্ভ মানবে পরিণত হতে পারে

....নরত্ব দুর্লভ অতি বুঝুক মানব।
নাহি জাতির বিচার
লভে নর উচ্চপদ তপোবলে....

ব্রাহ্মণ্যবোধ ও তেজের মহিমায়

....হে ব্রাহ্মণ
বুঝি নাই মাহাত্ম্য তোমার
যজ্ঞসূত্রধারী, দেবতার দেবতা ব্রাহ্মণ।

রামায়ণে 'বিশ্বামিত্র' ও 'বশিষ্ট' দুটি চরিত্র অনন্য কাহিনী—সমৃদ্ধে ভরপুর। *একদিকে ক্ষত্রিয় তেজশক্তি*—পারভব কোনভাবেই স্বীকার নয়—সকল সময় অস্থির চঞ্চল বেগ—*আবার অপর দিকে ব্রাহ্মণ্য চেতনা শান্ত*-স্থির-অচঞ্চল-অটল—এই দুই মেরুর নিবিড়তায় নাটকের রস ও সংঘাত নাটকটিকে দর্শক হৃদয়ে যে আলোড়ন জাগিয়েছিল তা গিরিশচন্দ্রের ভাষা --রস বিস্তারে অভূতপূর্ব। নাটকে 'অপ্সরা' চরিত্র গিরিশচন্দ্রের অন্তর-সৌন্দর্যকে বহন করে সম্পূর্ণ মানবীয় আর্তি নিয়ে দর্শক সমাজে অপ্সরাদের উপস্থাপিত করেছেন, যা ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। *রম্ভা-উর্বশী* প্রভৃতি

অপ্সরাদের অন্তরের ভোগ বিলাসের মত্ততায় আকৃষ্ট মন অতিক্রান্ত হয়ে প্রেম-প্রীতির আকাঙ্খায় উজ্জ্বল।

মেনকা, বিশ্বামিত্রকে পাবার জন্য স্বর্গ-সুখ তথা দেবরাজ ইন্দ্রের শচী হবার আশা ত্যাগ করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করছেন না।

রম্ভা মেনকাকে যখন বললেন,

....ত্যাজিয়ে অমবে, নরে ভজিবারে
সাধ কি অন্তরে তব?

মেনকা অন্তরের পুষে রাখা আকাঙ্খার প্রবল আকুতি-ভরা সুখ স্বীকার করে বললেন,

....যদি নাহি কর উপহাস,
হৃদযের সাধ মম করি লো প্রকাশ।
ধাই যবে ধরণী ভ্রমণে
উঠে মম মনে
প্রেমের বন্ধনে বঞ্চে সুখে নর-নারী।
উদ্বাহ-বন্ধন-প্রাণে প্রাণে অপূর্ব মিলন।
দেহ দান - প্রাণ যারে চায়
নহে কাম - পিপাসায
যখন যে চায, সেবিতে তাহায়
স্বর্গের মতন, নিয়ম নহেক তথা।
নাহি হৃদয়-বন্ধন
কামক্রিয়া হেতু সম্মিলন,
সত্য কহি, ধিক্কার জন্মেছে মম প্রাণে!
ত্রিদিব মন্ডলে
ক্রীতদাসী আমরা সকলে,
ধরা - নিবাসিনী
ভাগ্য মানি যতেক রমণী
প্রেমে দেহ-বিতরণ—ধরার নিয়ম।

গিরিশচন্দ্র 'তপোবল' নাটকে মানব-জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা সুখ-দুঃখ তথা আনন্দ-বেদনার পটভূমিকায় চরিত্র সৃষ্টি করেছেন অথচ কাহিনীর মূলাধারকে এতটুকু অস্বীকার করেননি।

'সদানন্দ' চরিত্রটি গিরিশচন্দ্রের নিজস্ব ভাবনায় অত্যন্ত মানবিক করে চিত্রিত। সদালাপী ও ত্যাগ-মানসিকতায় সিক্ত কথাবার্তায় দর্শকসমাজকে ভাবিয়েছে—অনুভূত

হয়েছে নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের মনোজগতের কথা। আর একটি চরিত্র *'বেদমাতা'*—বিস্তরিত ঘটনার মধ্য থেকেও করুণা ও পরোপকার হিতৈষণায় মাধুর্য মন্ডিত। *'তপোবল' নাটকটি গিরিশচন্দ্র বিবেকানন্দের আশ্রিতা স্নেহময়ী ভারতভাগিনী নিবেদিতার উদ্দ্যেশ্যে নিবেদন করে ভক্ত ভৈরব গিরিশচন্দ্র অধ্যাত্মজীবনের সঙ্গে মানব সংসারের একটা নিবিড়তার স্বীকৃতি দান করলেন।*

উৎসর্গ পত্রে গিরিশচন্দ্র বলেছেন,

> ....পবিত্রা নিবেদিতা,
>
> বৎসে! তুমি আমার নূতন নাটক হইলে আমোদ করিতে। আমার নূতন নাটক অভিনীত হইতেছে, তুমি কোথায়? কাল দার্জিলিং যাইবার সময় আমায় পীড়িত দেখিয়া স্নেহবাক্যে বলিয়া গিয়াছিলে, 'আসিয়া যেন তোমায় দেখিতে পাই।' আমি তো জীবিত রহিয়াছি, কেন বৎসে, দেখা করিতে আইস না? শুনিতে পাই, মৃত্যুশয্যায় আমায় স্মরণ করিয়াছিলে, যদি দেবকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া এখনও আমায় তোমার স্মরণ থাকে আমার অশ্রুপূর্ণ উপহার গ্রহণ কর।

।। ছেচল্লিশ।।

। রামকৃষ্ণালয়ে প্রস্থান।

গিরিশচন্দ্র অসুস্থ-ক্লান্ত। শীতকাল—অসুস্থ গিরিশচন্দ্রকে স্বাস্থ্য-উদ্ধারের জন্য কলকাতার বাইরে ডাক্তার যেতে দিতে চান না। আবার শীতের আবহাওয়ায় সন্ধ্যা থেকে সারাটা শহর কুয়াশার-ধূমে আচ্ছন্ন থাকে—বিশেষ করে গিরিশচন্দ্র যেখানে থাকেন, সেখানকার বস্তি অঞ্চলের বদ্ধ ব্যবস্থা তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতির খুবই প্রতিকূল। আশেপাশেও তেমন কোন স্থান পাওয়া যায়নি, যেখানে গিরিশচন্দ্র বিশ্রাম নেবেন—সুস্থ পরিচ্ছন্ন বাতাসের খোলামেলা প্রবাহে থাকবেন। রোগটা যে হাঁপানি! কাশীতে গিয়েও তিনি তেমন স্থায়ী কোন আরোগ্য-শক্তি লাভ করেননি।

চিকিৎসক সতীশচন্দ্র বরাট, গিরিশচন্দ্রের খুবই বন্ধু। কলকাতার বিখ্যাত হোমিও চিকিৎসক ইউনিয়ান সাহেবকে দিয়ে গিরিশচন্দ্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করালেন। গিরিশচন্দ্র আজীবন হোমিও চিকিৎসায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং নিজেও পাড়া প্রতিবেশী—ছোট বড় সকলের চিকিৎসা করেছেন হোমিও সূত্র ধরেই—সবাই সুস্থ আরোগ্য লাভ করেছে—গিরিশচন্দ্রের সুখ্যাতি করেছে। চিকিৎসক ইউনিয়ান সাহেব গিরিশচন্দ্রকে যে ঔষধ দিতেন তা কাহাকেও বলতেন না। কিন্তু গিরিশচন্দ্র তা বুঝতে পারতেন—নামও বলে দিতেন। ইউনিয়ান সাহেবের ঔষধে গিরিশের অসুস্থতার নানা উপসর্গ

ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে লাগল। গিরিশচন্দ্র সুস্থ ও সবল সতেজ মানসিকতায় আস্তে আস্তে ফিরে আসছেন। বন্ধু-বান্ধব সকলেই আশ্বস্ত হলেন।

কিন্তু দু'তিন দিনের ব্যবধানে দুপুরের আহারাদি সমাধান করার পর বৈঠকখানায় শুয়ে আছেন। নিকটেই আর একটি কক্ষ—অধ্যায়ন কক্ষ। স্ত্রীর (দ্বিতীয়) মৃত্যুর পর গিরিশচন্দ্র বাড়ীর ভেতর ঘরে শয়ন করতেন না। একটি কক্ষ—যেখানে তাঁর ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও এসেছিলেন, গল্প করেছেন ধর্ম-প্রসঙ্গ নিয়ে গিরিশের সঙ্গে আলোচনা করেছেন।

শরীর ভাল নয়—চাপা চাপা চাউনিতে এদিক ওদিকে তাকিয়ে কেমন যেন আলতোভাবে শুয়ে আছেন—জ্বর হয়েছে—তাপ উঠানামা করছে—কিন্তু পুরোটা কমছে না। ভালভাবে শুতেও পারছেন না—একটা অস্বস্তি-অস্থিরতা-ছট্‌ফটা গতি দ্রুত গিরিশচন্দ্রকে বিষন্ন করে তুলেছে। পাড়ার ছেলেরা, নিকট বন্ধুজনেরা গিরিশচন্দ্রের অসুস্থতার প্রতিদিন খোঁজখবর নিয়েছে—প্রয়োজনে পালা করে রাত্রি ও দিনে তাকে আরাম দেবার, সুস্থ করার কাজে যুক্ত থাকছে অনবরত। মাঝে মাঝে চোখদুটো বন্ধ করে গিরিশচন্দ্র 'রামকৃষ্ণ', 'রামকৃষ্ণ' নাম উচ্চারণ করছেন। চোখ দুটো জলে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। অনেক চেষ্টা করে যখন তাকাছেন—অত্যন্ত প্রিয়জনদের দিকে টানা টানা চাউনিতে বিভোর হয়ে যাচ্ছেন।

সারারাত- দিন ভালভাবে ঘুমোতে পারছেন না। ছোটভাই অতুলচন্দ্র মাঝে মাঝে এসে দেখে যান। হঠাৎ অস্থির হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করছেন—একেবারেই যে ঘুম আসছে না অতুল! ভারাক্রান্ত হৃদয়ে প্রায় কেঁদে কেঁদে গিরিশচন্দ্র বলছেন।

বন্ধু সাহিত্যসেবী অক্ষয়চন্দ্র সরকার অসুস্থ গিরিশচন্দ্রকে দেখতে এসে গিরিশচন্দ্রের অস্থির অবস্থা দেখে তিনি 'শিবপ্রিয়' ঔষধ সেবন করার অনুরোধ জানান। গিরিশচন্দ্র 'শিবপ্রিয়' ঔষধ গ্রহণ করলেন—প্রথম প্রথম বেশ আরোগ্য—ইংগিতে সকলের মন-চিত্ত আনন্দিত। কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে ঘুম গিরিশচন্দ্রের কাছ থেকে সরে গেছে—আর্তনাদ করতে চান—আবার চুপ করে যান—শুধু জানালার ভেতর থেকে কাকে যেন খুঁজে পেতে চান।

এমনি অবস্থায় গিরিশচন্দ্র হঠাৎ বললেন, 'দানি - দানি'। দানিবাবু 'মিনার্ভা থিয়েটারের' একটি কাজে ফরিদপুর গিয়েছেন।

দানিবাবু, গিরিশচন্দ্রের একমাত্র পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ। ভাই অতুলকৃষ্ণ দানিবাবুকে তার (টেলিগ্রাম) করলেন দ্রুত আসার জন্য।

অসুস্থতা বেড়েই চলছে। মাঝ মাঝে অসংলগ্ন কথা বলছেন। বড় চিকিৎসক ব্রাউন সাহেব এলেন, দেখলেন—ইংগিতে জানালেন, রোগটি জটিল।

বন্ধু দেবেন্দ্রবাবু এসেছেন। অপলক চাউনিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। দেবেনবাবুকে দেখে গিরিশচন্দ্র জল পান করতে চাইলেন। দেবেনবাবু অতি যতনে গিরিশচন্দ্রকে জল পান করালেন। নিজের হাতে তোয়ালা দিয়ে গিরিশচন্দ্রের মুখ পরিষ্কার করতে করতে আস্তে আস্তে বললেন, *'গিরিশ, মার কাছে সংবাদ পাঠাব কি?'*

গিরিশের খোলা চোখদুটো কেমন যেন আশাদীপে কাতর হয়ে গেল—খুব আস্তে আস্তে দেবেনবাবুকে বললেন, *.....তোমরা যা ভাল বোঝ?*

এবার শরীরটা আরো বেশী আলগা হয়ে যাচ্ছে—কথাও জড়িয়ে আসছে—কিছুই ভাল লাগছে না।

হঠাৎ ঘোরের মধ্যে বললেন,— *" 'রামকৃষ্ণ' - 'রামকৃষ্ণ' চলো সব নেশা কাটিয়ে দিয়ে চলো"*—পুত্র দানিবাবু এলেন। দ্রুত পিতার কাছে এসে 'বাপি বাপি' বলে পা-দুটোতে মাথা রেখে কাতর হয়ে হাত দুটো দিয়ে পিতাকে জড়িয়ে ধরলেন।

পুত্র স্নেহ-কাতর পিতা গিরিশচন্দ্র দু'টো হাত পুত্রের মাথায় বুলাতে বুলাতে কেমন যেন হয়ে যাচ্ছেন। এমন অবস্থায় সবাই দানিবাবুকে সজাগ করলেন। নিকটেই একটি গ্লাসে বেদনার রস ছিল। দানিবাবু গ্লাসটি মুখের কাছে রাখলেন—গিরিশচন্দ্রের ঠোঁটে গ্লাসটি থেকে একটু রস ছুঁয়ে গড়িয়ে গেল বিছানায়।

দেখতে দেখতে শ্বাস দ্রুত গতিতে বইতে লাগল—উপস্থিত সকলেই বুঝতে পারলেন—মহাশ্বাস—শুধু অপেক্ষা।

এদিকে রামকৃষ্ণ ভক্ত সন্ন্যাসীরা গিরিশচন্দ্রের বাড়ীতে একে একে আসছেন—এলেন স্বামী সারদানন্দ—নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু সহ পাড়ার এবং নাট্যজগতের গিরিশ-অনুরাগী অভিনেতা-নেতৃগণ। মঠ সন্ন্যাসীরা ঠাকুর রামকৃষ্ণের নাম ভজনা করতে লাগলেন—'রামকৃষ্ণ হরিবোল' শোকান্ধকারে রামকৃষ্ণ আহ্বানে আলোর রেখায় গিরিশচন্দ্রের মুখ উজ্জ্বল হতে লাগল—সে এক পরম তৃপ্তির সন্ধিক্ষণ।

> *....আর দেরী নয় ঠাকুর, তুলে লও তোমার কাছে—নেশা কাটিয়ে দাও হে*
> *পরম নির্ভর—জয় রামকৃষ্ণ চল'....*

ধীরে ধীরে সংজ্ঞালোপ পেতে লাগল— চোখ দুটো জলে সিক্ত হয়ে এল—তারপর, তারপর জীবন রঙ্গস্থল থেকে পর্দা পরে গেল—৮ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার রাত্রি তখন ১টা ২০ মিনিট; সময়টা ১৯১২ সন।

ধর্মজীবন-কর্মজীবন-গার্হস্থ্যজীবন দারিদ্র্যের সূতায় আবদ্ধ থেকে চিরমুক্ত অমৃত-আলোর পথযাত্রী গিরিশচন্দ্র চলে গেলেন—।

এসেছিলেন ১৮৪৫ সালে ইংরেজ শাসক প্রথম লর্ড হার্ডিঞ্জ এর সময়ে আর চলে গেলেন ১৯১২ সালে দ্বিতীয় হার্ডিঞ্জ এর সময়ে।

গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে স্বামী সারদানন্দ বলেছিলেন,

> .... তেজস্বী গিরিশচন্দ্র সৎ কি অসৎ কোন কার্যই লুক্কায়িত ভাবে করিতে জানিতেন না। উহা একপ্রকার তাঁহার স্বভাবের বিরুদ্ধ ছিল। নিজকৃত কার্যকলাপের মন্দাংশ গোপন করিয়া কেবলমাত্র উত্তমাংশের ঘোষণা করা মনুষ্য সাধারণের স্বভাব হইলেও—তিনি কখনও ঐ পথে চলিতে আপনাকে অভ্যস্ত করাইতে পারেন নাই। ফলে, সাধারণে তাঁহার স্বভাব না বুঝিয়া, এতকাল ভাবিয়া আসিয়াছে—যাঁহার বাহিরে এতটা কু-কৃত প্রকাশ তাঁহার ভিতরে না জানি আর কি 'গুপ্ত' রহিয়াছে।

ছোট ভাই অতুলচন্দ্র ঘোষ একদিন গিরিশচন্দ্রকে বলেছিলেন.

> .... মেজদা, তুমি যে পরমহংসের ভৈরব সে কথা আমি খুব জানি। লোকে মনে করতো তোমার মত মদ খেলে খুব বড় ভাব আসে, গড়-গড়িয়ে নাটক লেখা যায়। লেখার জন্য মদ ধরে শেষ পর্যন্ত্য মাতাল হয়ে পড়লেন—মনে করলে তোমার মত কাছাখুলে পায়চারী করলে—ভাব বেশ জমাট হয়—ব্যস সেই কাছা খোলাই রয়ে গেলে....

গিরিশচন্দ্র শুনেছিলেন তার নামে নানাস্তরে অপযশ প্রচার করা হয়। গিরিশচন্দ্র তাতে ক্ষুব্ধ হতেন না। চুপও থাকতেন না—ঠাকুরের কথা স্মরণ করতেন আর নিজের মনে তাঁর শরণ নিয়ে বলতেন,

> ....আমি এমন বংশে জন্মিয়াছি যে বংশের সহিত কলিকাতার সম্ভ্রান্ত কায়স্থকুলের একটা না-একটা সম্বন্ধ আছে—আমি সেই বংশেব ছেলে হয়ে, আজ ঘৃণ্য বেশ্যার সহিত থিয়েটারে নাচিতেছি'....

....চির-পর-আরাধনা   সহকারী বারাঙ্গনা
কে কোথায় রাখে তার মান?
অনুগ্রহ প্রার্থীজন   কে কোথায় পায় ধন
রজনীর জাগরণ নিত্য হরে প্রাণ
তিরস্কার পুরস্কার   কলঙ্ক কণ্ঠেব হার
তথাপি এ পথে পদ করেছি অর্পণ
রঙ্গভূমি ভালবাসি   হৃদে সাধ রাশি রাশি
আশার নেশায় করি জীবন যাপন।

ঠাকুরের অপ্রত্যাশিত করুণায় সেই গিরিশচন্দ্র বলেন।

ভাবান্তর নাই মাত্র তব করুণায়
হে দীন শরণ
মাগে বা না মাগে কৃপা বিলাও ধরায়
বরিষার বারি বরিষন
বিধবার ধনাপহরণ
ভ্রুণ-হত্যা কূল স্ত্রী গমন
ত্যজি কন্যা পুত্র নারী পানাসক্ত অত্যাচারী
লোক ত্যাজ্য ঘৃণিত জীবন
তব দ্বার মুক্ত তার পতিত পাবন।

* * * *

নট গিরিশচন্দ্র

সময়	নাটক	চরিত্র	অভিনয় স্থান
১৮৬৯ (অক্টোবর)	সধবার একাদশী (দীনবন্ধু মিত্র)	নিম চাঁদ	১৮৬৯ সন বাগবাজারের প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়ীতে।
১৮৭১ (জুলাই)	লীলাবতী (দীনবন্ধু মিত্র)	ললিত	ন্যাশন্যাল থিয়েটার (প্রস্তাবিত)
১৮৭৩ (২২ ফেব্রুয়ারী)	কৃষ্ণকুমারী (মধুসূদন দত্ত)	ভীমসিংহ	ন্যাশন্যাল থিয়েটার
১৮৭৪ (১৪ ফেব্রুয়ারী)	মৃণালিনী (বঙ্কিমচন্দ্র)	পশুপতি	ন্যাশন্যাল থিয়েটার
১৮৭৪	বিষবৃক্ষ (বঙ্কিমচন্দ্র)	নগেন্দ্রনাথ	ন্যাশন্যাল থিয়েটার
১৮৭৭ (৭ ফেব্রুয়ারী)	মেঘনাদ বধ (মধুসূদন দত্ত)	রাম: ও মেঘনাদ	গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার
১৮৭৭	পলাশীর যুদ্ধ (নবীনচন্দ্র সেন)	ক্লাইভ	ন্যাশন্যাল থিয়েটার
১৮৭৮	দুর্গেশনন্দিনী (বঙ্কিমচন্দ্র)	জগৎসিংহ	ন্যাশন্যাল থিয়েটার
১৮৮১	হাম্বির (সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার)	হামির	গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার
১৮৮১	আলাদিন	কুহকী	ন্যাশন্যাল থিয়েটার
১৮৮১	আনন্দ রহো	বেতাল	ন্যাশন্যাল থিয়েটার

১৮৮১	রাবণ বধ	রামচন্দ্র	ন্যাশন্যাল থিয়েটার
১৮৮১	সীতার বনবাস	রামচন্দ্র	ন্যাশন্যাল থিয়েটার
১৮৮১	অভিমুন্য বধ	যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধন	ন্যাশন্যাল থিয়েটার
১৮৮১	লক্ষ্মণ বর্জন	রামচন্দ্র	ন্যাশন্যাল থিয়েটার
১৮৮১	সীতার বিবাহ	বিশ্বামিত্র	ন্যাশন্যাল থিয়েটার
১৮৯০	ভোটমঙ্গল	নাচওয়ালা	ন্যাশন্যাল থিয়েটার
১৮৮৩	পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস	কীচক ও দুর্যোধন	ন্যাশন্যাল থিয়েটার
১৮৮৬	দক্ষযজ্ঞ	দক্ষ	স্টার থিয়েটার (৬৮নং বিডন স্ট্রীট)

[স্টার থিয়েটারে এরপর 'ধ্রুব চরিত্র'; 'নলদময়ন্তী'; 'কমলেকামিনী'; 'শ্রীবৎসচিন্তা'; 'বৃষকেতু'; 'হীরার ফুল'; 'চৈতন্যলীলা'; 'প্রহ্লাদ চরিত্র'; 'বিবাহ বিভ্রাট'; 'নিমাই সন্ন্যাস'; 'প্রভাস যজ্ঞ'; 'বুদ্ধদেব চরিত'; 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর'; 'বেল্লিক বাজার'; 'রূপ-সনাতন'; নাটকগুলি গিরিশচন্দ্রের রচনা; গিরিশচন্দ্র উক্ত নাটকগুলিতে অভিনয় করেননি কিন্তু প্রত্যেকটি নাটকের চরিত্র চিত্রণে শিক্ষাদান করেছেন।]

এরপর গিরিশচন্দ্র *'স্টার থিয়েটার'* ত্যাগ করে *'এমারেল্ড থিয়েটারে'* যোগদান করেন। 'পূর্ণচন্দ্র'; 'বিষাদ'; দুটি নাটক রচনা করে এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনয় করান। কোন চরিত্রে তিনি অভিনয় করেননি—কিন্তু চরিত্র চিত্রণে শিক্ষাদান দিয়েছেন। 'এমারেল্ড থিয়েটার' ত্যাগ করলেন। *এরপর কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে হাতিবাগানে নূতন করে 'স্টার থিয়েটার' স্থাপিত হল এবং ১৮৮৮ সনে ২৫ শে মে তারিখে গিরিশচন্দ্র রচিত 'নসীরাম' নাটক দিয়ে শুরু হয়।* গিরিশচন্দ্র হলেন নাটকের চরিত্র চিত্রণের শিক্ষক এবং ম্যানেজার। পর পর তার রচিত 'নসীরাম' - 'প্রফুল্ল' - 'হারানিধি' - 'চণ্ড' - 'মলিনাবিকাশ' - 'মহাপূজো' নাটকগুলি অভিনীত হয়। গিরিশচন্দ্র কিন্তু কোন চরিত্রে অভিনয় করেন নি। গিরিশচন্দ্র 'স্টার থিয়েটার' ত্যাগ করেন এবং নব পর্যায়ে *'মিনার্ভায়'* যোগদান করেন (১২৯৯)।

নট গিরিশচন্দ্র

সময়	নাটক	চরিত্র	অভিনয় স্থান
১৮৯৩ (২৮ জানুয়ারী)	ম্যাকবেথ (অনুবাদ)	ম্যাকবেথ	মিনার্ভা থিয়েটার
১৮৯৫	*প্রফুল্ল	যোগেশ	মিনার্ভা থিয়েটার
১৮৯৬	কালাপাহাড়	চিন্তামণি	স্টার থিয়েটার (হাতিবাগান)
১৮৯৭	মায়াবসান	কালীকিঙ্কর বসু	স্টার থিয়েটার (হাতিবাগান)
১৯০০	পাণ্ডবগৌরব	কুঞ্চকী	ক্লাসিক থিয়েটার
১৯০০	সীতারাম (বঙ্কিমচন্দ্র)	সীতারাম	মিনার্ভা থিয়েটার
১৯০১	কপালকুণ্ডলা (বঙ্কিমচন্দ্র)	অধিকারী; চটীরক্ষক মাতাল মুটে ও প্রতিবেশী	ক্লাসিক থিয়েটার
১৯০১	মৃণালিনী (বঙ্কিমচন্দ্র)	পশুপতি	ক্লাসিক থিয়েটার
১৯০২	ভ্রান্তি	রঙ্গলাল	ক্লাসিক থিয়েটার
১৯০৫	বলিদান	করুণাময়	মিনার্ভা থিয়েটার
১৯০৫	সিরাজদ্দৌলা	করিমচাচা	মিনার্ভা থিয়েটার
১৯০৫	দুর্গেশনন্দিনী	বীরেন্দ্র সিংহ	মিনার্ভা থিয়েটার
১৯০৬	মীরকাশিম	মীরজাফর	মিনার্ভা থিয়েটার

** ১৮৯৫ সালে 'মিনার্ভায় যোগদানের পর তার রচিত 'প্রফুল্ল' নাটকটি যোগেশের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র অভিনয় করেন।*

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র - বিভিন্ন নাটক ও অভিনয়স্থান

সময়	নাটক	প্রথম অভিনয় স্থান
১৮৭৭	আগমনী	গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার
১৮৭৭	অকালবোধন	ঐ
১৮৭৭	দোললীলা	ঐ
১৮৮১	মায়াতরু	ন্যাশন্যাল থিয়েটার
১৮৮১	মোহিনী প্রতিমা	ঐ
১৮৮১	আলাদিন	ঐ
১৮৮১	আনন্দ রহো	ঐ
১৮৮১	রাবণ বধ	ন্যাশন্যাল থিয়েটার
১৮৮১	সীতার বনবাস	ঐ
১৮৮১	অভিমূন্য-বধ	ঐ
১৮৮১	সীতার বিবাহ	ঐ
১৮৮১	লক্ষ্মণ বর্জন	ঐ
১৮৮২	ব্রজবিহার	ঐ
১৮৮২	রামের বনবাস	ঐ
১৮৮২	সীতাহরণ	ঐ
১৮৮২	ভোট মঙ্গল	ঐ
১৮৮২	মলিন মালা	ঐ
১৮৮৩	পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস	ঐ
১৮৮৩	দক্ষযজ্ঞ	স্টার থিয়েটার (বিডন স্ট্রীট)
১৮৮৩	ধ্রুব চরিত্র	ঐ
১৮৮৩	নল-দয়মন্তী	ঐ
১৮৮৪	কমলে-কামিনী	ঐ
১৮৮৪	হীরার ফুল	ঐ
১৮৮৪	বৃষকেতু	ঐ
১৮৮৪	শ্রীবৎস চিন্তা	ঐ
১৮৮৪	চৈতন্যলীলা	স্টার থিয়েটার (বিডন স্ট্রীট)
১৮৮৪	প্রহ্লাদ চরিত্র	ঐ
১৮৮৫	নিমাই সন্ন্যাস	ঐ

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র : বিভিন্ন নাটক ও অভিনয়স্থান

সময়	নাটক	প্রথন অভিনয় স্থান
১৮৮৫	প্রভাসযজ্ঞ	স্টার থিয়েটার (বিডন স্ট্রীট)
১৮৮৫	বুদ্ধদেব চরিত্র	ঐ
১৮৮৬	বিল্বমঙ্গল	ঐ
১৮৮৬	বেল্লিকবাজার	ঐ
১৮৮৭	রূপ-সনাতন	ঐ
১৮৮৮	নসীরাম	স্টার থিয়েটার (হাতিবাগান)
১৮৮৮	পূর্ণচন্দ্র	এমারেল্ড থিয়েটার
১৮৮৮	বিষাদ	ঐ
১৮৮৯	*প্রফুল্ল	স্টার থিয়েটার (হাতিবাগান)
১৮৮৯	হারানিধি	ঐ
১৮৯০	চণ্ড	ঐ
১৮৯০	মলিনা-বিকাশ	ঐ
১৮৯০	মহাপূজা	ঐ
১৮৯৩	ম্যাকবেথ (অনুবাদ)	মিনার্ভা থিয়েটার
১৮৯৩	মুকুল-মঞ্জুষা	ঐ
১৮৯৩	আবুহোসেন	ঐ
১৮৯৩	জনা	ঐ
১৮৯৩	সপ্তমীতে বিসর্জন	ঐ
১৮৯৪	স্বপ্নের ফুল	ঐ
১৮৯৪	সভ্যতার পাণ্ডা	ঐ
১৮৯৫	ফণির মণি	ঐ
১৮৯৫	পাঁচ কনে	ঐ
১৮৯৫	করমেতিবাঈ	ঐ
১৮৯৬	কালাপাহাড়	স্টার থিয়েটার (হাতিবাগান)
১৮৯৭	হীরক জুবিলী	ঐ
১৮৯৭	পারস্য প্রসূন	ঐ
১৮৯৭	মায়াবসান	ঐ

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র - বিভিন্ন নাটক ও অভিনয়স্থান

সময়	নাটক	প্রথম অভিনয় স্থান
১৮৯৯	দেলদার	ক্লাসিক থিয়েটার
১৯০০	পাণ্ডব-গৌরব	ঐ
১৯০০	মণিহরণ	মিনার্ভা থিয়েটার
১৯০০	নন্দদুলাল	ঐ
১৯০১	অশ্রুধারা	ক্লাসিক থিয়েটার
১৯০১	মনের মতন	ঐ
১৯০১	অভিশাপ	ঐ
১৯০২	শাস্তি	ঐ
১৯০২	ভ্রান্তি	ঐ
১৯০২	আয়না	ঐ
১৯০৪	সৎনাম	ঐ
১৯০৫	হরগৌরী	ঐ
১৯০৫	বলিদান	মিনার্ভা থিয়েটার
১৯০৫	সিরাজদ্দৌলা	ঐ
১৯০৫	বাসর	ঐ
১৯০৫	মীরকাসিম	ঐ
১৯০৭	য্যায়সা কা ত্যায়সা	ঐ
১৯০৭	ছত্রপতি শিবাজী	ঐ
১৯০৮	শাস্তি কি শান্তি	ঐ
১৯০৯	শঙ্করাচার্য	ঐ
১৯১০	অশোক	ঐ
১৯১১	তপোবল	ঐ
১৯১২	গৃহলক্ষ্মী (অসমাপ্ত)	ঐ

(দেবেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক সমাপ্ত)

*** এছাড়া অসমাপ্ত রাণাপ্রতাপ / মিলনকানন / সাধের বউ। ***
